পর্দা ও ইসলাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

পর্দা ও ইসলাম

পর্দা ও ইসলাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৮৩

৬ষ্ঠ প্রকাশ

মহররম	১৪২৩
চৈত্র	১৪০৮
এপ্রিল	২০০২

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

پرده -এর বাংলা অনুবাদ

PORDA-O-ISLAM by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane. Banglabazar. Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 110.00 Only.

গ্রন্থকারের আরজ

আজ থেকে চার বৎসর আগে পর্দা সম্পর্কে এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 'তর্জুমানুল কুরআন'-এর কয়েকটি সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আলোচনার কয়েকটি দিক ইচ্ছা করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছিল; কোন কোন বিষয়কে অসম্পূর্ণ রাখিতে হইয়াছিল— কারণ, গ্রন্থ রচনা তখন উদ্দেশ্য ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল একটা প্রবন্ধ রচনা— সেই সকল বিষয়কে সন্নিবেশিত করিয়া প্রয়োজনীয় সংযোজন এবং বিশ্লেষণসহ বর্তমান গ্রন্থের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়, ইহা চূড়ান্ত এবং শেষ কথা এমন দাবী এখনও করা যায় না। কিন্তু সত্য সত্যই যাঁহারা বিষয়টি অনুধাবন করিতে আগ্রহী তাঁহারা ইহাতে অনেকাংশে তৃষ্ণা নিবৃত্তকারী তত্ত্ব-তথ্য এবং যুক্তি-প্রমাণ পাইবেন—অন্তত এতটুকু আশা আমি অবশ্যই করিব।

—তাওফীক আল্লাহরই হাতে; তাঁহারই কাছে সাহায্য চাই। আমীন।

২২, মুহাররাম ১৩৫১ হিজরী —আবুল আ'লা

সূচীপত্র

মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা	৯
নব্যযুগের মুসলমান	২৮
তাত্ত্বিক আলোচনা	৩৭
পরিণাম ফল	৫১
যৌনোন্মাদনা ও অশ্লীলতার সংক্রামক ব্যাধি	৬৪
আরও কতিপয় উদাহরণ	৭৮
সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন	৯২
প্রাকৃতিক বিধান	১০৭
মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি	১৫৫
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	১৬৬
পর্দার নির্দেশাবলী	২৩১
বাড়ী হইতে বাহির হইবার আইন-কানুন	২৫৮
পরিশিষ্ট	২৭২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা

সমস্যার ধরন—প্রকৃতি

মানব সভ্যতার প্রধানতম ও জটিলতম সমস্যা দুইটি। এই দুইটি সমস্যার সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের উপর মানব জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতি নির্ভরশীল। এইজন্যই ইহার সমাধানের জন্য আবহমানকাল হইতে দুনিয়ার বিদগ্ধ সমাজ বিব্রত ও চিন্তান্বিত রহিয়াছেন।

প্রথম সমস্যাটি এই যে, সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে। কারণ ইহাই প্রকৃতপক্ষে তমদ্দুনের ভিত্তি-প্রস্তর এবং ইহাতে তিলমাত্র বক্রতার অবকাশ থাকিলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে ইমারত গড়িয়া উঠিবে, তাহাও অবশ্যই বক্র হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হইতেছে মানব জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সম্পর্ক। ইহারও সামঞ্জস্য বিধানে যদি সামান্যতমও অসংগতি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে যুগযুগান্ত কাল ধরিয়া মানব জাতিকে ইহার তিক্ত ফল ভোগ করিতে হইবে।

একদিকে যেমন সমস্যা দুইটির গুরুত্ব এইরূপ, অপরদিকে ইহার জটিলতাও এত বর্ধনশীল যে, মানবপ্রকৃতির যাবতীয় তথ্যের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ না করিয়া কেহ ইহার সমাধানে সমর্থ হইবে না। সত্য সত্যই এইরূপ মন্তব্য যথার্থ হইয়াছে যে, মানব একটি ক্ষুদ্রতম জগত; ইহার শারীরিক গঠন, প্রকৃতিবিন্যাস, ক্ষমতা-যোগ্যতা, বাসনা, অনুপ্রেরণা-অনুভূতি এবং আপন সত্তাবহির্ভূত অসংখ্য সৃষ্টিনিচয়ের সহিত ইহার বাস্তব সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়সমূহ একটি বিশ্বজগতের ন্যায় মানবের অভ্যন্তরে বিরাজমান। এহেন জগতের প্রতি প্রান্তে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে মানবের প্রকৃত পরিচয় লাভ সম্ভব নহে এবং পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় ব্যতীত তাহার মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধানও অসম্ভব।

আবার বিষয়টি এতই জটিল যে, আদিকাল হইতে অদ্যাবধি ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার লীলাভূমি হইয়া রহিয়াছে। প্রথম কথা এই যে, আজ পর্যন্ত জগতের সমুদয় তথ্য মানব সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আজ পর্যন্ত কোন মানবীয় জ্ঞানই চরম পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই অর্থাৎ কোন মানুষই এমন দাবী করিতে পারে না যে, উক্ত জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর সমুদয়ই তাহার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। উপরন্তু যে সমস্ত তত্ত্বের উপর এ-যাবত আলোকপাত করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃতি ও সূক্ষ্মতা আবার এত অধিক যে, বক্তি বিশেষ তো দূরের কথা, দল বিশেষেরও সতর্ক দৃষ্টি উহার উপরে একই সময়ে নিপতিত হয় না। উহার একদিক যদি জ্ঞান-চক্ষে ধরা পড়ে তো অপরদিক তমসাবৃত থাকিয়া যায়। কোথাও দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, আবার কোথাও ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতা দৃষ্টি-পথকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এবম্বিধ দ্বিগুণিত দুর্বলতা সহকারে মানব স্বীয় জীবনের এই সকল সমস্যা সমাধানের সকল প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য থাকিয়া যায় এবং পরিণামে তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিই প্রকট হইয়া পড়ে। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় তথ্য সম্পর্কে সমদর্শিতা লাভ হয়। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য না হইলেও অন্তত আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর সমগ্র দিক এক সংগে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইবে, ততক্ষণ সমদর্শিতা লাভ হইবে না। কিন্তু আবার যে দৃশ্যপটের বিস্তৃতি স্বভাবতই এত অধিক হয় যে, উহার সমগ্রখানি দৃষ্টিপথে পতিত হয় না এবং এতদ্‌সহ প্রকৃতির বাসনা, আগ্রহ ও ঘৃণার অভীপ্সা এত প্রবল হয় যে, যাহাও স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইতেও দৃষ্টি কুঞ্চিত করা হয়। এমন অবস্থা সমদৃষ্টিশক্তি লাভ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমতাবস্থায় যে সমাধান গ্রহণ করা হইবে, তাহাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে হয়ত অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অথবা সংগত সীমা লংঘিত হইবে নতুবা চরম অপ্রাচুর্য ও ন্যূনতা ঘটিবে।

উপরে বর্ণিত প্রধানতম সমস্যা দুইটির মধ্যে প্রথমটিই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা এতদ্বিষয়ে অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে শুধু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং চরম ন্যূনতার এক বিস্ময়কর টানা-হেঁচড়া দেখিতে পাই। আমরা একদিকে দেখিতে পাই যে, নারী মাতারূপে সন্তানাদির অন্ন দান করিয়াছে এবং অর্ধাংগিনী সাজিয়া জীবনের উত্থান-পতনে পুরুষের সাহায্য

করিয়াছে। অপরদিকে সেই নারীকেই আবার সেবিকা অথবা দাসীর কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাকে গরু-ছাগলের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছে। মালিকানা ও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। তাহাকে পাপ-পংকিলতা ও লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন অথবা ক্রমবিকাশের কোন সুযোগই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। আবার কোন সময়ে নারীকে উন্নীত ও পরিস্ফুট করা হইলেও সংগে সংগে চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃংখলতায় তাহাকে নিমজ্জিত করা হইয়াছে। তাহাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হইয়াছে। আবার কখনও তাহাকে 'শয়তানের এজেন্ট' আখ্যায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার তথাকথিত পরিস্ফুটন ও উন্নতির সংগে সংগে মানবতারও অধপতন শুরু হইয়াছে।

এতদৃশ চরম সীমাদ্বয়কে আমরা শুধু দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়া সংগত সীমালংঘন এবং চরম ন্যূনতার নামেই অভিহিত করিতেছি না, বরং অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন ইহার বিষময় পরিণাম আমরা দেখিতে পাই, তখনই নৈতিক পরিভাষায় ইহার একটিকে সংগত সীমালংঘন এবং অপরটিকে চরম অপ্রাচুর্য বা ন্যূনতা বলিয়া থাকি। উপরোল্লিখিত ইতিহাসের পটভূমি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দান করে যে, যখন কোন জাতি বন্য জীবন যাপনের যুগ অতিক্রম করিয়া সভ্যতা ও বসতি স্থাপনের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহাদের নারী দাসী ও সেবিকার ন্যায় পুরষদের সংগে বসবাস করিতে থাকে। প্রথম প্রথম কুখ্যাত শক্তিগুলি তাহাদিগকে ক্রমোন্নতির দিকে লইয়া যায়। কিন্তু তামাদ্দুনিক উন্নতি যখন বিশিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাহারা অনুধাবন করে যে, তাহাদের অর্ধাংগিনীদিগকে অনুন্নত রাখিয়া তাহারা উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিতে পারে না। তখন নিজেদের উন্নতির পথ রুদ্ধ মনে করে এবং প্রয়োজনানুসারে জাতীয় অর্ধাংশকে (নারী) প্রথমাংশের (পুরুষ) সহিত অগ্রসর হইবার যোগ্য করিয়া তোলে। এইভাবে তাহারা ক্ষতিপূরণ করিতে থাকে এবং তখন শুধু ক্ষতিপূরণেই তুষ্ট না হইয়া ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশেষে বংশীয় শৃংখলা-যাহাকে তামাদ্দুনিক ভিত্তিপ্রস্তর বলা হয়-নারী স্বাধীনতার দ্বারা ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যায়। নৈতিক অবনতির সংগে সংগে মানসিক, শারীরিক ও বৈষয়িক শক্তি নিচয়ের অবনতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিস্ফুট হয়। ইহার শেষ পরিণতি ধ্বংস ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

ইতিহাস হইতে বিস্তৃতভাবে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতে গেলে সন্দর্ভের কলেবর বর্ধিত হইবে বলিয়া আমরা এখানে মাত্র দুই–চারিটির উল্লেখ সমীচীন মনে করিতেছি।

গ্রীস

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গ্রীস সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। এই জাতির প্রাথমিক যুগে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন সম্পর্কিত অধিকার, সামাজিক আচার প্রভৃতির দিক হইতে নারীর মর্যাদা নিতান্ত অধপতিত ছিল। গ্রীস পুরাণে কল্পিত নারী 'পান্ডোরাকে' মানবের দুঃখ–দুর্দশার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেইরূপ হযরত হাওয়া (আ)–কে ইহুদী পুরাণে উক্ত বিষয়ের জন্য দায়ী করা হইয়াছে। হযরত হাওয়া (আ) সম্পর্কিত কল্পিত মিথ্যা কাহিনী ইহুদী ও খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি নীতি, আইন–কানুন, সামাজিক ক্ষেত্রে, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকেও যে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। 'পান্ডোরা' সম্পর্কে গ্রীকগণ যে ধারণা পোষণ করিত, তাহাও তাহাদের মানসিকতাকে সমভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাহাদের দৃষ্টিতে নারী একটি নিকৃষ্ট জীব ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোনই মর্যাদা ছিল না এবং সম্মানিত মর্যাদা একমাত্র পুরুষের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কিয়ৎ সংশোধনীসহ এই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের এতটুকু প্রভাব পরিলক্ষিত হইল যে, নারীর আইন সম্পর্কিত অধিকার পূর্ববতই রহিল, তবে সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাকে উন্নত মর্যাদা দান করা হইল। সে গ্রীকদের গৃহরাণী হইল। তাহার কর্তব্যকর্ম গৃহাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ রহিল। এই সীমারেখার মধ্যে তাহার পূর্ণ কর্তৃত্বও ছিল। তাহার সতীত্ব অতীব মূল্যবান ছিল এবং ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। সম্ভ্রান্ত গ্রীক পরিবারে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে নারী–পুরুষের প্রকোষ্ঠ পৃথক ছিল। তাহাদের রমণিগণ নারী-পুরুষের মিলিত বৈঠকে যোগদান করিত না। জনসাধারণের প্রেক্ষাগৃহে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইত না। বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাকেই তাহারা সম্মানজনক মনে করিত। বীরাংগনার জীবন যাপন অ্যতন্ত ঘৃণিত ও অভিশপ্ত ছিল। ইহা তৎকালীন অবস্থা ছিল, যখন গ্রীক জাতি অতীব শক্তিশালী ও দ্রুত উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে নৈতিক পাপাচার

বিদ্যমান থাকিলেও তাহা ছিল সীমাবদ্ধ। গ্রীক রমণিগণ পবিত্রতা, শ্লীলতা ও সতীত্বের দাবী করিতে পারিত এবং পুরুষগণ তাহার বিপরীত ছিল। তাহারা এতাদৃশ গুণাবলীর প্রত্যাশী ছিল না এবং তাহারা যে পবিত্র জীবন যাপন করিবে এমন আশাও করা যাইত না। বেশ্যা সম্প্রদায় গ্রীক সমাজের একটি অভিন্ন অংশ ছিল। এই সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপন পুরুষের জন্য কোনক্রমেই দূষণীয় ছিল না।

গ্রীকদের মধ্যে ক্রমশ প্রবৃত্তি পূজা ও কামোদ্দীপনার প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে লাগিল এবং এই যুগে বেশ্যা-সম্প্রদায় এতখানি উন্নত মর্যাদা লাভ করিল যে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বেশ্যালয় গ্রীক সমাজের আপামর-সাধারণের কেন্দ্র ও আড্ডাখানায় পরিণত হইল। দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি নক্ষত্ররাজি উক্ত চন্দ্রকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিত। বেশ্যাগণ কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রীর আসনই গ্রহণ করিত না; বরং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনাও তাহাদের সমক্ষে সম্পাদিত হইত। যেই সমস্ত সমস্যার সহিত জাতির জীবন-মরণ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই সকল ব্যাপারেও বেশ্যাদের মতামতকে চূড়ান্ত মনে করা হইত। অথচ তাহাদের বিচার-বিবেচনায় কোন ব্যক্তির উপর কস্মিনকালেও সুবিচার করা হইত না। সৌন্দর্যপূজা গ্রীকদের মধ্যে কামাগ্নি প্রবলাকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। যেই প্রতিমূর্তি অথবা শিল্পের নগ্ন আদর্শের প্রতি তাহারা সৌন্দর্য লালসা প্রকাশ করিত, তাহাই তাহাদের কামাগ্নির ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের মানসিকতা এত বিকৃত হইল যে, কামাগ্নি পূজাকে তাহারা নৈতিকতার দিক দিয়া কোনরূপ দূষণীয়ই মনে করিত না। তাহাদের নৈতিক মাপকাঠি এতখানি পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, বড় বড় দার্শনিক ও নীতিবিদ ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকে কদর্য ও দূষণীয় মনে করিত না। সাধারণভাবে গ্রীকগণ বিবাহকে একটা অনাবশ্যক প্রথা মনে করিত এবং বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের প্রকাশ্য সংমিলন যুক্তিযুক্ত মনে করিত। অবশেষে তাহাদের ধর্মও তাহাদের পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করিল। কামদেবীর (Aphrodite) পূজা সমগ্র গ্রীসে বিস্তৃতি লাভ করিল। গ্রীক-পুরাণে কামদেবী সম্পর্কে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সে জনৈক দেবতার পত্নী হইয়া অপরাপর তিনজন দেবতা ও একজন মানবের সংগে প্রেমপূর্ণ দৈহিক সম্পর্ক সংস্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের যৌনমিলনের ফলে যে সন্তান

লাভ হইল, উত্তরকালে সেই কামদেব (কিউপিড) নামে অভিহিত হয়। এই কামদেব গ্রীকদের উপাস্য বা মা'বুদ ছিল। ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, যেই জাতি এইরূপ জঘন্য চরিত্রকে শুধু তাহাদের আদর্শ নহে, উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নৈতিক মানদন্ড কত নিম্নস্তরের ছিল! এবম্বিধ নৈতিক অধপতনের পরে কোন জাতির পুনরুত্থান সম্ভব নহে। এই নৈতিক অধপতনের যুগেই ভারতে 'বামমার্গীয়' এবং ইরানে 'মজদকীয়' মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বেবিলনে বেশ্যাবৃত্তি ধর্মীয় শূচিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। ইহার পরিণামে পরবর্তীকালে বেবিলন শুধু অতীত কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিল এবং জগতে তাহার অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন হইয়া গেল।

গ্রীসে যখন কামদেবীর পূজা আরম্ভ হইল, তখন গণিকালয়গুলি উপাসনা মন্দিরে পরিণত হইল। নির্লজ্জ বেশ্যা নারী দেবযানী বা দেবীতে পরিণত হইল এবং ব্যভিচার কার্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মর্যাদায় উন্নীত হইল।

এইরূপ কামপূজার দ্বিতীয় সুস্পষ্ট পরিণাম এই হইয়াছিল যে, গ্রীক জাতির মধ্যে 'লুত' সম্প্রদায়ের দুষ্কার্যাবলী মহামারীর ন্যায় সংক্রমিত হইয়া পড়িল এবং তাহা ধর্মীয় ও নৈতিক সমর্থন লাভ করিল। ' হোমার' ও'হিসিউড'– এর শাসনকালে এই সমস্ত কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতি যখন সৌন্দর্যবিজ্ঞান ও রসবিজ্ঞানের নামে (Aesthetics) নগ্নতা ও যৌনসম্ভোগের পূজার প্রবর্তন করিয়া দিল, তখন কামাগ্নির লেলিহান শিখা এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, গ্রীক জাতিকে স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া এক প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করিল। শিল্প বিশেষজ্ঞগণ ইহাকে দুই ব্যক্তির মধ্যে 'বন্ধুত্বের দৃঢ় সম্পর্ক' নামে অভিহিত করিল। গ্রীকদেশীয় 'হারমেডিয়াস' ও 'এরস্টগীন'–ই সর্বপ্রথম এতদূর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল যে, তাহাদের স্মরণার্থে আপন মাতৃভূমিতে তাহাদের প্রতিমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক অবৈধ ও অস্বাভাবিক প্রেম–সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই যুগের পর গ্রীকদের জাতীয় জীবনে আর কোন নবযুগের সূত্রপাত হয় নাই।

রোম

গ্রীক জাতির পরে জগতে রোমক উন্নতির সুযোগ আসিয়াছিল। এখানেও আমরা পূর্বের ন্যায় উত্থান–পতনের চিত্র দেখিতে পাই। রোমকগণ যখন

বর্বরতার অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃশ্যপটে উদিত হয়, তখন তাহাদের সামাজিক শৃংখলার চিত্র এইরূপ দেখা যায় যে, পুরুষ তাহার পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা হইয়াছে; স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর তাহার পূর্ণ প্রভূত্ব রহিয়াছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিতেও ক্ষমতাবান হইয়াছে।

বর্বরতা যখন কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইল এবং তাহযীব-তমদ্দুনের ক্ষেত্রে রোমকগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন প্রাচীন পারিবারিক রীতিনীতি বজায় থাকিলেও তাহার কঠোরতার লাঘব এবং অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমিত হইল। রোমান সাধারণতন্ত্রের উন্নতিকালে গ্রীকদের ন্যায় পর্দা-প্রথার প্রচলন হয় নাই। কিন্তু নারী ও যুবক-যুবতিগণকে পারিবারিক শৃংখলায় সম্ভ্রমশীল করিয়া রাখা হইয়াছিল। সতীত্ব, সাধুতা, বিশেষ করিয়া নারীদের ক্ষেত্রে এক অমূল্য রত্ন ছিল এবং ইহাই ছিল সম্ভ্রমশীলতার কষ্টিপাথর। নৈতিক কষ্টিপাথরও ছিল উচ্চমানের। একবার রোমান সিনেটের জনৈক সদস্য আপন কন্যার সম্মুখে তাহার স্ত্রীকে চুম্বন করিয়াছিল। ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্রের প্রতি কঠোর অবমাননা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় এবং সিনেট গৃহে তাহার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনাসূচক ভোট প্রদত্ত হয়। তৎকালে একমাত্র বিবাহ প্রথাই ছিল স্ত্রী-পুরুষের মিলনের বৈধ ও সম্মানিত পন্থা। নারীর সম্মান নির্ভর করিত তাহার মাতৃত্বে। বেশ্যাশ্রেণী যদিও বিদ্যমান ছিল এবং একটি সীমারেখা পর্যন্ত তাহাদের সংগে মেলামেশার অধিকারও পুরুষদের ছিল, তথাপি রোমদেশীয় জনসাধারণ ইহাকে অত্যন্ত হেয় মনে করিত এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখা হইত।

তাহযীব-তমদ্দুনের উন্নতির সংগে সংগে নারীদের সম্পর্কে রোমকদের দৃষ্টিভংগীরও পরিবর্তন হইতে লাগিল। ক্রমশ বিবাহ-তালাকে বিধি-ব্যবস্থার এবং পারিবারিক রীতিনীতিরও এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে, অবস্থা অতীত অবস্থার বিপরীত হইয়া গেল। বিবাহ শুধু একটা আইনগত চুক্তিনামায় (Civil Contract) পরিণত হইল-যাহার স্থায়িত্ব ও বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর উপরই নির্ভর করিত। দাম্পত্য সম্পর্কের দায়িত্ব গুরুত্বহীন হইয়া পড়িল। নারীকে উত্তরাধিকার ও ধন-সম্পত্তির মালিকানার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইল। রোমান আইন তাহাকে পিতা ও স্বামীর কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীন করিয়া

দিল। রোমান নারীগণ সামাজিক ক্ষেত্রেই শুধু স্বাধীনতা লাভ করিল না, জাতীয় ধন-সম্পদের একটা বিরাট অংশও ক্রমশ তাহাদের কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়িল। তাহারা স্বামী দিগকে উচ্চহারের সুদে টাকা কর্জ দিতে লাগিল। ফলে স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হইল। তালাক এত সহজ বস্তু হইয়া পড়িল যে, কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হইতে লাগিল। বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পন্ডিত স্নীকা (খ্রীস্টপূর্ব ৫৬-খ্রীস্টপূর্ব ৪) তালাকের আধিক্যের জন্য অনুতাপ করিয়া বলেন, 'আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নহে। নারী তাহার স্বামী সংখ্যার দ্বারাই নিজের বয়স গণনা করে।'

এই যুগে নারী পরস্পর বহু স্বামী গ্রহণ করিতে থাকে। মার্শাল (খ্রী. ৪৩-১০৪) একটি নারীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সে দশজন স্বামী গ্রহণ করিয়াছিল। জুদনিয়েল (খ্রী. ৬০-১৪০) একটি নারী সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, সে পাঁচ বৎসরে আটজন স্বামী গ্রহণ করিয়াছে। সেন্ট জুরুম (খ্রী. ৩৪০-৪২০) এমন এক নারীর বর্ণনা করিয়াছেন, যে তাহার জীবনে বত্রিশ জন স্বামী গ্রহণ করিয়াছে এবং সে তাহার শেষ স্বামীর একবিংশ পত্নী ছিল।

বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের যৌনমিলন যে দূষণীয়, এমন ধারণাও এ যুগে মানুষের মন হইতে দূরীভূত হইতে লাগিল। বড় বড় নীতিবিদগণও ব্যভিচারকে একটি সাধারণ কার্য মনে করিত। খ্রী. পূর্ব ১৮৪ সনে কাটো (Cato) রোমে নীতিপরিদর্শক ও নীতিতত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনিও যৌনসুলভ লাম্পট্যকে সংগত বলিয়াছেন। সিসেরো নব্য-যুবতীদের জন্য নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করার পরামর্শ দিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয়তা, নিস্পৃহতা, ঔদাসিন্য, তিতিক্ষা, নিঃসংগতা প্রভৃতি দার্শনিক মূলনীতির (Stoics) পূর্ণ অনুসারী (Epictetus) তাঁহার শিষ্যমন্ডলীকে নিম্নরূপ উপদেশ দান করিতেনঃ

> যতদূর সম্ভব বিবাহের পূর্বে নারীদের সংস্পর্শ হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু যদি কেহ এ বিষয়ে সংযমী হইতে না পারে, তাহাকে ভর্ৎসনা করিও না।

অবশেষে নৈতিক চরিত্র ও সামাজিকতার বন্ধন এত শিথিল হইয়া পড়িল যে, কামপ্রবণতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোম সাম্রাজ্য নিমজ্জিত হইয়া গেল। রংগালয়ে নির্লজ্জতা ও নগ্নতার অভিনয় শুরু হইল। নগ্ন, কামোদ্দীপক ও

অশ্লীল চিত্র দ্বারা গৃহের শোভা বর্ধন আবশ্যক বোধ করা হইল। বেশ্যাবৃত্তি এত প্রসার লাভ করিল যে, রোম সম্রাট 'টাইবেরিসের' (খ্রী. ১৪–৩৭) শাসনকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদিগকে বেশ্যা–নর্তকীয় কার্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ফ্লোরা (Flora) নামে একটি ক্রীড়া সেইকালে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ ইহাতে উলংগ নারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা হইত। নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একত্রে স্নানাবগাহন প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমীয় সাহিত্যে অশ্লীল নগ্ন চিত্রসম্বলিত প্রবন্ধাদি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করা হইত এবং এইরূপ সাহিত্যই আপামরসাধারণের সুখপাঠ্য ও সমাদৃত ছিল। সাহিত্যের মান এত নিম্নস্তরের ছিল যে, এই সমস্ত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য প্রবন্ধ রচনায় রূপাত্মক অথবা শ্লেষাত্মক বাক্য যোজনারও আবশ্যক অনুভূত হইত না।

পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত হইবার পর রোম সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অট্টালিকা এমনভাবে ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল যে, তাহার শেষ ইষ্টকটিরও অস্তিত্ব রহিল না।

খ্রীস্টীয় ইউরোপ

পাশ্চাত্য জগতের এবম্বিধ নৈতিক অধপতনের প্রতিবিধানের জন্য ঈসায়ী ধর্মের আবির্ভাব হয়। ইহাতে প্রথম প্রথম বেশ সুফল পরিলক্ষিত হইল। অশ্লীলতার দ্বার রুদ্ধ হইল, জীবনের প্রতিক্ষেত্র হইতে নগ্নতা দূরীভূত হইল, বেশ্যাবৃত্তি রহিতকরণের ব্যবস্থালম্বন করা হইল; বেশ্যা, গায়িকা ও নর্তকীদিগকে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত করা হইল এবং মানুষের মধ্যে পূত–পূণ্য চরিত্রের ধারণা অন্তর্নিবিষ্ট করা হইল। কিন্তু নারী ও যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় ধর্ম–যাজকদের যে ধারণা ছিল তাহা চরম সীমা অতিক্রম করিল। ফলে ইহাদ্বারা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হইল।

তাহাদের প্রাথমিক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, নারীই পাপের মূল উৎস। পুরুষের জন্য নারী পাপ আন্দোলনের উৎস এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। মানবের যাবতীয় দুঃখ–দুর্দশা নারী হইতেই হইয়াছে। নারীরূপে জন্মলাভ করা এক লজ্জাস্কর ব্যাপার। তাহার রূপ– সৌন্দর্যের জন্য তাহার লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ উহাই শয়তানের মারণ–যন্ত্র। যেহেতু সে জগত ও

জগতবাসীর জন্য অভিশাপ আনয়ন করিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে চিরদিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

Tertullian নামক খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রাথমিক যুগের ধর্মগুরু নারী সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেনঃ

> সে শয়তানের আগমনের দ্বারস্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আকর্ষণকারিণী, খোদার আইন ভংগকারিণী ও পুরুষের ধ্বংসকারিণী।

খ্রীস্টীয় তাপসশ্রেষ্ঠ (Chrysostum) নারী সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ

> –একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা, একটি আনন্দদায়ক বিপদ, পারিবারিক আশংকা, ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী, একটি সজ্জিত বিঘ্ন।

তাঁহার দৃষ্টিভংগী এই ছিল যে, নারী–পুরুষের যৌন সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে হইলেও উহা মূলত একটি অপবিত্র কার্য এবং ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নৈতিক চরিত্রের এতাদৃশ বৈরাগ্যসুলভ ধারণা কামগন্ধহীন দর্শনের (Neo Platonism) প্রভাব সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল। খ্রীস্টীয় মতবাদ তাহাকে চরমে পৌছাইয়া দিল। এখন কৌমার্য ও কুমারীত্ব নৈতিক চরিত্রের কষ্টিপাথর হইয়া পড়িল। দাম্পত্য জীবনকে নৈতিক চরিত্রের দিক হইতে ঘৃণিত ও অধপতিত মনে করা হইল। লোকে বিবাহ হইতে বিরত থাকাকে পুণ্যের কাজ ও উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক মনে করিতে লাগিল। পবিত্র জীবন যাপনের পন্থা এই হইল যে, কেহ একেবারে বিবাহই করিবে না অথবা বিবাহ করিলেও নারী–পুরুষ তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা–সমিতিতে এইরূপ আইন প্রণীত হইল যে, গীর্জার কর্মচারিগণ নির্জনে তাহাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারিবে না, এমন কি দেখা–সাক্ষাত করিতে হইলেও উন্মুক্ত স্থানে অন্তত দুইজন পুরুষের উপস্থিতিতে করিতে হইবে। বৈবাহিক সম্পর্ক যে অপবিত্র, এই ধারণা নানা প্রকারের খ্রীস্টানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এখানে প্রচলিত একটি রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যেদিন গীর্জায় কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইত, পূর্বরাত্রে একত্র বসবাসকারী স্বামী–স্ত্রীকে তাহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হইত না। কারণ যৌন সম্মিলনের দ্বারা তাহারা পাতকী হইয়াছে এবং এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে কোন পবিত্র স্থানে গমন করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে

পারে না। এইরূপ বৈরাগ্যসূলভ মনোভাব সমগ্র পারিবারিক সম্পর্ক, এমনকি মাতা–পুত্রের সম্পর্কও তিক্ততর করিয়া তুলিয়াছিল এবং বিবাহের ফলে যে সম্পর্ক দানা বাঁধিয়া উঠিত, তাহাকে অপবিত্র ও পাপজনক মনে করা হইত।

উপরিউক্ত উভয় প্রকারের দৃষ্টিভংগী শুধুমাত্র নৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে নারীর মর্যাদাকে অতিমাত্রায় হেয় করে নাই বরং কৃষ্টিগত আইন–কানুনকে এতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে, একদিকে বৈবাহিক জীবন নারী–পুরুষের জন্য বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরদিকে সমাজে নারীর মর্যাদা সকল দিক দিয়া হেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীস্টধর্মীয় বিধি–বিধান অনুযায়ী যত প্রকার আইন পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত হইয়াছে, উহার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. জীবিকার্জন ক্ষেত্রে নারীকে সম্পূর্ণ অসহায় করিয়া পুরুষের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিষয়–সম্পত্তির উপর অধিকার অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি স্বোপার্জিত অর্থের উপরও তাহার কর্তৃত্ব ছিল না। সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল স্বামীর।

২. 'তালাক' ও 'খোলার' অনুমতি দেওয়া হইত না। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য হউক না কেন, পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কের জন্য সংসার নরকতুল্য হউক না কেন, তথাপি ধর্ম ও আইন উভয়ই স্বামী–স্ত্রীকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিত। অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক হইলে উভয়কে এই শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হইত যে, তাহারা কেহই দ্বিতীয়বার অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহা প্রথমোক্ত নীতি হইতে কঠোরতর ছিল। কারণ এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন নারী–পুরুষের জন্য সারা জীবন বৈরাগ্য পালন অথবা যৌন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন পন্থা থাকে না।

৩. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর পুনরায় বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও পাপজনক ছিল। খ্রীস্টীয় পাদরিগণ বলিতেন যে, ইহা শুধু পাশবিক প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং ভোগ লালসা ব্যতীত আর কিছু নহে। তাঁহারা ইহাকে 'মার্জিত ব্যভিচার' নামে অভিহিত করিতেন। গীর্জার কর্মচারিগণের

জন্য দ্বিতীয় বিবাহ অপরাধজনক ছিল। দেশের সাধারণ আইনানুযায়ী কোন কোন স্থানে ইহার অনুমতিই দেওয়া হইত না। কোথাও আবার আইনগত বাধা না থাকিলেও ধর্মীয় ভাবাপন্ন জনসাধারণ ইহাকে বৈধ মনে করিত না।

আধুনিক ইউরোপ

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ যখন ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ তামাদ্দুনিক রীতিনীতি বিদ্যমান ছিল–যাহা খ্রীস্টীয় নৈতিক শাসন, জীবন দর্শন ও সামন্ততন্ত্রের জঘন্য সমন্বয়েই গঠিত হইয়াছিল। ইহা মানবীয় আত্মাকে অপ্রাকৃতিক শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। এই প্রচলিত রীতি–নীতিকে চূর্ণ করিয়া তদস্থলে এই নূতন রীতি–শৃংখলা প্রবর্তনের জন্য নব্য–ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে দৃষ্টিভংগী উপস্থিত করিলেন তাহার ফলে ফরাসী বিপ্লব জন্মলাভ করিল। তাহার পর পাশ্চাত্য তাহযীব–তমদ্দুনের উন্নতির পদক্ষেপ এমন পথে পরিচালিত হইল, যাহার শেষ পরিণতি বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নবযুগের প্রারম্ভে নারী জাতিকে তাহাদের অধপতন হইতে উন্নীত করিবার জন্য যাহা কিছু করা হইয়াছিল, তাহার সুফল সামাজিক জীবনেই প্রতিফলিত হইল। বিবাহ ও তালাকের পূর্বতন কড়াকড়ি হ্রাস করা হইল। নারীদের জীবিকার্জনের অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। যে নৈতিক দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে নারীকে হেয় ও অবহেলিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার সংশোধন করা হইল। যেই সমস্ত সামাজিক মূলনীতির কারণে নারী দাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিত, তাহাও সংশোধন করা হইল। পুরুষের ন্যায় নারীর জন্য উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইল। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক রীতিনীতি ও অন্ধকার যুগের নৈতিক ধারণাসমূহের চাপে নারীদের নিষ্পেষিত যোগ্যতা ও প্রতিভা এইরূপ নানাবিধ সুব্যবস্থার ফলে ক্রমশ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাহারা গৃহ সামলাইল, সমাজে পবিত্রতা আনয়ন করিল এবং জনগণের মংগল সাধন করিল। স্বাস্থ্যের উন্নতি, সন্তানাদির প্রতিপালন, রোগীর পরিচর্যা, গার্হস্থ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতি যে সব গুন নূতন তাহযীবের সংগে সংগে নারীদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা ঐ আন্দোলনেরই প্রাথমিক ফল ছিল। কিন্তু

যে সমস্ত দৃষ্টিভংগীর গর্ভ হইতে এই আন্দোলন জন্মলাভ করিল, প্রথম হইতেই উহার মধ্যে সংগত সীমালংঘনের অভীপ্সা বিদ্যমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই অভীপ্সা অনুযায়ী কার্যকলাপ বেশ অগ্রসর হইয়াছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ অসংযম ও অমিতাচারের দ্বিতীয় প্রান্ত সীমায় উপনীত হইল।

যেই সকল দৃষ্টিভংগীর উপর নূতন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হইল, তাহা নিম্নরূপ তিনটি শিরোনামায় ব্যক্ত করা যায়ঃ

ক) নারী–পুরুষের মধ্যে সাম্য বিধান,
খ) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও
গ) নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

এই তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাব্য পরিণাম ফল হইতে পারে, তাহাই অবশেষে প্রকট হইয়া পড়িল।

প্রথমত, সাম্যের এইরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করা হইল যে, নারী ও পুরুষ নৈতিক মর্যাদা ও মানবীয় অধিকারের দিক দিয়াই শুধু সমান নহে বরং তামাদ্দুনিক জীবনে পুরুষ যে সব কার্য করে, তাহারাও তাহাই করিবে এবং নৈতিক বন্ধন পুরুষের জন্য যেমন শিথিল করা হইয়াছে, নারীদের জন্যও অনুরূপ শিথিল করা হইবে। সাম্যের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য নারী তাহার দৈনন্দিন কার্যাবলীর প্রতি উদাসীন ও বিদ্রোহী হইয়া পড়িল। বস্তুত এই সমস্ত প্রকৃতিগত দৈনন্দিন কার্য সমাধার উপর তমদ্দুন ও মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। অর্থনৈতিম, রাজনৈতিক ও দলীয় প্রবণতা তাহার ব্যক্তিত্বকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিল। নির্বাচনী অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অফিস ও কল–কারখানায় চাকুরি গ্রহণ, স্বাধীন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা, ক্রীড়া, ব্যায়ামাদি ও সমাজের চিত্তবিনোদনকারী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ, ক্লাব, রংগমঞ্চ, নৃত্যগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সময় ক্ষেপণ এবং এবম্বিধ বহু প্রকার অকরণীয় ও অবক্তব্য কার্যকলাপ তাহাদের মন ও মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করিল যে, দাম্পত্য জীবনের গুরু দায়িত্ব, সন্তানাদির প্রতিপালন, পারিবারিক সেবা–শুশ্রূষা, গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় করণীয় বিষয়গুলি তাহার কর্মসূচী–বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

উপরন্তু তাহাদের প্রকৃতিগত ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাহাদের আন্তরিক ঘৃণা জন্মিল। এখানে পাশ্চাত্য পারিবারিক শৃংখলা–যাহাকে তামাদ্দুনিক ভিত্তি-প্রস্তর বলা হয়–কদর্যভাবে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। যেই গার্হস্থ্য জীবনের সুখ–শান্তির উপর মানবের কার্যক্ষমতার পরিস্ফুটন নির্ভরশীল, তাহা প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তামাদ্দুনিক পরিচর্যায় নারী–পুরুষের পারস্পরিক সুষ্ঠু পন্থাই বৈবাহিক সম্পর্ক–উহা এখন মাকড়সার জাল অপেক্ষা ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত ও প্রসূত হত্যার দ্বারা বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইতে লাগিল। নৈতিক সাম্যের ভ্রান্ত ধারণা নারী–পুরুষের মধ্যে চরিত্রহীনতার সাম্য আনয়ন করিল। যেই নির্লজ্জতা পুরুষের জন্যও লজ্জাজনক ছিল, তাহা আর নারীর জন্য লজ্জাকর রহিল না।

দ্বিতীয়ত, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাহাকে পুরুষ হইতে বেপরোয়া করিয়া দিল। পূর্বতন রীতিনীতি অনুযায়ী পুরুষ উপার্জন করিত এবং নারী গৃহ-শৃংখলা রক্ষা করিত। এখন তাহার পরিবর্তন ঘটিল। এখন নারী–পুরুষ উভয়েই উপার্জন করিবে এবং গৃহ–শৃংখলার ভার বহিরাগত তৃতীয় ব্যক্তির উপর অর্পিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। এখন একমাত্র যৌন সম্পর্ক ব্যতীত নারী–পুরুষের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক রহিল না, যাহার জন্য একে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য নারী–পুরুষকে অবশ্যম্ভাবীরূপে চিরন্তন পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কোন এক গৃহে যৌথ জীবন যাপন করিতে হইবে–ইহার কি প্রয়োজন আছে? যেই নারী স্বীয় জীবিকা অর্জন করিতে পারে, যাবতীয় আবশ্যক মিটাইতে সক্ষম এবং অপরের নিরাপত্তা ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী নহে, সে শুধু যৌন সম্ভোগের জন্য কেন একটি পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে? কেনই–বা সে নৈতিক ও আইনগত বাধা–নিষেধ আপন স্কন্ধে স্থাপন করিবে? এবং কেনই–বা একটি পরিবারের গুরুদায়িত্ব বহন করিবে? বিশেষ করিয়া যখন নৈতিক সাম্যের ধারণা তাহার যৌন সম্ভোগের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে, তখন সে অভিলাষ চরিতার্থের এমন সহজ–সুন্দর সুরুচিসম্মত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগ ও দায়িত্বসম্পন্ন প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিবে কেন? ধর্মের সংগে পাপ–ভয়ও দূরীভূত হইয়াছে। সমাজ তাহাকে আর অশ্লীলতার জন্য তিরস্কার করিবে না বলিয়া তাহার অন্তর হইতে সমাজের ভীতিও দূর হইয়াছে। তাহার একমাত্র ভয় ছিল অবৈধ সন্তানের। কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য

গর্ভনিরোধেরও ব্যবস্থা আছে। ইহা সত্ত্বেও যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে গর্ভ-নিপাতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। ইহাতেও বিফলমনোরথ হইলে, প্রসূতকে গোপনে হত্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু একান্তই যদি হতভাগ্য মাতৃত্বের অভিলাষ (যাহা দুর্ভাগ্যবশত এখনও বিলুপ্ত হয় নাই) প্রসূতকে হত্যা করিতে বাধা দান করে, তাহাতেই-বা ক্ষতি কি? কারণ বর্তমানে 'কুমারী মাতা' এবং জারজ সন্তানের সপক্ষে এত আন্দোলন হইতেছে যে, যেই ব্যক্তি তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবার সৎ সাহস করিবে তাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করা হইবে।

ইহাই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিয়াছে। আজকাল প্রতিটি দেশে লক্ষ লক্ষ যুবতী নারী চিরকুমারীত্ব বরণ করিয়া কামাসক্ত জীবন যাপন করিতেছে। আবার বহু সংখ্যক নারী আকস্মিক প্রেম-ফাঁদে পড়িয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একমাত্র যৌন সম্পর্ক ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্য কোনরূপ আবশ্যকীয় যোগসূত্র থাকে না-যাহা তাহাদিগকে চিরমিলনের সূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে। এইজন্য বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্কে কোন স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার অবকাশ নাই। স্বামী-স্ত্রী কেহ কাহার পরোয়া করে না বলিয়া তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক লইয়া কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা অথবা সমঝোতার জন্যও তাহারা প্রস্তুত নহে। নিছক যৌন প্রেমানুরাগ অবিলম্বেই মন্দীভূত হইয়া পড়ে; ইহার ফলে তুচ্ছ মতদ্বৈধতা, এমন কি অধিকাংশ সময়ে শুধু ঔদাসীন্য তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। একমাত্র এই কারণেই অধিকাংশ বিবাহই তালাক অথবা আইনসম্মত পৃথকীকরণে পর্যবসিত হইয়া থাকে। গর্ভনিরোধ, গর্ভনিপাত, ভ্রূণ ও প্রসূতহত্যা, জন্মহারের ন্যূনতা এবং জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি বহুলাংশে উপরিউক্ত কারণসমূহেরই শেষ পরিণতি। কুকার্য, নির্লজ্জতা ও রতিজ দুষ্ট ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও উপরিউক্ত কারণেই হইয়া থাকে।

তৃতীয়ত, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারীদের মধ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শন, নগ্নতা ও অশ্লীলতা স্পৃহাকে অতিমাত্রায় বর্ধিত করিয়াছে। প্রকৃতিগতভাবে যৌন আকর্ষণ নর-নারীর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে এবং উভয়ের অবাধ মেলামেশার ফলে উক্ত যৌনাকর্ষণ অতিরিক্ত বর্ধিত হয়। আবার এতাদৃশ মিশ্র সমাজে স্বাভাবিকভাবে নর-নারী উভয়ের মধ্যে এই অদম্য স্পৃহা জন্মে যে,

তাহাদিগকে বিপরীত লিংগের লোকের জন্য চিত্তাকর্ষক সাজিতে হইবে। যেহেতু নৈতিক দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের ফলে এইরূপ কার্য নিন্দনীয় বিবেচিত হয় না, বরং প্রকাশ্যই প্রেম-নিবেদন প্রশংসার্হ মনে করা হয়, সেইজন্য রূপ-লাবণ্যের আড়ম্বর ক্রমশ সকল সীমা লংঘন করিয়া চলে। অবশেষে ইহা নগ্নতার চরম সীমায় উপনীত হয়। পাশ্চাত্য তাহযীবের বর্তমান পরিস্থিতি ইহাই। আজকাল বিপরীত লিংগের জন্য চৌম্বক সাজিবার স্পৃহা নারীদের মধ্যে এত প্রবল হইয়াছে যে, চাকচিক্যময় মনোহর সাজ-পোশাক ও লিপস্টিক, রুজ্ প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যাদি সুশোভিত রূপসজ্জায় তাহাদের মনের সাধ মিটে না। অবশেষে হতভাগিনীর দল বিবস্ত্র হইয়া পড়ে। এদিকে পুরুষদের পক্ষ হইতে অধিকতর নগ্নতার দাবী উত্থিত হয়। কারণ কামলিপ্সার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নগ্ন সৌন্দর্যের দ্বারা নির্বাপিত না হইয়া অধিকতর লেলিহান হইয়া উঠে এবং অধিকতর নগ্নতার দাবী করে। মরু সাইমুম তাড়িত পিপাসার্ত পথিকের এক চুমুক পানি যেমন তৃষ্ণা বৃদ্ধিই করে, তেমনি এই হতভাগাদের যৌন পিপাসা এক চরম তৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে। সীমাহীন যৌন-তৃষ্ণায় অতৃপ্ত হইয়া এই সকল কামলিপ্সুর দল সর্বদা সকল সম্ভাব্য উপায়ে পরস্পরের যৌন তৃপ্তি বিধানের উপাদান সরবরাহ করিয়া থাকে। নগ্নচিত্র, যৌনোদ্দীপক সাহিত্য, প্রেমপূর্ণ গল্প, নগ্ন বলনৃত্য এবং যৌনানুরাগ পরিপূর্ণ ছায়াচিত্র কিসের জন্য? সমস্তই উক্ত অগ্নি নির্বাপিত করিবার-প্রকৃতপ্রস্তাবে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিবার উপাদানস্বরূপ যাহা এই ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেকের কণ্ঠ সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বীয় দুর্বলতাকে ঢাকিবার জন্য ইহার নাম দিয়াছে 'আর্ট'।

এক্ষণে ঘূণেধরা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুত আজ পর্যন্ত ঘূণেধরা কোন জাতিই বাঁচিয়া থাকে নাই। যেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জীবন ধারণ ও উন্নতি বিধানের জন্য দান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ঘূণেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুত যাহারা চতুর্দিক হইতে কামোদ্দীপনার পীড়নে নিপীড়িত হইয়া জীবনযাপন করে, প্রতি মুহূর্তে যাহাদের আবেগ-অনুভূতিকে নব নব প্ররোচনা ও নব নব উত্তেজনার সম্মুখীন হইতে হয়, একটি উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশ যাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, নগ্ন চিত্র, অশ্লীল সাহিত্য, চিত্তাকর্ষক সংগীত, কামোদ্দীপক নৃত্য, প্রেম-প্রণয়পূর্ণ চলচ্চিত্র,

চিত্তহরণকারী জীবন্ত দৃশ্য ও চলার পথে বিপরীত লিংগের সহিত নিত্যনৈমিত্যিক সাক্ষাতকারের সুযোগ-সুবিধা যাহাদের রক্তকণাকে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা কেমন করিয়া সেই নিরাপত্তা, শান্তি ও চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করিবে যাহা গঠমূলক ও সৃজনশীল কার্যে একান্ত অপরিহার্য? এইরূপ উত্তেজনার মধ্যে তাহাদের তরুণ বংশধরগণের জন্য সেই শান্ত সুশীতল ক্ষেত্র কোথায়, যেখানে তাহাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হইতে পারে? সংগ লাভ করিবার সংগে সংগেই তো পাশবিক প্রবৃত্তির দৈত্য তাহাগিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এহেন দৈত্যের নখর কবলিত হওয়ার পর তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

মানবীয় চিন্তাধারায় বেদনাদায়ক নৈরাশ্য

তিন সহস্র বৎসরের ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের কাহিনী পরস্পর এমন একটি বিশাল ভূখন্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, যাহা অতীতেও দুইটি বিরাট সভ্যতার লালন-পালন ক্ষেত্র ছিল এবং যাহার সভ্যতার বিজয়-ডংকা বর্তমানকালেও জগতের বুকে নিনাদিত হইতেছে। এইরূপ কাহিনী মিসর, বেবিলন, ইরান এবং অন্যান্য দেশেরও আছে। প্রাচীন ভারত উপমহাদেশেও শত শত বৎসর যাবত সংগত সীমা লংঘন ও চরম নূন্যতার অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছে। একদিকে নারীকে দাসীরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে; পুরুষ তাহার স্বামী, পতিদেব ও উপাস্য মা'বুদ হইয়াছে- তাহাকে শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বৈধব্যাবস্থায় পুত্রের অধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। স্বামীর চিতায় সে সহমরণ বরণ করিয়াছে। তাহাকে কর্তৃত্ব ও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। বিবাহ ব্যাপারে তাহার উপর এমন নিষ্ঠুর আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে একজন পুরুষের হস্তে সম্প্রদান করা হইয়াছে ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার কর্তৃত্ব ও অধীনতার নাগপাশ হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। ইহুদী এবং গ্রীকদের ন্যায় তাহাকে পাপ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধপতনের প্রতিমূর্তি মনে করা হইয়াছে। তাহার চিরন্তন ব্যক্তিত্বকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করা হইয়াছে।

অপরদিকে যখন তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তখন তাহাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হইয়াছে। সে এমন নিবিড়ভাবে

পুরুষের দেহ-সংগিনী হইয়াছে যে, পরিণামে সে তাহার জাতিসহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই যে লিংগ ও যোনীপূজা, উপাসনালয়ে নগ্ন যুগল মূর্তি, ধর্মীয় বারাংগনা, হোলীর প্রেম-লীলা এবং নদ-নদীতে অর্ধনগ্নস্নান-এই সকল কিসের স্মৃতিবাহক? প্রাচীন ভারতের বামমার্গীয় আন্দোলনের পরে পাপাচার-ব্যাভিচারই শেষ পরিণাম ফল হইয়া রহিল-যাহা ইরান, বেবিলন, গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতেরও তাহযীব-তমদ্দুনের ক্রমোন্নতির পর সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল এবং হিন্দু জাতিকে কয়েক শতাব্দীর জন্য গ্লানি ও অধপতনের অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

এই ইতিবৃত্তের প্রতি গভীর অন্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, নারী সম্পর্কে সাম্য-সুবিচার জ্ঞান লাভ করা, উহা অনুধাবন করা এবং উহার প্রতি অবিচল থাকা মানবের পক্ষে কত দুষ্কর প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্য-সুবিচারের অর্থ এই হইতে পারে যে, একদিকে নারীকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শনের এতখানি সুযোগ দান করা, যাহাতে সে উন্নত কর্মদক্ষতার সহিত মানবীয় তাহযীব-তমদ্দুনের উৎকর্ষ সাধনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপরদিকে আবার এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন সে নৈতিক অধপতন ও মানবতার ধ্বংসের কারণ হইয়া না পড়ে। উপরন্তু পুরুষের কার্যে তাহার সাহায্য-সহযোগিতার এমন পন্থা নির্ণয় করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উভয়ের মিলিত কার্যক্রম তমদ্দুনের জন্য মংগলকর হয়। শত সহস্র বৎসর হইতে জগত এই সাম্য-সুবিচারের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। কখনও সে এক চরম প্রান্তসীমায় উপনীত হইতেছে এবং মানবতার একাংশকে অকর্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। আবার কখনও অপর প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া মানবতার উভয় অংশকে একত্রে মিলিত করিয়া ধ্বংসের অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিতেছে।

তথাপি সাম্য-সুবিচার অবর্তমান নহে, ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু শত-সহস্র বৎসরের সংগত সীমা লংঘন ও চরম শূন্যতার মধ্যে বিবর্তিত হইবার ফলে মানুষের এতখানি মতিভ্রম হইয়াছে যে, স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও চিনিতে পারে না যে, ইহাই তাহার চির ঈপ্সিত বস্তু-যাঁহার সন্ধান সে যুগ যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। এই চির-অভীপ্সতকে দেখিয়া সে ভ্রমবশত নাসিকা কুঞ্চিত করে-বিদ্রূপ করে। যে ব্যক্তির মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাকে হাস্যস্পদ করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এমন একটি শিশুর ন্যায়, যে একটি কয়লা খনির গর্ভে ভূমিষ্ট হইয়াছে এবং তথায় প্রতিপালিত ও বর্ধিত হইয়াছে। সেই কয়লা অধ্যুষিত জলবায়ূ ও তমসাবৃত স্থানই যে তাহার নিকটে স্বাভাবিক মনে হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতপর অন্ধকার কয়লাখনির অভ্যন্তর হইতে ভূপৃষ্ঠে তাহাকে আনয়ন কলি প্রাকৃতিক জগতের সূর্য-করোজ্জ্বল নির্মল প্রান্তরের প্রতিটি বস্তু দর্শনে প্রথমত সে অবশ্য নাসিকা কুঞ্চিত করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তো মানুষ বটে। কয়লার ছাদ ও তারকা- শোভিত আকাশের পার্থক্য নির্ণয় করিতে তাহার কত সময় লাগিবে? দূষিত ও নির্মল বায়ূর পার্থক্য নির্ণয় করিয়া সে কতদিন কাটাইবে?

নব্য যুগের মুসলমান

দুইটি বিপরীত চরম সীমাতিক্রমের গোলক ধাঁধায় বিভ্রান্ত জগতকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম ছিল একমাত্র মুসলমানই। কারণ একমাত্র তাহারই নিকটে ছিল সামাজিক জীবনের যাবতীয় জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান। কিন্তু পৃথিবীর ভাগ্যের ইহা এক বিস্ময়কর ও মর্মন্তুদ পরিহাস যে, এই অমানিশার অন্ধকারে যাহার হস্তে আলোকবর্তিকা ছিল, সেই হতভাগ্যই রাত্রান্ধ হইয়া পড়িল। অপরকে পথ-প্রদর্শন করা তো দূরের কথা, বরং সে নিজেই অন্ধের ন্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল এবং এক একটি পথভ্রষ্টের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিল।

যে সমস্ত শরীয়তের নির্দেশের সমষ্টিগত রূপকে বুঝাইবার জন্য পর্দা শব্দটি শীর্ষনাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সমাজ বিধানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশাবলীর অন্তর্ভূক্ত। এই সমাজ বিধানের মানদন্ডে উক্ত নির্দেশাবলীকে যথাযথভাবে স্থাপন করিলে যে কোন স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এইরূপ স্বীকারোক্তি না করিয়া পারিবে না যে, সমাজ ব্যবস্থায় ইহা ব্যতীত মিতাচার এবং মধ্যপন্থার অন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। যদি এই বিধি-বিধানকে সত্যিকারভাবে প্রত্যক্ষ জীবনে রূপায়িত করা যায়, তাহা হইলে দুঃখ বেদনাক্লিষ্ট পৃথিবী বিনা প্রতিবাদে শান্তির এই উৎসের দিকে দ্রুত ধাবিত হইবে এবং তাহা নিসন্দেহে সামাজিক ব্যাধির মহৌষধ লাভ করিবে। কিন্তু এই কার্য কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইবে? ইহা সম্পাদন করিবার ক্ষমতা যাহার ছিল সে-ই যে দীর্ঘকাল যাবত পীড়িত হইয়া আছে। সুতরাং সম্মুখে অগ্রসর হইবার পূর্বে তাহার ব্যাধিটিও কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক পটভূমি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দেশ জয়ের প্লাবন প্রচন্ড ঝঞ্জাবেগে মুসলিম দেশগুলিকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানগণ অর্ধনিদ্রিত ও

অর্ধজাগ্রত অবস্থায় ছিল এবং দেখিতে দেখিতে এই ঝঞ্জা-প্লাবন প্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতীচ্যের সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উপনীত হইতে না হইতেই অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ইউরোপের গোলাম হইয়া পড়িল এবং অপরাপর দেশগুলি গোলাম না হইলেও পরাভূত ও প্রভাবিত হইয়া পড়িল। এই সর্বধ্বংসী বিপ্লব পূর্ণ দানা বাঁধিয়া উঠিবার পর মুসলমানদের চক্ষু উন্মিলিত হইতে লাগিল। দিগ্বিজয় ও রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে উন্নতিশীল মুসলমানদের যে জাতীয় গৌরব সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অপ্রত্যাশিতরূপে ধূলিস্মাৎ হইয়া গেল। অতপর ক্ষমতাবান শত্রুর উপর্যুপরি আঘাতে মাদকতামুক্ত মদ্যপায়ীর ন্যায় তাহারা স্বীয় পরাজয় এবং ইউরোপীয়দের জয় লাভের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হয় নাই। মাদকতা যদিও কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য তখনও বিকল রহিয়াছে। একদিকে অপমান-অসম্মানের তীব্র অনুভূতি তাহাদের এতাদৃশ হীনাবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যও চাপ দিতেছিল এবং অপরদিকে বহু শতাব্দীর বিলাস প্রিয় শ্রমবিমুখ জীবন পদ্ধতি অবস্থা পরিবর্তনের সহজতম ও নিকটতম পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিল। উপরন্তু তাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনার জীর্ণ শক্তিগুলিকে কার্যে নিয়োজিত করিতে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পরাভূত গোলাম জাতির মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে যে সন্ত্রস্ততা ও ভয়-বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়, তাহাও তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এহেন বিভিন্ন কারণের সংমিশণের ফলে সংস্কারপ্রিয় মুসলমানগণ নানাবিধ কল্পনাত্মক ও ব্যবহারিক পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই নিজেদের হীনতা, দুর্নীতি ও ইউরোপের উন্নতি বিধানের প্রকৃত হেতুই অনুধাবন করিতে পারিল না। আবার যাহারা অনুধাবন করিল, তাহাদের মধ্যে এতটুকু সৎ সাহস, সহনশীলতা এবং সংগ্রামী মনোভাব ছিল না যে, উন্নতির দুর্গম পথ অতিক্রম করে। এই উভয় দলের মধ্যেই দুর্বলতা ও ভয়বিহ্বলতা সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ বিভ্রান্ত মানসিকতায় তাহাদের উন্নতির সহজতর পন্থা এই ছিল যে, পাশ্চাত্য তাহযীব-তমদ্দুনের বাহ্যদৃশ্যাবলী তাহারা তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত করে এবং স্বয়ং এমন দর্পণ হইয়া যায় যাহার অভ্যন্তরে সুরম্য উদ্যান ও বসন্ত কান্তিরাজির মনোহর দৃশ্যপট প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ প্রকৃত উদ্যান ও তাহার সৌন্দর্য শোভার কোন অস্তিত্বই থাকে না।

মানসিক দাসত্ব

ব্যাধির এই চরম পর্যায়ে পাশ্চাত্য বেশভূষা, সমাজ ব্যবস্থা, সাহিত্য-কলা, আচার-আচরণ, চাল-চলন প্রভৃতি অনুকৃত হইতে লাগিল। এমন কি বাকভংগিমাতেও পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রকট হইয়া পড়িল। মুসলমান সমাজকে পাশ্চাত্য আদর্শে ঢালিয়া সাজাইবার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। খোদাদ্রোহিতা, নাস্তিকতা ও জড়বাদিত্ব অন্ধের ন্যায় 'ফ্যাশান' হিসাবে গৃহীত হইল। পাশ্চাত্যের আমদানীকৃত স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতি অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং বৈঠকাদিতে উহাকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপিত করা পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচায়ক মনে করা হইল। মদ্যপান, জুয়া, লটারী, ঘোড়দৌড়, থিয়েটার, নৃত্যগীত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিপ্রসূত অন্যান্য বিষয়ও তৎসংগে গৃহীত হইল। শ্লীলতা, নৈতিকতা, সামাজিক আদানপ্রদান, জীবিকার্জন, রাজনীতি, আইন-কানুন এমন কি ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি বিষয়ক যত প্রকার পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগী ও কর্ম পদ্ধতি ছিল তাহা সবই বিনা প্রতিবাদ ও চিন্তা-গবেষণায় আকাশ হইতে অবতীর্ণ ওহীর ন্যায়-'শ্রবণ করিলাম ও মানিয়া লইলাম'-বলিয়া গৃহীত হইল। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ইসলামী শরীয়তের নির্দেশাবলী ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনাগুলির প্রতি অতীতের ইসলামবৈরিগণ যেরূপ ঘৃণা পোষণ ও প্রতিবাদ করিয়াছে, এই যুগের মুসলমানগণও তদ্রূপ ইহার জন্য লজ্জাবোধ করিতে লাগিল এবং তাহারা এই কলংক মোচনে সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

পাশ্চাত্যের শ্বেতাংগ প্রভুগণ ইসলামী জিহাদের তীব্র সমালোচনা করিল। ইহারাও (মুসলমানগণ) প্রভুদের চরণে কৃতাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলিল, 'হুযুর! কোথায় আমরা আর কোথায় জিহাদ!' তাহারা দাসপ্রথার সমালাচনা করিল। ইহারা বলিল, 'ইহা তো ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ।' তাহারা বহু বিবাহের সমালোচনা করিলে তৎক্ষণাৎ কুরআনের একটি আয়াত বা নির্দেশকে রহিত করিয়া দিল। তাহারা বলিল, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।' ইহারা বলিল, 'ইহাই তো আমাদের ধর্মের মূল কথা।' তাহারা বিবাহ-তালাকের বিধি-ব্যবস্থার সমালোচনা করিলে ইহারা তৎসমূহের সংশোধনীর জন্য তৎপর হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ইসলাম তো

শিল্পকলার শত্রু।' ইহারা তদুত্তরে বলিল, 'হুযুর! ইসলাম তো চিরকালই নৃত্য-গীত, চিত্রাংকন ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছে।'

পর্দা প্রসঙ্গে সূচনা

মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে ইহাই সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ও লজ্জাকর যুগ। যেহেতু এই যুগেই পর্দাপ্রথা লইয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তর্কের বিষয়বস্তু যদি এই হইত যে, ইসলাম নারী স্বাধীনতার কি সীমা নির্ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে ইহার জওয়াব মোটেই কঠিন হইত না। কারণ এই ব্যাপারে যতটুকু মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় তাহা এই পর্যন্ত যে, নারী তাহার মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় অনাবৃত রাখিতে পারে কিনা; ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার এইস্থলে অন্যরূপ। মুসলমানদের মধ্যে এই প্রশ্ন এইজন্য উত্থিত হইয়াছে যে, ইউরোপ 'হেরেম' পর্দা ও নারীর বহিরাবরণকে ঘৃণার চোখে দেখিয়াছে। ইউরোপীয়গণ তাহাদের সাহিত্যে ইহার ঘৃণাব্যঞ্জক ও বিদ্রুপাত্মক চিত্র অংকিত করিয়াছে, ইসলামের দোষত্রুটির তালিকায় নারীদের 'অবরোধ'কে (পর্দা) বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। ইউরোপ যখন পর্দাপ্রথাকে ঘৃণার্হ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহাদেরই মানসিক দাসানুদাস মুসলমানদের পক্ষে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব যে, ইহার জন্য তাহারা স্বভাবতই লজ্জা বোধ করিবে না? তাহারা জিহাদ, দাসপ্রথা, বহুবিবাহ ও এবম্বিধ অন্যান্য ব্যাপারে যে ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছে, এই বিষয়েও তাহাই করিল। তাহারা কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহতত্ত্ববিদ ইমামগণের গভীর গবেষণাপ্রসূত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সেই কুৎসিত কলংক কালিমা অপনোদনের জন্য কোন উপায়-উপাদান তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি-না। জানিতে পারা গেল যে, কোন কোন ইমাম হস্ত ও মুখমন্ডল অনাবৃত রাখিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাও জানা গেল যে, নারী তাহার আবশ্যক কার্যের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে। উপরন্তু আরও জানিতে পারা গেল, নারী যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের পানি পান করাইতে এবং আহতদের সেবা করিতে পারে। নামাযের জন্য মসজিদে ও শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের জন্য অন্যত্র গমন করিতে পারে। ব্যস, এতটুকুই তাহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। অতপর তাহারা ঘোষণা করিল, 'ইসলাম নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছে। পর্দা নিছক অন্ধ বর্বর যুগের একটি প্রাচীন প্রথা মাত্র।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের (খিলাফতে রাশেদার) বহু পরে সংকীর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানগণ ইহার প্রচলন করিয়াছে। কুরআন-হাদীসে পর্দার কোন নির্দেশ নাই। ইহার মধ্যে লজ্জা-সম্ভ্রম সম্পর্কে নৈতিক শিক্ষা দান করা হইয়াছে মাত্র। এমন কোন নীতি নির্ধারিত হয় নাই, যাহার দ্বারা নারীদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।'

গোড়ার কথা

মানুষের ইহা একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, বাস্তব কর্মজীবনে যখন সে কোন পথ অবলম্বন করে, তখন সেই পথ নির্বাচনে সাধারণত ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য না লইয়া সে একটি ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয়। অতপর সেই ভাবপ্রবণতাপ্রসূত সিদ্ধান্তকে সে নির্ভুল প্রমাণিত করিবার জন্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করে। পর্দার ব্যাপারেও সেই অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্য কোন যুক্তিসংগত অথবা শরীয়ত সম্পর্কিত আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। বিজয়ী জাতির বাহ্যিক চাকচিক্যময় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং ইসলামী তমদ্দুনের বিরুদ্ধে উক্ত জাতির তীব্র প্রচারণার দ্বারা বিহ্বল হওয়ার ফলে যে অনুরাগ, অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হইয়াছিল, পর্দা সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনা শুধু তাহারই কারণে হইয়াছিল।

আমাদের সংস্কারপ্রিয় শিক্ষিত সমাজ যখন বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে ইউরোপীয় ললনাদের সৌন্দর্য, বিলাস-ভূষণ, যত্রতত্র স্বাধীন বলগাহীন যাতায়াত এবং আপন সমাজে তাহাদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিল, তখন অনিবার্যরূপে তাহাদের মনে এই বাসনার সঞ্চার হইল যে, তাহাদের রমণিগণও যেন সেইভাবে চলিতে পারে এবং তাহাদের তমদ্দুনও যেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। নারী স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যের নূতন দৃষ্টিভংগী শক্তিশালী প্রামানিক ভাষার চটকদার ছাপার অক্ষরে যখন তাহাদের মধ্যে অবিরল বারি বর্ষণের ন্যায় বর্ষিত হইতেছিল, তখন তাহারা উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এই সকল সাহিত্যের শক্তিশালী প্রভাবে তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাহাদের মনের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সত্যিকার প্রগতিশীল হইতে হইলে প্রাচীনত্ব ও জীর্ণতার কলংক কালিমা

হইতে মুক্ত হইতে হইলে ঐ সমস্ত ভাবধারা ও দৃষ্টিভংগীর প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করত লিখনী ও বক্তৃতার সাহায্যে তাহার প্রচারণা চালাইতে হইবে এবং সাহসিকতার সহিত তাহাকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। অবগুন্ঠনসহ শ্বেতবস্ত্রাবৃত রমণীদিগকে সচল তাঁবুর ন্যায় বা কাফনপরিহিত জানাযার পোশাকে আচ্ছাদিত দেখিলে এই সকল আত্মপ্রবঞ্চিত হতভাগ্যের দল ব্রীড়াহত হইয়া ভূলুন্ঠিত হয়। কতকাল আর ইহা সহ্য করা যায়? অবশেষে বাধ্য হইয়া অথবা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া-তাহারা এই লজ্জার কলংক অপনোদনে প্রস্তুত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নারী স্বাধীনতার যে আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল উপরোক্ত আবেগ, অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা। এই সকল আবেগ, অনুভূতি আবার কাহারো কাহারো সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। তাহারা নিজেরাই এই বিষয়ে অবহিত ছিল না যে, এই আন্দোলন তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। তাহারা ছিল আত্মপ্রবঞ্চিত। পক্ষান্তরে কেহ কেহ আবার এই সকল আবেগ–অনুভূতি সম্পর্কে অবহিতও ছিল। কিন্তু প্রকৃত ভাবাবেগ অপরের সম্মুখে প্রকাশ করিতে তাহারা কুন্ঠাবোধ করিত। ইহারা যদিও আত্মপ্রবঞ্চিত ছিল না, কিন্তু বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া বহির্জগতকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিল। যাহা হউক, উভয় দলই একই লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতেছিল এবং তাহা এই যে, স্বীয় আন্দোলনের মূল প্রেরণাকে গোপন করিয়া একটি ভাবাবেগ পরিচালিত আন্দোলনের পরিবর্তে একটি যুক্তিসংগত আন্দোলন পরিচালনার প্রয়াস পাইল। নারীদের স্বাস্থ্য, জ্ঞানার্জন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহাদের উৎকর্ষ সাধন, তাহাদের স্বাভাবিক ও জন্মগত অধিকার সংরক্ষণ, জীবিকার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা, পুরুষের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে পরিত্রাণ লাভ, জাতির অর্ধাংশ হিসাবে তাহাদের উন্নতির উপর তামাদ্দুনিক উন্নতির নির্ভরশীলতা এবং ইউরোপ হইতে সরাসরি আমদানীকৃত অন্যান্য কলাকৌশল এই আন্দোলন পরিচালনায় এমনভাবে প্রয়োগ করা হইল যেন মুসলমান জনসাধারণ প্রতারিত হয়। এই আন্দোলন পরিচালনায় এমন এক কৌশলও অবলম্বিত হইল যে, মুসলমান নারিগণকে ইউরোপীয় নারীদের আচরণ পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করাই যে এই

আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার গূঢ় রহস্য যেন মুসলমান জনসাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত না হয়।

বিরাট প্রবঞ্চনা

এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রবঞ্চনা এই ছিল যে, কুরআন-হাদীস হইতে যুক্তির অবতারণা করত এই আন্দোলনকে ইসলামের অনুকূলে সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস চলিয়াছে। অথচ ইসলামী ও পাশ্চাত্য তাহযীবের উদ্দেশ্যে ও সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী তাহযীবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, মানবের যৌন শক্তিকে (Sex Energy) নৈতিক নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহা লাম্পট্য ও কামোত্তেজনার বশে নিঃশেষিত না হইয়া একটা পূত-পবিত্র ও সৎ তমদ্দুন গঠনে নিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে জীবনের কার্যকলাপে এবং দায়িত্ব পালনে নারী পুরুষকে সমানভাবে নিযুক্ত করিয়া বৈষয়িক উন্নতির গতি প্রবাহকে দ্রুততর করাই পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। এতদ্‌সহ ইহা যৌনোত্তেজনাকে এমন কার্যে ব্যবহৃত করে যাহাতে জীবন সংগ্রামের তিক্ততা মধুর সুখ সম্ভোগে পরিণত হয়। উদ্দেশ্যের এই বৈষম্য অবশ্যম্ভাবীরূপে ইহাই দাবী করে যে, জীবন যাপনের পদ্ধতিতেও ইসলাম ও পাশ্চত্য সংস্কৃতির মধ্যে মৌলিক বৈষম্য থাকিবে না। ইসলাম এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী করে, যেখানে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হইবে। উভয়ের স্বাধীন একত্র মিলনকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ও এই শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী সকল উপায়-উপাদানের মূলোৎপাটন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির লক্ষ্য এবং দাবি এই যে, নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীকে জীবনের একই ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার, উভয়ের অসংযত বল্‌গাহীন পারস্পরিক মিলন ও কার্য পরিচালনার পথে সকল বাধা-বিঘ্নকে অপসারিত করা হইয়াছে। উপরন্তু তাহাদিগকে পারস্পরিক সৌন্দর্য ও যৌন সম্ভোগের সীমাহীন সুযোগও দেওয়া হইয়াছে।

এখন যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুমান করিতে পারেন যে, যাহারা একাধারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতিকে তাহার সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করে, তাহারা কতখানি আপনাদিগকে ও অপরকে প্রতারিত করিতেছে। ইসলামী

সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনতার শেষ সীমারেখা এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে যে, সে তাহার হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল অনাবৃত রাখিতে পারিবে এবং আবশ্যকবোধে গৃহ হইতে নিক্রান্তও হইতে পারিবে। কিন্তু ইহারা (পাশ্চাত্যের অনুসারিগণ) ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত শেষ সীমারেখাকেই তাহাদের যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের যাত্রা যেখানে শেষ হইয়াছে, ইহারা তথা হইতে আরম্ভ করে এবং এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, লজ্জা, সম্ভ্রম ও শ্রীলতাকে পরিহার করে। শুধু হস্ত ও মুখমন্ডল নহে, বরং সুষম সীমান্তসহ কেশরাজিশোভিত নগ্ন মস্তক, স্কন্ধদেশে আস্তীন, বেণী ও অর্ধনগ্ন উন্নত বক্ষ দর্শকের নয়নগোচর করা হয়। কমনীয় দেহকান্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও এমন সূক্ষ্ম বস্ত্রে আবৃত করা হয় যে, তন্মধ্য হইতে এমন অংগসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় যাহার দ্বারা পুরুষের কামপিপাসা চরিতার্থ করা যায়। অতপর এহেন বেশভূষা ও সাজসজ্জাসহ স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নিকে 'মুহরেম' [১] পুরুষগণের সম্মুখে নহে, বরং বন্ধুদের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং পর পুরুষের সহিত এমনভাবে হাসি–ঠাট্টা, কথাবার্তা ও ক্রীড়া–কৌতুক করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যাহা কোন মুসলমান রমণী তাহার বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভ্রাতার সহিতও লাভ করিতে পারে না। কেবল আবশ্যক কার্যোপলক্ষে শরীয়তসম্মত পরিপূর্ণ দেহাবরণসহ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইবার স্বাধীনতাকে চিত্তাকর্ষক শাড়ী, অর্ধনগ্ন ব্লাউজ ও অসংযত নয়নবানসহ প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমনে, প্রমোদ কাননে বিচরণে, ক্লাব–হোটেলাদিতে চিত্তবিনোদনে এবং ছায়াচিত্র দর্শনে প্রযুক্ত করা হয়। গৃহাভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ব্যতীত বিশেষ শর্তাধীনে অন্য কাজকর্মের যে স্বাধীনতা ইসলাম নারীকে দান করিয়াছে তাহাকে এইরূপ যুক্তিস্বরূপ উপস্থাপিত করা হইতেছে যে, মুসলমান নারীও ইউরোপীয় নারীর ন্যায় গার্হস্থ্য জীবন ও পারিবারিক দায়িত্ব পরিত্যাগ পূর্বক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষিপ্রকারিতায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া কঠোর পরিশ্রম করিবে।

ভারত উপমহাদেশের অবস্থা মোটামুটি এই পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। মিসর, তুরস্ক ও ইরানের রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানসিক দাসগণ ইহা অপেক্ষা দশ ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল দেশের মুসলিম নারিগণ ইউরোপীয় নারীদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে। এতদ্বারা তাহারা আসল ও নকলের পার্থক্য মিটাইতে চাহে। তুরস্ক এই ব্যাপারে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে যে,

১. ইসলামী আইনানুযায়ী যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তুর্কী নারীদের আলোকচিত্রে তাহাদিগকে সমুদ্রতীরে স্নানের পোশাকসহ স্নানরত দেখা যায়। এতোদৃশ পরিচ্ছদ পরিহিত নারীদের দেহের তিন-চতুর্থাংশ অনাবৃত থাকে। দেহের অবশিষ্টাংশ এমনভাবে সূক্ষ্ম বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে যে, দেহের স্ফীত ও অনুন্নত অংগসমূহ তৎসংশ্লিষ্ট বস্ত্রের উপর পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়া পড়ে।

কুরআন ও হাদীসে কুত্রাপিও এমন জীবন পদ্ধতি সমর্থনের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? কেহ যদি এই পথ অবলম্বন করিতে চাহে, তবে তাহার স্পষ্ট ঘোষণা করা উচিত যে, ইসলাম ও ইসলামের আইন-কানুনের সে প্রকাশ্য বিরোধী। যে সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির মৌলিক নীতি, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার প্রতিটি বিষয়কে কুরআন নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তাহাকে শুধু প্রকাশ্যে ও সজ্ঞানে অবলম্বন করা নহে, উপরন্তু এই পথের প্রথম পদক্ষেপ কুরআনের নামেই করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, জগতকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করিয়া কুরআনের নামে এই পথেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হইবে। ইহা কত বড় ভন্ডামি, নীচতা ও শঠতা।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়

নব্যযুগের মুসলমানের অবস্থা উপরে বর্ণিত হইল। এখন আমাদের সম্মুখে আলোচনার দুইটি দিক রহিয়াছে। এই গ্রন্থে এই উভয় দিকের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে।

প্রথমত, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির সমক্ষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ইহাও বলিয়া দিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থায় পর্দার নির্দেশাবলী কেন প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, এই নব্যযুগের মুসলমানদের সম্মুখে একদিকে কুরআন-হাদীসের নির্দেশাবলী ও অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সামাজিকতার দৃষ্টিভংগী এবং তাহার পরিণাম ফল তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের দ্বিমুখী কার্যপদ্ধতির অবসান ঘটে এবং দুইটি পথের যে কোন একটিকে অবলম্বন করিতে পারে। যদি তাহারা প্রকৃত মুসলমান হিসাবে বসবাস করিতে চাহে, তাহা হইলে ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ আনুগত্য করিয়া চলিতে হইবে নতুবা যে লজ্জাকর ও ভয়াবহ পরিণামের দিকে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, ইসলামের সংশ্রব বর্জন করত তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

তাত্ত্বিক আলোচনা

যে সমস্ত কারণে পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করা হয় তাহা নিছক নেতিবাচক নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রামানিক ইতিবাচক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিরোধী দলের বিরোধিতার ভিত্তি শুধু ইহা নহে যে, যেহেতু লোকে নারীদের গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকা এবং দেহাবরণসহ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়াকে অন্যায় অবোররাধ মনে করে; সুতরাং পর্দাপ্রথাকে রহিত করিতে হইবে, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাহাদের সম্মুখে নারী জীবন সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র চিত্র রহিয়াছে। নারী-পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে তাহারা একটি স্থায়ী নিজস্ব মতবাদ পোষণ করে। তাহারা চায় যে, নারী এইরূপ না করিয়া অন্য কিছু করুক। পর্দার বিরুদ্ধে তাহারা এইজন্য আপত্তি উথাপন করে যে, নারী গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অবগুন্ঠনসহ জীবনের সেই বাঞ্ছিত চিত্রও পরিস্ফুট করিতে পারে না। অথবা 'অন্য কিছু'ও করিতে পারো না।

এখন আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, নারীদের করণীয় সেই 'অন্য কিছু' বস্তুটি কি। ইহার পশ্চাতে কোন্ মতবাদ ও মূলনীতি রহিয়াছে, ইহা কতখানি ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইহার কি-ইবা পরিণাম ফল ঘটিয়াছে ? ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহাদের মতবাদ মূলনীতিকে যদি আমরা সরাসরি গ্রহণ করিয়া লই, তাহা তইলে পর্দাপ্রথা এবং সেই সামাজিক ব্যবস্থা- যাহার অবিচ্ছেদ্য অংগ এই পর্দা-প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে। কিন্তু আমরা যাচাই ও যুক্তিসংগত পরীক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের মতবাদ কেনই বা মানিয়া লইব? তবে কি কোন বস্তুকে শুধু তাহার নূতনত্বের জন্য এবং সর্বসাধারণ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করার জন্য আমরা বিনা পরীক্ষায়ই শিরোধার্য করিয়া লইব?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার ধারণা

পূর্বেই ইংগিত করা তইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল দার্শনিক, প্রকৃতিবিদ ও সাহিত্যিক সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে এমন এক তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় যাহার মধ্যে নানাবিধ জটিলতা বিদ্যমান ছিল এবং যাহাতে কমনীয়তার লেশমাত্র ছিল না। তাহা ছিল অযৌক্তিক গতানুগতিক আচারানুষ্ঠান এবং জ্ঞান

ও স্বভাববিরোধী অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। কয়েক শতাব্দীর ক্রমাগত অধপতন তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। একদিকে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির নবজাগরণ উদ্বেলিত হইয়া ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনার সীমা অতিক্রম করিবার অনুপ্রেরণা দিতেছিল; অপরদিকে সমাজপতি ও ধর্মীয় নেতার দল প্রচলিত প্রবাদ-কিংবদন্তীর বন্ধন দৃঢ়তর করিতে ব্যাপৃত ছিল। গীর্জা হইতে সৈন্যবিভাগ ও বিচারালয় পর্যন্ত, রাজপ্রাসাদ হইতে কৃষিকৃত্য ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদান পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও সংগঠনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এমনভাবে কাজ করিয়া যাইত যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত সংশ্লিষ্ট নবজাগ্রত দলের সকল শ্রম ও যোগ্যতার ফল কতিপয় বিনষ্ট শ্রেণীর তাহাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত অধিকার বলে হরণ করিয়া লইত। এহেন পরিস্থিতিতে সংস্কার-সংশোধনের সকল প্রকার প্রচেষ্টা, ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতার সম্মুখে ব্যর্থকাম হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে সংশোধন ও পরিবর্তনকারীদের মধ্যে বিপ্লবের একটি অন্ধ অনুপ্রেরণা দৈনন্দিন জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে তদানীন্তন গোটা সমাজ ব্যবস্থা এবং তাহার প্রতিটি বিভাগ ও অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। অতপর ব্যক্তি স্বাধীনতার এমন এক চরম মতবাদ গণস্বীকৃতি লাভ করিল যাহার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও অনাবিল মুক্তি দান করা। এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল যে, ব্যক্তিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আপন অভিপ্সিত কার্য করিবার অধিকার দান করিতে হইবে, তদ্রূপ তাহার অনভিপ্রেত কার্য হইতে বিরত থাকিবার স্বাধীনতাও তাহার থাকিবে। কাহারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করিবার কোন অধিকারই সমাজের থাকিবে না। ব্যক্তিবর্গের কর্মস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হইবে সরকারের একমাত্র কর্তব্য। গণ-প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু ব্যক্তিকে তাহার উদ্দেশ্য সাধনের পথে সাহায্য করিবে।

নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিক্ষোভ ও ক্রোধের মধ্যে যে স্বাধীনতার অতিরঞ্জিত চরম মতবাদ জন্মলাভ করিল তাহার মধ্যে একটি বৃহত্তর অমঙ্গল ও ধ্বংসের বীজাণু বিদ্যমান ছিল। এই মতবাদকে যাহারা সর্বপ্রথমে উপস্থিত করিয়াছিল, তাহারাও ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিল না। এবম্বিধ বল্‌গাহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম ফল যদি তাহাদের জীবদ্দশায় প্রকাশ হইয়া পড়িত,

তাহা হইলে সম্ভবত তাহারাও আতঙ্কিত হইয়া পড়িত। তাহাদের সময়ে সমাজে যে সকল অসংগত বাড়াবাড়ি এবং অযৌক্তিক বাধাবন্ধন ছিল, তাহার মূলোৎপাটনের অস্ত্রস্বরূপই তাহারা এইরূপ মতবাদ চালু করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ইহাই পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতে লাগিল।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন

ফরাসী বিপ্লব এই স্বাধীনতার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই বিপ্লবের দ্বারা পূর্বতন বহু নৈতিক মতবাদ, তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি রহিত করা হইয়াছিল। এই সকল রহিতকরণের ফলে যখন উন্নতি দেখা গেল, তখন বিপ্লবী মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহাই বলিতে লাগিল যে, আবহমান কাল হইতে প্রচলিত জীর্ণ কর্মনীতিই উন্নতির পথে কন্টকস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্তন ব্যতীত সম্মুখে পদক্ষেপ সম্ভব নহে। অতএব খ্রীস্টীয় নৈতিকতার ভ্রান্ত মৌলিক নীতি রহিত হইবার পর তাহাদের সমালোচনার অস্ত্র মানবীয় নৈতিকতার বুনিয়াদী মতবাদের উপরে ক্ষিপ্র গতিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সম্ভ্রম সতীত্ব আবার কোন বিপদ? যৌবনের উপর আল্লাহ ভীতির সংকটই বা কেন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে? বিবাহ ব্যতিরেকে যদি কেহ কাহারও প্রণয়াবদ্ধ হয়, তবে তাহাতে দোষই বা কোথায়? বিবাহোত্তরকালে মানুষ কি এতই নির্মম হইয়া পড়ে যে, তখন তাহাকে অন্যত্র প্রেম নিবেদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে? এই ধরনের প্রশ্নাবলী নূতন বিপ্লবী সমাজের

---

১. ব্যক্তি স্বাধীনতার এই ধারণা হইতেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং নৈতিক লাম্পট্য (Licentiousness) জন্মলাভ করিয়াছে। প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ব্যাপী এই মতবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় যে অনাচার-উৎপীড়নের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, তাহার ফলে মানবতা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এইরূপ সমাজ ব্যবস্থা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ অধিকার দান করিয়া জনস্বার্থকে পদদলিত এবং সমাজকে ধ্বংস করিয়াছে। ক্রমশ এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়া সোস্যালিজম ও ফ্যাসিজম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু নবজাত ইজমগুলির সৃষ্টির গোড়াতেই এক অনাচার, অমংগলের বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে একটি চরম মতবাদের সমাধানকল্পে অপর একটি চরম মতবাদ উত্থাপিত করা হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্রুটি এই যে, ইহা ব্যক্তির খাতিরে সমষ্টিকে বিসর্জন দিয়াছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক মতবাদের ত্রুটি এই যে, ইহা ব্যক্তিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলিদান দিয়াছে। মানবতার মঙ্গলের জন্য একটি সুসামঞ্জস্য মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর ন্যায় আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

চতুর্দিকে মুখরিত করিল, বিশেষ করিয়া ঔপণ্যাসিকদের লিখনীর মাধ্যমে এই সকল প্রশ্নাবলী দৃপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (George Sand) এই দলের নেত্রী ছিল। যে সমস্ত নৈতিক মূলনীতির উপর মানব সভ্যতা, বিশেষ করিয়া নারীর সতিত্ব সম্ভ্রম নির্ভরশীল, এই নারী স্বয়ং তাহা চূর্ণ করিল। সে একজনের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও বিবাহ বন্ধন লংঘন করিয়া অপরের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিল। অবশেষে স্বামীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তারপর তাহার প্রণয়ী পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হয় এবং কাহারো সহিত দুই বৎসরাধিককাল একত্রে বসবাস করা তাহার সম্ভব হয় নাই। তাহার জীবনীতে এমন ছয় ব্যক্তির কথা জানিতে পারা যায়, যাহাদের সহিত তাহার প্রকাশ্য প্রেম নিবেদন চলিয়াছে। তাহার জনৈক প্রণয়ী তাহার প্রশংসায় নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেঃ

> –জর্জ স্যাণ্ড প্রথমে একটি প্রজাপতিকে ধরিয়া পুষ্প পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে–ইহাই তাহার প্রণয় নিবেদনের কাল। অতপর সে তাহার শুণ্ডের সূচাগ্র দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে ফড়ফড় করিতে থাকে এবং ইহাতে সে চরমানন্দ লাভ করে।–অতপর একদা তাহার প্রেমে ভাটা পড়িয়া যায়।–অতপর সে তাহার পালক উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ঐ সকল পতংগের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়, যাহাদিগকে তাহার উপন্যাসের জন্য প্রধান চরিত্র হিসাবে মনোনীত করা হয়।

ফরাসী কবি 'Alfred Musse'–ও তাহার একজন প্রেমিক ছিল। সে অবশেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় এতখানি মর্মাহত হইয়াছিল যে, মৃত্যুর সময় সে এই বলিয়া ওসীয়ত করিয়া যায় যে, George Sand যেন তাহার জানাযায় যোগদান করিতে না পারে। ইহাই ছিল সেই নারীর ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র। ত্রিশ বৎসর যাবত তাহার বলিষ্ঠ সাহিত্যের মাধ্যমে তাহার চরিত্র ফরাসীর যুবক সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সে তাহার স্বরচিত উপন্যাস লেলীয়ায় (Lelia)। লেলিয়ার পক্ষ হইতে স্টেনোকে লিখিতেছেঃ

> –জগতকে যতখানি দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে, তাহাতে আমি অনুভব করি যে, প্রেম সম্পর্কে আমাদের যুবক–যুবতীদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের জন্যই হইবে অথবা তাহার মনকে জয় করিতে হইবে এবং তাহাও চিরদিনের জন্য–এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। অন্যান্য

যাবতীয় কল্পনাকেও নিসন্দেহে মনে স্থান দিতে হইবে। আমি একথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে, কিছু সংখ্যক লোকের দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অন্যরূপ প্রয়োজন বোধ করে এবং তাহা অর্জনের যোগ্যতাও রাখে। ইহার জন্য আবশ্যক যে, নারী-পুরুষ একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে, পারস্পরিক উদারতা প্রদর্শন করিবে এবং যে সমস্ত কারণে প্রেমের ক্ষেত্রে হিংসা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তাহা অন্তর হইতে নির্মূল করিবে, সকল প্রেমই সঠিক, তাহা উগ্র হউক অথবা শান্ত, সকাম অথবা নিষ্কাম, দৃঢ় অথবা পরিবর্তনশীল, আত্মঘাতী অথবা সুখদায়িনী-

সে তাহার জাক (Jacus) নামক অন্য এক উপন্যাসে এমন এক স্বামীর বর্ণনা দিয়াছে, যাহাকে সে একটি আদর্শ স্বামী হিসাবে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জাকের স্ত্রী নির্জনে পরপুরুষকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে অথচ উদারচেতা স্বামী তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিতেছে না। ইহার কারণস্বরূপ স্বামী বলিতেছেঃ

যে পুষ্প আমা ব্যতীত অন্যকে তাহার সুরভি দান করিতে চায়, তাহাকে পদদলিত করিবার আমার কি অধিকার আছে?

লেখিকা অন্যত্র 'জাকে'র ভাষায় নিম্নরূপ মন্তব্য করিতেছেঃ

আমি আমার মতের পরিবর্তন করি নাই, সমাজের সংগে কোন আপোষও আমি করি নাই। যত প্রকার সামাজিক পন্থা আছে, আমার মতে বিবাহ তন্মধ্যে এক চরম পাশবিক পন্থা। আমার বিশ্বাস, যদি মানুষ ও জ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই পন্থাকে তাহারা রহিত করিয়া দিবে। অতপর তৎপরিবর্তে তাহারা একটি পবিত্র মানবীয় পন্থা বাছিয়া লইবে। তখন মানব সন্তানগণ এই সকল নারী পুরুষ হইতে অধিকতর অগ্রগামী হইবে এবং একে অপরের স্বাধীনতায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না। বর্তমানে পুরুষ এমন স্বার্থপর এবং নারী এত ভীরু যে, তাহারা বর্তমানের প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তে কোন উন্নততর ও সম্ভ্রান্ত রীতিনীতির দাবি করে না। হাঁ, যাহাদের মধ্যে বিবেক

ও পূণ্যের অভাব আছে, তাহাদিগকে তো কঠিন শৃংখলে আবদ্ধই থাকিতে হইবে।

এই সকল মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা ১৮৩৩ খ্রীঃ এবং সমসাময়িক কালে প্রচারিত হইতেছিল। জর্জ স্যাণ্ড শুধু ঐ পর্যন্তই পৌঁছিতে পারিয়াছিল। সে তাহার মতবাদ ও ধ্যানধারণাকে অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণতি ফল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সাহসী হয় নাই। তথাপি স্বাধীনচিত্ততা, প্রগতিশীলতা ও প্রাচীন গতানুগতিক নৈতিকতার অন্ধকার কিছু না কিছু তাহার মনমস্তিষ্কে বিদ্যমান ছিল। তাহার ত্রিশপঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ফ্রান্সে নাট্যকার, সাহিত্যিক ও নৈতিকতাবাদী দার্শনিক প্রভৃতির দ্বিতীয় বাহিনী আবির্ভূত হয়। আলেকজাণ্ডার দুমা (Alexander Dumas) ও আলফ্রেড নাকেট (Alfred Naquet) তাহাদের অন্যতম নেতা ছিল। তাহাদের সমগ্র শক্তি এই মতবাদ প্রচারে নিয়োজিত করে যে, স্বাধীনতা ও জীবনের সুখ-সম্ভোগে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে। এই অধিকারের উপর নৈতিক নিয়মনীতি ও সামাজিক বন্ধন চাপাইয়া দেওয়া ব্যক্তির প্রতি সমাজের উৎপীড়ন বিশেষ। ইহার পূর্বে ব্যক্তির জন্য কর্মস্বাধীনতার দাবী শুধু প্রেমের নামেই করা হইত। উত্তরসূরিদের নিকট এইরূপ নিছক ভাব প্রবণতাপ্রসূত ভিত্তি দুর্বল মনে হইল। অতএব তাহারা ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য ও বল্গাহীন স্বাধীনতাকে যুক্তি, দর্শন এবং বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যুবক-যুবতীরা যাহা কিছু করুক না কেন, তাহা যেন মন ও বিবেকের পরিপূর্ণ তুষ্টি সহকারে করিতে পারে এবং সমাজও যেন তাহাদের যৌবনের উচ্ছৃংখলতায় রুষ্ট না হইয়া উহাকে নৈতিকতার দিক দিয়া সংগত ও সমীচীন মনে করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে Paul Adam, Henry Betaille, Pierrelouis প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তরুণ তরুণীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতায় সাহস সঞ্চার করিবার জন্য সাহিত্যের মাধ্যমে তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। ফলে প্রাচীন নৈতিকতার ধারণা মানব প্রকৃতির মধ্যে যে একটি দ্বিধাসংকোচ ও প্রতিবন্ধকতার অনুভূতি জিয়াইয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল। বস্তুত Paul Adam তাহার গ্রন্থ 'La-Morale-De-La Amour'-এ তরুণ-তরুণীদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিয়াছে

যে, তাহারা প্রেম করিবার কালে অযথা এইরূপ আশ্বাস দেয় যে, প্রেমিকার জন্য জীবন দান করিবে, তাহার জন্য আন্তরিক প্রেম করিবে, চিরকাল তাহারই হইয়া থাকিবে, ইত্যাদি। পল আদম বলেঃ

> এই সকল কথা এইজন্য বলা হইতেছে যে, দেহ সম্ভোগের বাসনা–যাহা প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে এবং যাহার মধ্যে কোন পাপ নাই– প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী দূষণীয় মনে করা হয়। এইজন্য মানুষ ইহাকে অযথা মিথ্যার আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করে।... জাতির মারাত্মক দুর্বলতা এই যে, তাহাদের প্রেমিক–প্রেমিকা এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সংকোচ বোধ করে যে, তাহাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিছক দৈহিক বাসনাকে চরিতার্থ করিয়া সুখসম্ভোগ ও চরমানন্দ লাভ করা।

ইহার পর সে তরুণ–তরুণীদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেঃ

> অমায়িক ও যুক্তিবাদী মানুষ হও। আপন প্রবৃত্তি ও আনন্দ উপভোগের অনুচরকে তোমাদের মা'বুদ বানাইও না।[১] যে ব্যক্তি প্রেমমন্দির নির্মাণ করত একই বিগ্রহের পূজারী হইয়া বসিয়া থাকে, সে প্রকৃতই নির্বোধ। প্রতি আনন্দ মুহূর্তে একজন অভ্যাগতের নির্বাচন করা তাহার উচিত।

Pierre louis অন্যদের অপেক্ষা কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, নৈতিক বন্ধন প্রকৃতপক্ষে মানবীয় প্রতিভা ও মস্তিষ্ক শক্তির উন্মেষ সাধনে বাধার সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল বন্ধন ছিন্ন করত মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত দৈহিক সুখসম্ভোগের সুযোগ দেওয়া না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ অথবা বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। সে তাহার গ্রন্থ Afrodite–এ দৃঢ়তার সহিত ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, বেবিলন, আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স, রোম, ভেনিস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রের চরম উন্নতি ঠিক তখনই হইয়াছিল, যখন সেখানে চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য ও প্রবৃত্তির দাসত্ব পূর্ণ মাত্রার চলিয়াছিল। কিন্তু যখনই সেখানে নৈতিক

---

১. ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে কেহ যেন ভুল না করেন। ইহা দ্বারা ঐ সকল নারী–পুরুষকে বুঝান হইতেছে, যাহারা একে অপরকে আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে।

ও আইন-কানুনের বন্ধন মানবীয় কামনা বাসনার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, তখনই প্রবৃত্তি বাসনার সংগে সংগে মানবীয় আত্মাও সেই সকল বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

তৎকালীন ফ্রান্সে Pierre louis একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রবন্ধ রচনাকারী ছিল। এই ব্যক্তি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও ছিল। তাহার অধীনে গল্পলেখক, নাট্যকার, নৈতিকতাবাদী প্রভৃতি একটি দল তাহার মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী প্রচারে লিপ্ত থাকিত। সে তাহার গোটা লেখনী শক্তির সাহায্যে নগ্নতা ও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার বহুল প্রচার করিয়াছে। তাহার গ্রন্থ Afrodite-এ সে গ্রীসের এমন এক সময়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিতেছেঃ

> যখন উলংগ মানবতা ধারণাতীত সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যাহার সম্পর্কে ধর্মাবলম্বিগণ এই আশ্বাস দান করিয়াছে যে, খোদা তাহাকে আপন মূর্তিতে সৃষ্টি করিয়াছে- এক পবিত্র বেশ্যার মূর্তিতে নানাবিধ ঠাকঠমক ও কমনীয় ভংগীতে বিশ হাজার দর্শকের সম্মুখে আপন দেহ সত্তার উপস্থাপিত করিত, তখন পরিপূর্ণ কামভাবসহ তাহার প্রতি প্রণয় নিবেদন সেই পূত পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয়, যাহার দ্বারা আমরা সকলে সৃষ্ট হইয়াছি-
>
> কোন পাপ, লজ্জাকর অথবা অপবিত্র কার্য বিবেচিত হইত না।

মোদ্দাকথা এই যে, সে কবিত্বের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া স্পষ্ট ভাষায় এতখানি উক্তি করিয়াছেঃ

> বলিষ্ঠ নৈতিক শিক্ষার দ্বারা আমাদিগকে এই গর্হিত কার্যের মূলোৎপাটন করিতে হইবে যে, নারীর মাতা হওয়া কোন অবস্থাতেই লজ্জাকর, অন্যায় ও অসম্মানজনক নহে।

বিংশ শতাব্দীর উন্নতি

উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাধারা ও মতবাদ এতদূর পর্যন্তই পৌছিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্তরীক্ষে এমন এক নূতন শ্যেনপক্ষীর আবির্ভাব হইল, যে তাহার পূর্ববর্তিগণ অপেক্ষা অধিক উচ্চে উড়িবার চেষ্টা করিল। ১৯০৮ খৃীষ্টাব্দে Peorr Wolff এবং Caston Leronx-এর একখানা নাটক Lelys

প্রকাশিত হইল। এই নাটকে দুইটি বালিকা তাহাদের যুবক ভ্রাতার সম্মুখে পিতার সহিত এই বিষয়ে তর্ক করিতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রেম নিবেদন করিবার অধিকার আছে। তাহারা ইহাও বলিতেছে যে, প্রেম ব্যতিরেকে একজন যুবতীর জীবন কত মর্মন্তুদ হইতে পারে। একজন বৃদ্ধ পিতা তাহার কন্যাকে জনৈক যুবকের সহিত অবৈধ প্রেম করার জন্য তিরস্কার করিতেছে। তদুত্তরে কন্যা বলিতেছেঃ

> আমি তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? একটি বালিকা প্রেম না করিয়াই আইবুড়া হউক–ইহা কোন বালিকাকে বলিবার অধিকার কাহারও নাই, সে বালিকা তাহার ভগ্নি হউক অথবা কন্যা হউক, ইহা তুমি কিছুতেই বুঝিতে পার নাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু বাড়াইয়াই দেয় নাই বরং এক চরম সীমায় পৌছাইয়া দিয়াছে। গর্ভনিরোধ আন্দোলনের প্রভাব ফ্রান্সের উপর অধিকতর পড়িয়াছে। ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর যাবত ফ্রান্সের জন্মহারের পতন ঘটিতেছিল। ইহার সাতাশিটি জেলার মধ্যে মাত্র বিশটি জেলার জন্মহার মৃত্যুহারের অধিক ছিল। দেশের কোন কোন অঞ্চলে এরূপ অবস্থা ছিল যে, একশ শিশু জন্মের বিপক্ষে মৃত্যুহার ছিল ১৩০ হইতে ১৬০এর মাঝামাঝি। যখন ফরাসী জাতির জীবন–মৃত্যু সিদ্ধান্তকারী মহাযুদ্ধ শুরু হইল, তখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন যে, জাতির ক্রোড়ে যুদ্ধোপযোগী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই অল্প সংখ্যক যুবককে উৎসর্গ করিয়া জাতীয় জীবনকে হয়ত নিরাপদ করা যাইতে পারে, কিন্তু শত্রুর পরবর্তী আক্রমণে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইবে। এই অনুভূতি সমগ্র ফরাসীদেশে জন্মহার বর্ধিত করিবার এক তীব্র অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিল। চতুর্দিক হইতে গ্রন্থকার, সাংবাদিক, বক্তা, বিদ্বানমণ্ডলী ও রাজনীতিবিদগণ সমবেত কণ্ঠে প্রচার শুরু করিল "সন্তান জন্মাও। বিবাহের প্রচলিত বন্ধনের ভয় করিও না। যে সমস্ত কুমারী নারী ও বিধবা জন্মভূমির কল্যাণের জন্য তাহাদের গর্ভে সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইবে, তাহারা সমাজের নিন্দনীয় না হইয়া বরং সম্মানের অধিকারীনী হইবে।"

এই সময়ে স্বাধীনতাকামী ভদ্রলোকদের স্বাভাবিকভাবেই এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া শয়তানের ঝুলিতে অবশিষ্ট যাবতীয় মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রচার শুরু করিল।

তৎকালীন জনৈক বিশিষ্ট গ্রন্থকার Lo-Lyon Republican-এর সম্পাদক 'বলপূর্বক ব্যভিচার অপরাধজনক কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ

> নিরন্ন দরিদ্র যখন ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া চুরি ও লুটতরাজে লিপ্ত হয়, তখন বলা হয় যে, তাহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দাও, চুরি ও লুটতরাজ আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেহের একটি প্রাকৃতিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সাহায্য সহানুভূতি করা হয়, অনুরূপ দ্বিতীয় প্রাকৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মিটানো অর্থাৎ যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির বেলায় তাহা করা হয় না। ক্ষুধার তীব্র তাড়নার পরিণামে যেমন মানুষ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তেমনই বলপূর্বক ব্যভিচার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণহত্যাও যৌনক্ষুধার অনুরূপ তীব্র তাড়নার পরিণাম হিসাবেই হইয়া থাকে–যাহা ক্ষুধাতৃষ্ণা অপেক্ষা কম প্রাকৃতিক নহে। একটি স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবক স্বীয় কামরিপু জোরপূর্বক সংযত রাখিতে পারে না– যেমন সে তাহার ক্ষুধা এই প্রতিশ্রুতিতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না যে, আগামী সপ্তাহে তাহার অন্ন জুটিবে। আমাদের শহরগুলিতে সব কিছুরই প্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু একজন নিঃস্বের উদরান্নের অভাব যেমন মর্মন্তদ, তেমনই তাহার যৌন সম্ভোগের অভাবও অতি মর্মন্তদ। ক্ষুধার্তকে যেমন বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়, তেমনই দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষুধায় যাহারা অতিষ্ঠ, তাহাদের জন্যও কিছু ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ইহা কোন পরিহাসব্যঞ্জক প্রবন্ধ নহে। ইহা যেমন অতি দায়িত্ব ও গুরুত্ব সহকারে লিখিত হইয়াছিল, তেমনই ফরাসী দেশে অতি গুরুত্ব সহকারেই ইহার প্রচারও হইয়াছিল।

এই সময়ে প্যারিসের Faculty of Medicine জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তারকে তাহার একটি প্রবন্ধের জন্য 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করে। প্রবন্ধটি সরকারী মুখপত্রেও প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হইয়াছেঃ

আজ আমরা বিনা দ্বিধায় বলিয়া থাকি যে, রক্তনিষ্ঠীবন (থুথু) ত্যাগের জন্য আমাকে পর্বত শিখরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এমন একদিনও আসিবে, যেদিন আমরা কৃত্রিম গর্ব ও লজ্জা ব্যতিরেকে বলিতে পারিব, বিশ বৎসর বয়সে আমার সিফলিস হইয়াছিল। এই ব্যাধিগুলি তো জীবনের সুখসম্ভোগের মূল্যবিশেষ। যে ব্যক্তি তাহার জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, তাহার দ্বারা কোন ব্যাধির উপক্রম হয় না, – তাহার জীবন অসম্পূর্ণ। সে কাপুরুষতা, নম্র স্বভাব অথবা ধর্মীয় বিভ্রান্তির কারণে তাহার প্রকৃতিগত দৈহিক চাহিদা পূরণে নিবৃত্ত থাকে অথচ ইহা তাহার স্বাভাবিক চাহিদাগুলির মধ্যে একটা নগণ্য চাহিদামাত্র।

নওমালথুসীয় সাহিত্য

সম্মুখে অগ্রসর হইবার পূর্বে গর্ভনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচিত মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মালথুস যখন বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যর্থ কন্ট্রোল বা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাঁহার সেই পরামর্শ এক শতাব্দীর পরে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রচারের সহায়ক হইবে। মাল্থুস জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য আত্মসংযম, অধিক বয়সে বিবাহ প্রভৃতির পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন নও মালথুসীয় আন্দোলন (New Multhusian Movement) শুরু হইল, তখন তাহার মূলনীতি ছিল স্বাধীনভাবে কামরিপু চরিতার্থ করা এবং উহার স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে সন্তানের জন্মলাভ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বন্ধ করা। ইহার ফলে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের যে শেষ প্রতিবন্ধকতাটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দূরীভূত হইয়া পাপাচারের পথ নিষ্কন্টক হইল। কারণ এখন একজন নারী স্বাধীনভাবে তাহার দেহসম্ভারকে পর পুরুষের জন্য বিলাইয়া দিতে পারে। অতপর সন্তান লাভ বা তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে আর কোন শংকাই থাকিল না। এই সবের ভয়াবহ পরিণাম ফল বর্ণনা করিবার অবকাশ এখানে নাই, তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সাহিত্যাবলীতে যে সকল মতবাদের প্রচার করা হইয়াছে, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিব।

যে সব যুক্তিপ্রমাণাদির দ্বারা এই সকল সাহিত্যে নও মালথুসীয় ভূমিকা লেখা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে তিনটি বিরাট ও প্রচণ্ড অভাবের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম খাদ্য, দ্বিতীয় বিশ্রাম ও তৃতীয় কামরিপু চরিতার্থকরণ। প্রকৃতি এই তিনটি বস্তু মানুষের মধ্যে পূর্ণ শক্তিতে গচ্ছিত রাখিয়াছে। এই সবের অভাব পূরণের মধ্যে বিশেষ আনন্দও ঢালিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মানুষ এই সকল অভাব পূরণের জন্য স্বভাবতই অভিলাষী হয়। যুক্তি ও তর্ক মানুষকে ইহার জন্য তীরবেগে ধাবিত হইতে বাধ্য করে। প্রথম দুইটি বিষয়ে তাহার কার্যপ্রণালী একইরূপ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয়টির ব্যাপারে তাহার কার্যপ্রণালী ভিন্নরূপ। সামাজিক নৈতিক বিধান তাহার উপর এই বাধ্যবধকতা আরোপিত করিয়াছে যে, যৌন অভিলাষ বিবাহ ব্যতিরেকে পূর্ণ করা চলিবে না। বৈবাহিক সীমারেখার মধ্যে স্ত্রী–পুরুষের জন্য বিশ্বস্ততা এবং সতীত্ব–সম্ভ্রমকে অনিবার্য করা হইয়াছে। উপরন্তু ইহাও শর্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সন্তানের জন্মনিরোধ করা চলিবে না। এই ধরনের বিধিবিধান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ইহা জ্ঞান ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহা নীতিগতভাবেও ভ্রান্ত এবং মানবতার জন্য ভয়াবহ পরিণামদর্শী।

এবম্বিধ ভূমিকার উপর যে সকল মতবাদের প্রাসাদ নির্মিত হয়, তাহাও একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা Babel স্পষ্ট ভাষায় লিখিতেছেনঃ

–নারী ও পুরুষ তো পশুই। পশু–দম্পতির মধ্যে কি কখনো বিবাহের– স্থায়ী বিবাহের– প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?

Dr. Drysdale বলেনঃ

আমাদের যাবতীয় অভিলাষের মধ্যে প্রেমও একটি পরিবর্তনশীল বস্তু। ইহাকে একক পন্থায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সংশোধন করা। তরুণ–তরুণী একটা বৈশিষ্ট্য সহকারে এই পরিবর্তনের বাসনা রাখে। প্রাকৃতিক বিরাট সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থানুযায়ী আমাদের বাসনা এই যে, এই ব্যাপারে তাহাদের অভিজ্ঞতা যেন রকমারী হয়। স্বাধীন

সম্পর্ক উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিব্যক্তি এইজন্য যে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মনীতির সহিত অধিকতর সাদৃশ্য রাখে। উপরন্তু ইহা ভাবপ্রবণতা, অনুভূতি ও নিস্বার্থ প্রেম হইতে সরাসরি প্রকাশ পায়। যে অনুপ্রেরণা ও বাসনার দ্বারা এই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাহার বিরাট নৈতিক মূল্য রহিয়াছে। এমন সৌভাগ্য সেই ব্যবসাসুলভ আদানপ্রদানের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে, যাহা বিবাহকে প্রকৃতপক্ষে একটি পেশায় পরিণত করে?

পাঠক লক্ষ্য করুন, দৃষ্টিভংগীর কিরূপে কখন পরিবর্তন হইতেছে এবং ক্রমশ কিভাবে বিপরীত মতাদর্শ গ্রহণ করা হইতেছে। প্রথমত এই চেষ্টা চলিয়াছিল যে, ব্যাভিচারকে নৈতিকতার দিক দিয়া নির্দোষ মনে করা হইবে এবং বিবাহ ও ব্যাভিচার সমপর্যায়ভুক্ত হইবে। কিন্তু এখন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিবাহকেই দূষণীয় মনে করা হইতেছে এবং ব্যাভিচারকে উৎকৃষ্টতর মর্যাদা দান করা হইতেছে।

উক্ত ডাক্তার অন্য এক স্থানে বলিতেছেনঃ

এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাহার দ্বারা বিবাহ ব্যতিরেকে প্রেম করাকে সম্মানজনক মনে করা যায়। ইহা আনন্দের বিষয় যে, তালাকের পন্থা শিথিল হওয়ায় বিবাহের পথও বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কারণ এখন বিবাহটা মিলিতভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি চুক্তি এবং উভয় পক্ষ যখন ইচ্ছা তখনই এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। যৌন মিলনের ইহাই একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা।

ফরাসীদেশের খ্যাতনামা নও–মালথুসীয় নেতা Paul Robin লিখিতেছেনঃ

বিগত পঁচিশ বৎসরে আমরা এতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছি যে, অবৈধ সন্তানকে আমরা প্রায় বৈধ সন্তানের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছি। এখন এতটুকু করিবার আছে, যাহাতে এখন হইতে শুধু হারামী বা অবৈধ সন্তানই জন্মলাভ করিতে পারে। কারণ তাহা হইলে আর প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠিবে না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক 'মিল' সাহেব তাঁহার গ্রন্থ On Libertyতে দৃঢ়তার সহিত ইহা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি জীবন যাপন করিবার জন্য যথেষ্ট

উপায়-উপাদানের প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহাকে আইনের সাহায্যে বিবাহ হইতে বিরত রাখা হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করার প্রশ্ন উঠিল, তখন এই বিজ্ঞ দার্শনিকই উহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, ইহা দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং শ্রমিকদের অবমাননা করা হয়। কারণ ইহার দ্বারা তাহাদের সহিত ছেলেমী করা হইয়াছিল।

চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্যাক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা এইজন্য দিতে হইবে যে, উহার সুযোগে ব্যভিচার করা হইবে। কিন্তু কোন মূর্খ যদি ব্যক্তি স্বাধীনতার বলে বিবাহ করিতে চায়, তবে তাহার সে স্বাধীনতার রক্ষার অধিকার থাকিবে না। তাহার স্বাধীনতায় আইনের হস্তক্ষেপ শুধু গ্রহণযোগ্যই নহে, বরং স্বাধীনতাপ্রিয় দার্শনিকের বিবেক উহাকে প্রয়োজনীয় মনে করে। এখানে নৈতিক দৃষ্টিভংগীর বিপ্লব চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। যাহা দুষণীয় ছিল, তাহা এখন নির্দোষ হইয়াছে এবং যাহা নির্দোষ ছিল তাহা এখন দুষণীয়।

পরিণাম ফল

সাহিত্য অগ্রভাগে চলে, জনমত চলে তাহার পশ্চাতে। অবশেষে সামাজিক চরিত্র, নিয়মনীতি, রাষ্ট্রের আইন-কানুন তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। যেখানে ক্রমাগত দেড় শত বৎসর যাবত দর্শন, ইতিহাস, নৈতিকতা, বিজ্ঞান, উপন্যাস, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতি মানসিক বিপ্লব সৃষ্টিকারী উপায়-উপাদানগুলি সম্মিলিত শক্তিতে একই প্রকারের দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাধারা মানুষের মনে অনুপ্রবিষ্ট করিতে থাকে, সে ওখানে সমাজের এইরূপ চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত না হওয়া এক অতি অসম্ভব ব্যাপার। অতপর যেখানে সরকার ও যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে ইহাও সম্ভব নহে যে, জনমতের পরিবর্তনের সহিত আইনেরও পরিবর্তন হইবে না।

শিল্প বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া

অবলীলাক্রমে অন্যান্য তামাদ্দুনিক উপকরণ ঠিক সময়োপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়েই শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা অর্থনৈতিক জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তাহার যে সকল প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা ঘটনা প্রবাহকে সেই দিকেই পরিচালিত করিতেছিল, যেদিকে বিপ্লবী সাহিত্যগুলি পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার যে ধারণার উপরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ব্যাপক উৎপাদনের (Mass Production) সম্ভাবনা তাহাকে অসাধারণ শক্তি দান করিয়াছিল। ধনিক শ্রেণী বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কায়েম করিল। শিল্প ব্যবসায়ের নূতন নূতন কেন্দ্রগুলি বিরাট বিরাট নগরে পরিণত হইল। পল্লী অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে শহরে টানিয়া আনা হইল। জীবিকা আশাতিরিক্ত মহার্ঘ হইয়া পড়িল। বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দৈনন্দিন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িল। কিছুটা সাংস্কৃতিক উন্নতির কারণে এবং কিছুটা পুঁজিপতিদের চেষ্টায় জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে অসংখ্য

বিলাস–সামগ্রী স্থানলাভ করিল। কিন্তু পুঁজিপতিগণ দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত আরাম, আনন্দ উপভোগ ও বিলাসভূষণের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা লাভ করিবার উপায়–উপকরণ যাহাতে সকলে সমভাবে ভোগ করিতে পারে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই পর্যায়ে ধনবন্টন করা হইল না। পুঁজিপতিগণ পল্লী অঞ্চল হইতে জনসাধারণকে শহরে টানিয়া আনিবার পর তাহাদের এতটুকু আর্থিক উপকরণেরও ব্যবস্থা করিয়া দেয় নাই যদ্দ্বারা তাহাদের জীবন যাপনের অত্যাবশ্যক সামগ্রী, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির সংস্থান সহজেই হইতে পারিত। ইহার ফল এই হইল যে, স্ত্রী স্বামীর এবং সন্তান–সন্ততি পিতার গলগ্রহ হইয়া পড়িল। জ্ঞাতি কুটুম্ব ও স্বজনবর্গের বোঝা বহন করা তো দূরের কথা, নিজকে নিজেরই সামাল দেওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িল। আর্থিক অবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপার্জন করিতে বাধ্য করিল। কুমারী, বিবাহিতা নারী, বিধবা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর নারীকে জীবিকার্জনের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে হইল। অতপর যখন নারী পুরুষের একত্রে মেলামেশার সুযোগ বাড়িয়া গেল এবং উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল দেখা দিল, তখন স্বাধীনতার ধারণা ও নূতন চরিত্র দর্শন পিতা–কন্যা, ভ্রাতা–ভগ্নি, স্বামী–স্ত্রী সকলকে সান্তনা দান করিয়া বলিল, 'অধীর হইও না, যাহা হইতেছে বেশ হইতেছে! ইহা অধপতন নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই উন্নতি ও মুক্তি (Emancipation)। এই যে অতল গহবরে পুঁজিপতিগণ তোমাদিগকে নিক্ষেপ করিতেছে, ইহা নরককুণ্ড নহে, স্বর্গ–পরম স্বর্গ।'

ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বার্থ

অন্যান্য বিষয় এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রহিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতার এক প্রকার ধারণার উপরে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ব্যক্তিকে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে ধনার্জনের সীমা শর্তহীন নিরংকুশ অধিকার দান করিল। যে কোন উপায়েই ধন অর্জিত হউক, এমন কি কাহারও ধনার্জনের ফলে যতজনেরই ধ্বংস সাধন হউক না কেন–নূতন চরিত্রদর্শন তাহাকে বৈধ ও পবিত্র বলিয়া মনে করিল। এইরূপে যাবতীয় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, সমষ্টির বিপক্ষে সকল দিক দিয়া ব্যক্তিকে সমর্থন করা হইল। পক্ষান্তরে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বার্থের বিপক্ষে সমষ্টির অধিকার রক্ষার কোনই উপায় রহিল না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের জন্য সমাজকে ধ্বংস করিবার

যাবতীয় পথ উন্মুক্ত হইল। তাহারা যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতার সুযোগে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধ করিবার নব নব পন্থা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে এবং সে স্বীয় পকেট পূর্ণ করিবার জন্য অপরকে মদ্যপানের কুকার্যে লিপ্ত করিতেছে। এই প্লেগ-মূষিক হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছে না। অপর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে এবং সে সুদের জাল বিস্তার করিয়া দিতেছে। এমন কেহ নাই যে, মানুষকে এই রক্ত শোষক জোঁকের কবল হইতে রক্ষা করে। উপরন্তু যাবতীয় আইনকানুন এই রক্ত শোষকের স্বার্থ সংরক্ষিত করিতেছে, যেন কেহই তাহার কবল হইতে এক বিন্দু রক্তও নিরাপদে রাখিতে না পারে। তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে, সে জুয়ার এক অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। ইহার প্রসার এত ব্যাপক হইতেছে যে, শিল্প ব্যবসায়ের কোন বিভাগই জুয়ার প্রভাব মুক্ত হইতেছে না। মানুষের অর্থনৈতিক আয়ুকে এই দাহনকারী অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার কেহই নাই। যে যুগে মানুষের অতি মারাত্মক দুর্বলতা যৌন উন্মাদনায় ইন্ধন সংযোগ করত প্রভূত স্বার্থসিদ্ধ করা সম্ভব হইত সেই যুগে সেই ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ ও শত্রুতার অপবিত্র যুগে এবম্বিধ মানবীয় দুর্বলতার প্রতি স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বস্তুত এই যৌন- উচ্ছৃংখলতার দ্বারা যথাসম্ভব কার্যোদ্ধার করা হইয়াছে। রংগমঞ্চ, নৃত্যশালা ও চলচ্চিত্রের নির্মাণকেন্দ্রগুলিতে যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করিয়াই চলিত। এই সকল কার্যে নারীর অংশ গ্রহণ অনিবার্য ছিল। নারীকে অধিকতর নগ্ন আকারে এবং কামোদ্দীপক মূর্তিতে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইত। ইহা দ্বারা লোকের যৌন তৃষ্ণাকে বর্ধিত করিয়া তাহাদের অর্থ লুট করা হইত। কিছু সংখ্যক লোক নারীকে ভাড়া খাটাইতে শুরু করিল এবং বেশ্যাবৃত্তির উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকে একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত করিল। আবার কতিপয় লোক সৌন্দর্য ও বিলাসিতার নব নব উপকরণ আবিষ্কার করত তাহার দ্বারা নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্মগত অনুভূতিকে বাড়াইয়া নিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তোলা হইল এবং স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীর দল ইহার দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার যৌন উত্তেজক নব নব বেশভূষা ও নগ্নতার ফ্যাশান আবিষ্কার করত সুন্দরী নারীকে উহা পরিধান করাইয়া সমাজে বিচরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিল এবং নব্য যুবকের দল

সতৃষ্ণ নয়ন ও মন লইয়া ইহাদের দিকে ভীড় জমাইতে লাগিল। তরুণীর দল নবাবিষ্কৃত উলংগ বাহার বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং নূতন পোশাকের বাজারও সরগরম হইয়া উঠিল। কতিপয় লোক সুযোগ বুঝিয়া নগ্ন ছবি ও অশ্লীল সাহিত্যের প্রচার শুরু করিল এবং এইভাবে জনসাধারণকে কুষ্ঠব্যাধিতে সংক্রমিত করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল। ক্রমশ অবস্থা এতদূর গড়াইল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন বিভাগও যৌন উম্মাদনার উপায়-উপকরণ হইতে মুক্ত রহিল না। যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনাদির প্রতি লক্ষ্য করুন, দেখিতে পাইবেন যে, নারীর নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন প্রতিকৃতি তাহার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় যেন নারীর প্রতিকৃতি ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞপ্তি একেবারেই মূল্যহীন। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকানের শো-রুম বা প্রদর্শনী কক্ষ প্রভৃতিতে নারীমূর্তি এমনভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যেন পুরুষ তদ্দিকেই আকৃষ্ট হয়। এহেন পরিস্থিতিতে অসহায় হতভাগ্য জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার একটিমাত্র উপায় এই ছিল যে, নিজেদের নৈতিক মনোবল দ্বারা এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিবে এবং যৌন উম্মাদনার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন দুর্বল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না যে, তাহার আক্রমণকে প্রতিহত করা যাইতে পারে। তাহাদের নিকট একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন ও শক্তিশালী শয়তানী বাহিনী তথা সাহিত্য ছিল, যাহা সংগে সংগে নৈতিক দৃষ্টিভংগীকে পরাস্ত ও পরাভূত করিয়া দিত। হত্যাকারীর কৃতিত্ব এই যে, সে বলির পশুকে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে বলির জন্য প্রস্তুত করিয়া লয়।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা

এইখানেই বিপদের সমাপ্তি হয় নাই। উপরন্তু এই স্বাধীনতার ধারণা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্মদান করিল. এবং তাহা এই ধরনের নৈতিক বিপ্লবকে ষোলকলায় পূর্ণ করিবার এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইল।

নতুন গণতন্ত্রের মূলনীতি এই ছিল যে, মানুষ স্বয়ং তাহার শাসক হইবে এবং নিজেদের জন্য শাসন-সংবিধান ও আইন-কানুন রচনা করিবে। যেমন ইচ্ছা তেমন আইন তাহারা রচনা করিবে এবং ইচ্ছামত কোন আইন রহিত বা পরিবর্তন করিবে। তাহাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তারকারী মানবীয় দুর্বলতামুক্ত কোন উর্ধ্বতন শক্তি বা কর্তৃপক্ষ নাই, যাহার পথনির্দেশ নত মস্তকে মানিয়া

লইয়া মানুষ ভ্রান্ত পথ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারে। তাহাদের নিকটে চিরশাশ্বত মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভূত অপরিবর্তনীয় কোন বুনিয়াদী আইন-কানুন ছিল না। মানবীয় কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবর্তিত হয় না, এমন অচল-অটল কোন কষ্টিপাথর তাহাদের নিকটে ছিল না, যাহা দ্বারা তাহারা সত্য-অসত্য নির্ণয় করিতে পারে। এইরূপে গণতন্ত্রের নূতন দৃষ্টিভগী মানুষকে পূর্ণ স্বয়ংশাসক (Autonomous) এবং দায়িত্বহীন করিয়া দিল। তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসক হইল এবং জনমতকেই প্রতিটি আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করিল।

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে সামাজিক জীবনে যাবতীয় আইন-কানুন জনমতের অধীন হয় এবং যেখানে শাসন কর্তৃপক্ষ এই নতুন গণতন্ত্রখোদার দাস হইয়া পড়ে, সেখানে আইন-কানুন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমাজকে নৈতিক বিশৃংখলা হইতে রক্ষা করিতে পারেই না, বরং শেষ পর্যন্ত উহার ধ্বংস সাধনের সহায়ক হইয়া পড়ে। জনমতের পরিবর্তনের সংগে সংগে আইনেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। জনসাধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর যেরূপ পরিবর্তন হইতে থাকিবে, আইন-কানুনের মূলনীতি ও বন্ধন অনুরূপভাবে গড়িতে থাকিবে। ভোটের আধিক্য যেদিকে হইবে, তাহাই সত্য এবং কল্যাণ নির্ণয়ের কষ্টিপাথর হইবে। কোন একটি প্রস্তাব, তাহা যতই অশুভ ও অসংগতই হউক না কেন, যদি শতকরা একান্নজনের সমর্থন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করিতে কোন বাধাই থাকিবে না। ইহার এক নিতান্ত বীভৎস ও ঘৃণার্হ দৃষ্টান্ত জার্মানীর নাৎসীপূর্ব যুগে পাওয়া যায়। ডাঃ ম্যাগনাস হার্শফিল্ড (Dr. Magnus Herschfield) নামক জনৈক জার্মান দার্শনিক বিশ্বজনীন যৌন সংস্কার সভার (World League of Sexual Reform) সভাপতি ছিলেন। তিনি ছয় বৎসর যাবত লূত জাতির কুকার্যের সমর্থনে শক্তিশালী প্রচারকার্য চালান। অবশেষে গণতন্ত্রখোদা এই গতি অবৈধ কার্যকে 'হালাল' বা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সম্মত হইল এবং জার্মান পার্লামেন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে উক্ত কার্য সম্পাদিত হইলে তাহা আর অবৈধ থাকিবে না। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, যাহার প্রতি উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত সে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহা হইলে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে রায় দান করিবে।

এই গণতন্ত্র খোদার দাসত্ব পালনে আইনকে কিঞ্চিৎ ধীরগতি দেখা যায়, ইহার আদেশাবলী প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অলসতা ও ঔদাসীন্যের সহিত। পরিপূর্ণ দাসত্ব পালনে এই যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া যায়, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার সকল অংশ মিলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। যাহারা এই সকল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তাহারা আইন রচনার পূর্বেই তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাহিত্য, নৈতিক দর্শন এবং জনসাধারণের ভাবপ্রবণতার প্রভাব স্বীকার করিয়া লয়। যে সকল নৈতিক উচ্ছৃংখলতা জনসাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে, শাসন কার্য পরিচালকদের অনুগ্রহে তাহার প্রতিটি সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। যে সকল বিষয় তদবধি নিষিদ্ধ থাকে, পুলিশ ও বিচারালয় সেই সকল বিষয়ে আইনকে কার্যকরী করিতে বিরত থাকে। এইরূপে নিষিদ্ধ কার্যগুলিও বৈধ বলিয়া পরিগণীত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গর্ভনিপাতের বিষয়ই ধরা যাউক। ইহা পাশ্চত্য আইনে এখনও পর্যন্ত নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু এমন দেশ নাই, যেখানে ইহা প্রকাশ্যে এবং অধিক পরিমাণে করা হইতেছে না। ইংলন্ডে প্রতি বৎসর আনুমানিক নব্বই সহস্র গর্ভনিপাত করা হয়। বিবাহিতা নারীদের মধ্যে শতকরা পঁচিশজন এমনও আছে, যাহারা হয় নিজেরাই গর্ভনিপাত করে কিংবা এই ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করে। কোন কোন স্থানে গর্ভনিপাতের যথারীতি ক্লাব স্থাপিত আছে। অভিজাত মহিলাগণ তথায় সাপ্তাহিক ফিস্ দিয়া থাকেন এবং প্রয়োজনানুসারে গর্ভনিপাত বিশেষজ্ঞের পরিচর্যা লাভ করিয়া থাকেন। লন্ডনে এইরূপ বহু নার্সিংহোম আছে যেখানে গর্ভনিপাতের রোগিনীদের চিকিৎসা হয়।[১] এতদ সত্ত্বেও ইংলন্ডের আইন গ্রন্থ এখনও গর্ভনিপাত অপরাধজনক বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে।

মূলতত্ত্ব ও প্রমাণাদি

এখন আমি বিস্তারিত বর্ণনা করিতে চাই যে, আধুনিক নৈতিক দৃষ্টিভংগী, ধনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসন-এই তিনটি উপাদানের একত্র সমাবেশে সামাজিক চরিত্র এবং নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক

---

১. অধ্যাপক জুড়, তাঁহার Guide to Modern weckedness গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

কতখানি প্রভাবান্বিত করিতেছে এবং কি পরিমাণ পরিস্ফুট হইতেছে। যেহেতু আমি এ যাবত অধিক পরিমাণে ফরাসী দেশেরই উল্লেখ করিয়াছি– যেখান হইতে এ আন্দোরন শুরু হইয়াছিল–সেইজন্য আমি সর্বপ্রথমে ফরাসী দেশকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিব।[২]

নৈতিক অনুভূতির বিলোপ সাধন

পূর্বতন অধ্যায়ে যে সকল দৃষ্টিভংগীর বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার প্রচারণার প্রাথমিক ফল এই হইল যে, যৌন আচরণ সম্পর্কে মানুষের নৈতিক অনুভূতি বিকল হইয়া পড়িল। লজ্জা, শ্লীলতা, ঘৃণা, অবজ্ঞা প্রভৃতি দিন দিন লোপ পাইতে লাগিল। বিবাহ ও ব্যভিচারের পার্থক্য–জ্ঞান হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। অবশেষে ব্যভিচার এমন এক নির্দোষ বস্তুতে পরিণত হইল যে, তাহা ঘৃণাভরে গোপন করার প্রয়োজন বোধই রহিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ফরাসী জনসাধারণের নৈতিক দৃষ্টিভংগীর শুধু এতটুকু পরিবর্তন হইয়াছিল যে, পুরুষের পক্ষে ব্যভিচার এক অসাধারণ প্রাকৃতিক বিষয় বলিয়া মনে করা হইত। তরুণ বয়স্ক পুত্রগণ যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত না হইলে কিংবা তাহাদের বিচারালয়ে প্রেরিত হইবার আশংকা না থাকিলে, পিতা–মাতা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দান করিত। উপরন্তু বৈষয়িক দিক দিয়া লাভবান হইলে তাহারা পরম পরিতুষ্ট হইত। তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, বিবাহ ব্যতিরেকে নারী–পুরুষের যৌন–সম্পর্ক দুষনীয় নহে। এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, পিতা–মাতা তরুণ বয়স্ক পুত্রদিগকে প্রভাবশীলা অথবা ধনাঢ্য নারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করত ভবিষ্যত উজ্জ্বল করিতে উদ্বুদ্ধ করিত। কিন্তু তখণ পুরুষদের সম্পর্কে তাহাদের দৃষ্টিভংগী পরবর্তীকালীন দৃষ্টিভংগী হইতে বিভিন্ন ছিল। নারীর সতীত্বকে মূল্যবান মনে করা হইত। যে পিতা–মাতা স্বীয় পুত্রদের যৌন–স্বেচ্ছাচারিতাকে যৌবনোচ্ছ্বাস মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিত, তাহারাই আবার আপন কন্যার চরিত্রে কোন কলুষ–কালিমা সহ্য করিতে পারিত না। অসৎ পুরুষকে নির্দোষ মনে করা হইলেও অসৎ নারীকে নির্দোষ

---

২. ফরাসীর সমাজতত্ত্ববিদ Paul Bureau –এর গ্রন্থ Towards Moral Bankruptcy দ্রষ্টব্য। ইহা ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হয়।

মনে করা হইত না। ব্যবসায়ী বারাংগণার নামোচ্চারণে ঘৃণাভরে ভ্রূকুঞ্চিত হইলেও তাহার শয্যাসংগী পুরুষের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হইত না। অনুরূপভাবে দাম্পত্য জীবনেও নারী পুরুষের নৈতিক দায়িত্ব একই রূপ ছিল না। স্বামীর চরিত্রহীনতা সহ্য করা হইলেও স্ত্রীর চরিত্রহীনতা মারাত্মক দূষণীয় ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে এই অবস্থার পরিবর্তন হইল। নারী স্বাধীনতার আন্দোলন নারী–পুরুষের নৈতিক সাম্যের যে বাঁশী বাজাইল, তাহার ফল এই হইল যে, পুরুষের কুকার্যের ন্যায় নারীর কুকার্যকেও নির্দোষ মনে করা হইল। বিবাহ ব্যতিরেকে কোন পুরুষের সহিত যৌন–সম্পর্ক স্থাপন করিলে নারীর আভিজাত্য বা মান–সম্ভ্রমে আঘাত লাগিতে পারে, এই ধারণাও পরিবর্তিত হইল।–Paul Bureau বলেনঃ

শুধু বড় বড় শহরেই নহে, ফ্রান্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর ও পল্লীতেও নব্য যুবকদের দল এই নীতিকে মানিয়া লইয়াছে যে, তাহারা যখন নিজেরাই জিতেন্দ্রিয় নহে, তখণ ঘটকের নিকটে সতী বা কুমারী নারীর দাবি করিবার তাহাদের অধিকার নাই। বারগুন্ডী, বুন ও অন্যান্য অঞ্চলে ইহা এক সাধারণ ব্যাপার যে, বিবাহের পূর্বে বালিকা বহু বান্ধবের সাহচর্য লাভ করে এবং বিবাহের সময় তাহার বিগত জীবনের ঘটনাবলী ঘটকের নিকট অপ্রকাশ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। তাহার স্বজনগণও তাহার অসৎ সংগ লাভের জন্য কিছুই মনে করে না। খেলাধুলা অথবা জীবিকার্জন সম্পর্কে আলোচনার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের অকাতরে পর পুরষের সহিত অবৈধ সাহচর্যের বিষয় আলোচনা করে। বিবাহকালে পাত্র যে শুধু পাত্রীর বিগত জীবন সম্পর্কে অবহিত হয় তাহা নহে, বরং যে সমস্ত বন্ধুবর্গ তখন পর্যন্ত তাহার দেহ সম্ভারকে উপভোগ করিয়াছে, তাহাও তাহার গোচরীভূত হয়। এমতাবস্থায় পাত্র প্রবর বিশেষ সচেষ্ট থাকেন, যাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে না পারে যে, পাত্রীর এতাদৃশ কার্যকলাপের প্রতি তাহার কোনরূপ আপত্তি আছে।

–উক্ত গ্রন্থের, পৃ.৯৪

তিনি আরও বলেনঃ

ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিতা মেয়েদিগকে অফিস অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। তাহারা ভদ্র

সমাজে অবাধ মেলামেশাও করে এবং সকল কার্য মোটেই নীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হয় না। অতপর এই সকল মেয়েদের কেহ কোন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত বসবাস করিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ একেবারেই অনাবশ্যক মনে করা হয়। তাহারা বিবাহ ব্যতিরেকেই একত্রে বসবাস করাকে শ্রেয় মনে করে। অবশ্য উভয়ের মনের সাধ পরিপূর্ণ হইবার পর একের অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র কোথাও প্রেম নিবেদন করিবার পূর্ণ অধিকার তাহাদের থাকে। তাহাদের এহেন সম্পর্ক সম্বন্ধ সমাজের নিকটে অজ্ঞাত থাকে না। তাহারা উভয়ে মিলিয়া ভদ্র মহলে যাতায়াত করে। তাহাদের এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্ককেও তাহারা গোপন করে না এবং অন্য কেহই তাহাদের এই জীবন যাপন প্রণালীতে মন্দ কোন কিছু দেখিতে পায় না। যাহারা কারখানায় কাজ করে, তাহাদের মধ্যেই প্রথমত এই আচরণ দেখা যায়। পরে ইহা অত্যন্ত দূষনীয় মনে করা হইত। কিন্তু ইহা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এক সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক জীবনে বিবাহের যে মর্যাদা ছিল, এই ধরনের জীবন যাপন এখন সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

–উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৪–৯৬

এইভাবে রক্ষিতাকেও এখন যথারীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। মঁশিয়ে বার্থেলেম (M.Berthelemy) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বলেন যে, 'ক্রমশ রক্ষিতা নারী বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় আইনগত মর্যাদা লাভ করিতেছে। পার্লামেন্টে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা শুরু হইয়াছে। এখন সরকার তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সৈনিকের বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য যে ভাতা বরাদ্ধ করা হয় উক্ত সৈনিকের মৃত্যুর পরও তাহার স্ত্রীর ন্যায় অনুরূপ বৃত্তি তাহার রক্ষিতাও ভোগ করে।'

ফরাসী নীতিবিজ্ঞান অনুযায়ী ব্যভিচারকে নির্দোষ মনে করিবার কারণ নিম্নের ঘটনা হইতে নির্ণয় করা যায়ঃ

খৃ. ১৯১৮ সালে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রী অবিবাহিতা হইয়াও গর্ভধারণ করে। শিক্ষা বিভাগে কিছু সংখ্যক পুরাতনপন্থী লোক ছিল, তাহারা এতদ্বিষয়ে কিছু হৈ চৈ শুরু করিল। ইহাতে সম্ভ্রান্ত লোকদের

একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রী সমীপে গমন করত নিম্নের যুক্তি প্রমাণাদি এমনভাবে উপস্থাপিত করিল যে, উক্ত শিক্ষয়িত্রীর বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হইল।

১. কাহারও ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করিবার অন্যের কি অধিকার আছে?
২. তাহার অপরাধই বা এমন কি হইয়াছে?
৩. বিবাহ ব্যতিরেকে সন্তানের মাতা হওয়া কি অধিকতর গণতান্ত্রিক নহে?

ফরাসী সৈন্য বিভাগে সৈনিকদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে যৌনব্যাধি হইতে নিরাপদ থকিবার এবং গর্ভনিরোধ বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ ইহা এক অবধারিত সত্য যে, সৈনিকগণ নিশ্চিতরূপেই ব্যভিচার করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে ফরাসীর ১২৭ ডিভিশনের উইং কমান্ডার সৈনিকদের নামে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেঃ

জানিতে পারা গেল যে, সামরিক বেশ্যালয়ে সশস্ত্র সৈনিকদের ভীড় হওয়ার অভিযোগ করা হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, সশস্ত্র সৈনিকেরা ঐ স্থানে একেবারে তাহাদের ইজারা কায়েম করিয়া লইয়াছে এবং অন্য কাহাকেও কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গণিকা বৃদ্ধির জন্য হাই কম্যান্ড চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যতদিন ইহার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন এতদ্বারা সশস্ত্র সৈনিকদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা যেন বেশীক্ষণ ভিতরে না থাকে। তাহারা আপন কামরিপু চরিতার্থ করিতে যেন একটু তাড়াতাড়ি করে।

চিন্তা করিয়া দেখুন, এই বিজ্ঞপ্তি পৃথিবীর একটি সুসভ্য সরকারের সামরিক বিভাগ হইতে যথারীতি সরকারীভাবে প্রচার করা হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, ব্যভিচার যে নৈতিক দৃষ্টিভংগীতে দুষণীয় হইতে পারে এমন কল্পনাও তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। সমাজ, দেশের আইন এবং সকলের মন হইতেই এই ধারণা বিদূরিত হইয়াছিল।[১]

---

১. যে সকল সৈনিকের নৈতিক অবস্থা এইরূপ, তাহারা যখন বিজয়ীর বেশে কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন সেই দেশের নারী সমাজের সম্ভ্রম–সতীত্বের কি ভয়াবহ পরিনাম হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সামরিক বাহিনীর ইহা এক প্রকারের নৈতিক মান। অপর এক

প্রথম মহাসমরের কিয়ৎকাল পূর্বে ফ্রান্সে একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন নারীর অবস্থা ও নৈতিক চালচলন যেরূপই হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই তাহাকে এক নুতন পরীক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করাই উক্ত এজেন্সীর কাজ ছিল। কোন পুরুষ কোন নারীর সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে শুধু সেই নারীর ঠিকানা বলিয়া দিতে হইত। তদুপরি প্রাথমিক ফিস হিসাবে পঁচিশ ফ্রাংক উক্ত এজন্সীতে দাখিল করিতে হইত। অতপর সেই নারীকে উক্ত কাজের জন্য সম্মত করা এজেন্সীর কর্তব্য হইয়া পড়িত।

এই এজেন্সীর রেজিষ্টার দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে, ফরাসী সমাজের এমন কোন শ্রেণী ছিল না, যাহারা বহু সংখ্যক লোক এই এজেন্সীর মাধ্যমে ব্যবসা করে নাই। এই সকল কার্য ফরাসী সরকারের নিকটে গোপন ছিল না।

–পল ব্যুরো, পৃ. ১৬

তাহাদের নৈতিক অধপতন কতখানি চরমে পৌছিয়াছিল, সে সম্পর্কে পল ব্যুরো বলেনঃ

ফ্রান্সের কতিপয় জেলায় এবং বড় বড় শহরের জনবহুল অঞ্চলগুলিতে নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে, এমন কি পিতা–কন্যা ও ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা বিরল ছিল না।

অশ্লীলতার আধিক্য

প্রথম মহাসমরের পূর্বে ফ্রান্সের এটর্নি জেনারেল মঁশিয়ে বুলো (M.Bulot) তাঁহার এক রিপোর্টে জানান যে, যে সকল নারী তাহাদের দেহ ভাড়া খাটাইয়া জীবিকার্জন করিত, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছিল। কিন্তু তথাকার দেহ ব্যবসায়ী নারীদের সহিত ভারত উপমহাদেশের বারাংগনাদের তুলনা করিলে

প্রকার নৈতিকের মান পবিত্র কুরআন উপস্থাপিত করিতেছে ঃ 'মুসলমানগণ জগতে ক্ষমতার অধিকারী হইলে তথায় তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, পূণ্য কাজের জন্য আদেশ করে এবং গর্হিত কার্যে বাধা দান করে।' এক ধরনের সৈনিক পৃথিবীতে ষন্ডের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্য ধরনের সৈনিক এইজন্য ক্ষমতা হস্তগত করে যে, মানবীয় নৈতিক মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং মানুষকে পবিত্রতা শিক্ষা দিবে। মানুষ কি এতই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, এতদুভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিবে না?

চলিবে না। ফ্রান্স একটি সুসভ্য ও উন্নত দেশ। তথাকার যাবতীয় কার্য ভদ্রতা ও সুব্যবস্থার সহিত ব্যাপক আকারে করা হইয়া থাকে। সংবাদপত্র, চিত্র, পোস্টকার্ড, টেলিফোন, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণপত্র প্রভৃতি যাবতীয় শিষ্টাচারসুলভ পন্থায় গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মানুষের বিবেক কখনও এ সকল কার্যের জন্য তিরস্কার করে না, বরং যে সকল নারী এই ব্যবসায়ে অধিকতর ভাগ্য অর্জন করিবার সুযোগ পায়,তাহারা অধিকাংশ সময়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে পারে। গ্রীস সভ্যতার কালে এই শ্রেণীর নারীদের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ হইয়াছে।

ফরাসী সিনেটের জনৈক সদস্য মঁশিয়ে ফার্দিনান্দ দ্রিফু (M. Ferdinand Dreyfus) বলেন যে, বেশ্যাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। ইহার এজেন্সীর দ্বারা যে আর্থিক লাভ হয়, তাহাতে ইহা একটি ব্যবসায় এবং সুসংগঠিত শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ইহার কাঁচামাল সরবরাহ করিবার এজেন্ট স্বতন্ত্র ও অল্প বয়স্কা বালিকাদিগকে এই ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য হিসাবে আমদানী রপ্তানী করা হয়। এখানে দশ বৎসরের কম বয়সের বালিকার চাহিদা অত্যন্ত অধিক।

পল ব্যুরো বলেনঃ

> ইহা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহা সুসংগঠিত উপায়ে বেতনভোগী উচ্চ কর্মচারী ও কর্মী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রচার, লেখক, বক্তা, চিকিৎসক, ধাত্রী ও ব্যবসায়ী, পর্যটক এখানে চাকুরী করে। ইহাতে বিজ্ঞাপনের সাহায্য লওয়া হয় এবং প্রদর্শনীর নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করা হয়।

অশ্লীলতার এই আড্ডাগুলি ব্যতীতও হোটেল, চা-খানা, নৃত্যশালা প্রভৃতিতে প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি চলে। কোন কোন সময়ে আবার পাশবিক অত্যাচার এবং চরম নিষ্ঠুরতা চলে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একবার ফ্রান্সের একটি নগরের নরপতিকে (Mayor) হস্তক্ষেপ করত একটি বালিকার প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। উক্ত বালিকাটিকে সারা দিনে সাতাইশ জন গ্রাহকের মনতুষ্টি করিতে হইয়াছিল এবং তাহার পরও বহু গ্রাহক অপেক্ষমাণ ছিল।

প্রথম মহাসমরে ব্যবসায়ী বেশ্যালয় ব্যতীতও এক প্রকার দাতব্য বেশ্যালয় স্থাপনের গৌরব অর্জন করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যে সমস্ত দেশপ্রেমিক নারী ফরাসী দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বীরগণের মহান সেবা করিয়া অবৈধ পিতৃহীন সন্তান লাভ করিয়াছিল তাহারা এর সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছিল। এই প্রকার ইতর ধারণাকে ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে নহে। এই সকল নারী সুসংগঠিত উপায়ে বেশ্যাবৃত্তি করিতে থাকে এবং ইহাদের সাহায্য করা দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকদের নৈতিক কর্তব্য হইয়া পড়ে। বহুল প্রচারিত ফ্রানটাসিও (Frantasio) ও লাভি প্যারিসিয়া (Lavie Parisiemme) কর্মকুশল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই সকল নারীদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার ব্যাপারে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শেষোক্ত পত্রিকাটির একটি সংখ্যায় উক্ত নারীদের ১৯৯টি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

যৌনোন্মাদনা ও অশ্লীলতার সংক্রামক ব্যাধি

যৌন ব্যাধি

যৌন প্রবণতার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্বাভাবিক পরিণামস্বরূপ লজ্জাহীনতার ও ব্যভিচার যে ব্যাপক আকারে জনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার মূলে ছিল ঐ সকল সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, ছায়াচিত্র, নাট্যাভিনয়, নৃত্যগীত, নগ্নতা ও অশ্লীলতা।

স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিদের একটি বাহিনী সকল সম্ভাব্য উপায়ে যৌনতৃষ্ণায় ইন্ধন যোগাইবার কার্যে লিপ্ত থাকে এবং এই উপায়ে নিজেদের ব্যবসায় প্রসার করে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি চরম অশ্লীলতাপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও চিত্রাদি প্রকাশ করে। কারণ, তাহাদের পত্রিকার বহুল প্রচারের ইহা অধিকতর কার্যকরী অস্ত্র বিশেষ। এই কাজে উন্নত ধরনের প্রতিভা, কৌশল ও মনস্তাত্ত্বিক নিপুণতার প্রয়োগ করা হয়, যাহাতে শিকার কোনক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে না পারে। এতদ্ব্যতীত যৌনসমস্যা সম্পর্কিত চরম অশুচি সাহিত্য ও প্রচারপত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সকল এত অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয় যে, এক এক সংস্করণে পঁচিশ–ত্রিশ হাজার পর্যন্ত ছাপান হয়। অনেক সময় এই সকল সাহিত্যের সষ্টিতম সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কোন কোন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শুধু এই কাজের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে। এমন অনেক লেখক ও সাহিত্যিক আছে, যাহারা এইরূপ কাজ করিয়াই খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করিয়া থাকে। কোন অশ্লীল গ্রন্থ প্রণয়ন এখন আর মোটেই অসম্মানজনক নহে, বরং ইহা জনসাধারণ্যে গৃহীত হইলে গ্রন্থকার ফরাসী একাডেমীর সদস্যপদ কিংবা অন্ততপক্ষে Croix D'honnenr লাভের যোগ্য হয়।

সরকার এই সকল নির্লজ্জতা ও কাম প্ররোচনা নীরবে উপক্ষো করিয়া থাকে। যদি কখনো চরম লজ্জাকর কিছু প্রকাশিত হয়, তবে পুলিশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরাধীকে চালান দেয়। তদুপরি মহানুভব বিচারালয় রহিয়াছে। তথাকার ন্যায়বিচারের আসন হইতে অপরাধকে মাত্র সাবধান করিয়া ছাড়িয়া

দেওয়া হয়। কারণ বিচারালয়ের আসন যাহারা অলংকৃত করিয়া থাকে, তাহারাও এবম্বিধ সাহিত্য হইতে রসাস্বাদন করিয়া থাকে। কোন কোন বিচারকের লেখনী আবার অশ্লীল যৌন সাহিত্য প্রণয়নে লিপ্ত থাকে। যদি কখনো ঘটনাক্রমে কোন বিচারক প্রাচীনপন্থী প্রতিপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারা কোন অনুচিত রায় দানের আশংকা হয়, তাহা হইলে বড় বড় সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা লেখক সম্মিলিতভাবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে এবং সংবাদপত্রে এই বলিয়া ইহার তীব্র সমালোচনা করা হয় যে, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য স্বাধীন ক্ষেত্রের প্রয়োজন আছে। অন্ধ যুগের মনোভাব দ্বারা নৈতিক বন্ধন প্রয়োগ করার অর্থ রসবিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করা। এই রস-বিজ্ঞানের উন্নতি কি কি উপায়ে হয়? নগ্নচিত্র ও চলচ্চিত্র এই ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী হয়। ইহার লক্ষ লক্ষএলবাম তৈরী কলিয়া উহাকে শুধু বাজার, হোটেল ও চা-খানায়ই রাখা হয় না, স্কুল কলেজেও এ সবের বহুল প্রচার করা হয়। অশ্লীলতা বিরোধী সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে এমিল পুরেসি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেনঃ

> এই সকল অশুচি ইতর তৈলচিত্রগুলি মানবীয় ইন্দ্রিয়নিচয়ে একটা উত্তেজনা ও পরম তৃষ্ণার সঞ্চার করে। ইহা হতভাগ্য ক্রেতাদিগকে এমন পাপকার্যে উদ্বুদ্ধ করে যে, তাহা চিন্তা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বালক-বালিকাদের উপর ইহার সর্বনাশা প্রভাব বর্ণনাতীত। নৈতিক ও শারীরিক দিক দিয়া বহু স্কুল-কলেজ এইসবের জন্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া বালিকাদের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর আর কিছুই হইতে পারে না।

নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ, সংগীতালয় ও কফিখানায় চিত্তবিনোদনের দ্বারা এই রস-বিজ্ঞানের চর্চা করা হয়। যে সকল নাট্যাভিনয় ফরাসী সমাজের অভিজাতশ্রেণী আনন্দ সহকারে দর্শন করে এবং যে নাট্যকার ও কৃতি অভিনেত্রীদের উপর প্রশংসাসূচক করতালিসহ পুষ্প বর্ষণ করা হয় তাহার প্রতিটিই কামোন্মাদনাপূর্ন হয়। বৈশিষ্ট্যি এই যে, নৈতিকতার দিক দিয়া যে চরিত্রটি অত্যন্ত জঘন্য হয়, তাহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চাংগের আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। পলব্যুরোর ভাষায়ঃ

ত্রিশ–চল্লিশ বৎসর হইতে আমাদের নাট্যকারগণ জীবনের যে চিত্র পরিস্ফুট করিতেছে, তাহা দর্শন করিয়া যদি কেহ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা করিতে চায়, তাহা হইলে সে এতটুকু হৃদয়ংগম করিতে পারিবে যে, আমাদের সমাজে যত বিবাহিত দম্পতি আছে, তাহারা সকলেই কৃতঘ্ন এবং দাম্পত্য জীবনে একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসী। হয়ত স্বামী নির্বোধ কিংবা তাহার স্ত্রী পরম শত্রু। স্ত্রীর যদি কোন মহৎ গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহা এই যে, সর্বদা স্বামীর প্রতি বিরাগভাজন হইবে এবং অন্যত্র প্রেম নিবেদনের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়ের যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের নাট্যশালা ও চিত্তবিনোদনের স্থানগুলির কি স্বরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যৌন ক্রীড়ামোদিগণ যে ভাষা, কমনীয় ভংগী ও নগ্নতার আনন্দ উপভোগ করে, তাহা নির্লজ্জভাবে রংগমঞ্চে অভিনীত হয়। পূর্বাহ্নে জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের যৌনতৃষ্ণা মিটাইবার সকল উপাদান পাওয়া যাইবে। আরও বলা হয়ঃ আমাদের রংগমঞ্চ লৌকিকতা বর্জিত ও স্বভাবসংগত (Realistic)।

এমিল পুরেসি তাঁহার রিপোর্টে বহু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন চিত্তবিনোদনের স্থানগুলিতে গমন করত এই সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহা বুঝাইবার জন্য তিনি নামের পরিবর্তে অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন।

ব. 'এখানে অভিনেত্রীদের গীত. স্বগতোক্তি (Monologues) এবং অংগ–ভংগিমা চরম অশ্লীলতাপূর্ণ ছিল। পটের উপর যে দৃশ্য উন্মোচন করা হইয়াছিল, তাহা যৌন সন্মিলনে শেষ পর্যায়ে উপনীত হইতে হইতে রহিয়া গেল। সহস্রাধিক দর্শক তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিল। সকলে তন্ময় হইয়া প্রশংসাসূচক ধ্বনি করিতেছিল।'

ন. 'এখানে সংক্ষিপ্ত গীত ও তাহার মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত কথন, অংগ–ভংগিমা এবং নীরবতা নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণগণও পিতামাতার সহিত বসিয়া এই রংগ–রস উপভোগ করিতেছিল এবং প্রত্যেক বালক অশ্লীল অভিনয় দর্শনে পূর্ণোদ্যমে করতালি দিতেছিল।'

ল. 'এখানে দর্শকবৃন্দ পাঁচবার কোলাহল করিয়া অভিনেত্রীকে পুনঃপুনঃ এমন একটি অভিনয়ের জন্য বাধ্য করিল যে, তাহার অভিনয় চরম অশ্লীল গীত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল।'

র. 'এখানে দর্শকবৃন্দ একজন অভিনেত্রীকে পুনঃ পুনঃ একটি অতীব অশ্লীল অভিনয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল।'

অবশেষে সেই অভিনেত্রী বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিল, "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ? দেখিতেছ না যে, এখানে কতকগুলি শিশুও আছে?" এই বলিয়া সে অভিনয় সমাপ্ত না করিয়াই চলিয়া গেল। ইহা এমন অশ্লীল ছিল যে, অত্যন্ত পাপীয়সীও ইহার পুনরাভিনয় সহ্য করিতে পারিত না।'

জ.'অভিনয় শেষে অভিনেত্রীদের লটারী করা হইল। তাহারা এক একটি টিকেট দশ শান্তিম মূল্যে (এক শান্তিম প্রায় দুই আনার সমতুল্য) বিক্রয় করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির ভাগ্যে যে অভিনেত্রীর নাম উঠিল, সে-ই রাত্রির জন্য তাহার হইল।'

পল ব্যুরো বলেন যে, অধিকাংশ সময়ে রংগমঞ্চে এমন নারীকে আনয়ন করা হয়, যাহার দেহে বস্ত্রের লেশ মাত্র থাকে না। অ্যাডলফ বায়াসন (Adlophe Biason) একবার ফরাসীর বিখ্যাত সংবাদপত্র 'তানে' (Tamps) এই সকল বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া লেখেন, এখন মঞ্চোপরি শুধু যৌনক্রিয়া সম্পাদনই অবশিষ্ট রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তখনই আর্টের পরিপূর্ণতা লাভ হইবে।'

গর্ভনিরোধ আন্দোলন ও যৌনবিজ্ঞানের তথাকথিত জ্ঞানগর্ভ ও ভৈষজ্যশাস্ত্র সম্পৃক্ত সাহিত্যাবলী নির্লজ্জতা প্রচার এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। জনসভায় বক্তৃতা, ভৌতিক আলোকচিত্র ও পুস্তকাদিতে চিত্র ও তাহার বিশ্লেষণের দ্বারা গর্ভ, তৎসম্পর্কিত বিষয়াদি এবং গর্ভনিরোধের সরঞ্জামাদির ব্যবহার বিধির এমন বিশ্লেষণ করা হয় যে, তাহার পর আর কোন কিছু প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ যৌনবিজ্ঞানের পুস্তকাদিতে শরীর বিশ্লেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া যৌন-ক্রিয়ার কোনদিকই অপ্রকাশ রাখা হয় না। বাহ্যত এই সকল

বিষয়ের উপরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবরণ দেওয়া হইয়াছে, যেন ইহার প্রতিবাদের কোন পথ না থাকে। উপরন্তু ইহার এতখানি উন্নতি হইয়াছে যে, ইহাকে সমাজসেবা নামে অভিহিত করা হয়। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, তাহারা যৌনক্রিয়া সম্পর্কে অপরকে ভুলভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই সমস্ত সাহিত্য ও শিক্ষা প্রচার দ্বারা নারী-পুরুষ ও অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জঘন্য নির্লজ্জতার সৃষ্টি করা হয়। এই সবের কৃপায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা কচি বালিকা পাঠাগারে বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিয়া যৌন সম্পর্কিত এমন জ্ঞান লাভ করে, যাহা বিবাহিতা নারিগণও করিতে পারে না। কচি বালকদেরও এই একই অবস্থা। অসময়ে ইহাদের যৌন প্রবণতা সজাগ হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের মনে যৌনমৈথুন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আগ্রহ জন্মে। পূর্ণ যৌবন লাভ করিবার পূর্বেই তাহারা কাম প্রবৃত্তির নখর কবলিত হইয়া পড়ে। বিবাহের জন্য তো বয়সের সীমা নির্ধারিত আছে, কিন্তু যৌনক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত করা নাই। কাজেই বার-তের বৎসর হইতেই এই সকল কার্য চলিতে থাকে।

জাতীয় অধপতনের পূর্বাভাস

যেখানে পবিত্রহীনতা, প্রবৃত্তি পূজা ও দৈহিক ভোগ-সম্ভোগের দাসত্ব চরমে উপনীত হয়, যেখানে নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই ভোগবিলাসে লিপ্ত হয় এবং যেখানে উন্মাদনার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মানুষকে তাহার আয়ত্তের বাহিরে লইয়া যায়, সেখানে জাতীয় অধপতনের যাবতীয় কারণ প্রকাশিত হওয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ এই প্রকার ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে উচ্চ শিখরে দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করে যে, তাহাদের ভোগবিলাস উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে বরং সহায়ক। তাহারা অধিকন্তু বলিয়া থাকে যে, কোন জাতির চরম উন্নতি একমাত্র তখনই হয় যখন সে ভোগবিলাসের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত একেবারেই ভ্রান্ত। যেখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসের শক্তিগুলি মিলিতভাবে কার্য করে এবং সামগ্রিকভাবে গঠনমূলক কার্যাবলিই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে বিধ্বংসী শক্তিগুলিকেও সৃষ্টির কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যাহার জ্ঞানবুদ্ধি বিকল হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোন সতর্ক ব্যবসায়ী জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অজস্র অর্থ উপার্জন করে এবং তৎসহ মদ্য পান, জুয়া এবং ভোগ বিলাসেও লিপ্ত হয় এ মেতাবস্থায় তাহার জীবনের উভয় দিককেই যদি স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রথমোক্ত গুণাবলীর সমষ্টিই তাহার উন্নতির কারণ এবং শেষোক্ত দোষগুলির সমষ্টি তাহার ধ্বংস সাধনে লাগিয়া থাকে। প্রথমোক্ত গুণাবলীর শক্তিতে অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ ইহা নহে যে, ধ্বংসকারী শক্তিগুলি তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এইসব ধ্বংসকারী শক্তি তাহার মস্তিষ্ক ও শরীরের শক্তি ক্রমাগত ভক্ষণ করিয়াই চলিয়াছে। তাহার শ্রমোপার্জিত অর্থ লুন্ঠন করিতেছে। এই শক্তিগুলি তাহাকে ধ্বংস করিবার সংগে সংগে সর্বদা এমন সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে যে, একটি সিদ্ধান্তকারী আক্রমণের দ্বারা প্রথম আঘাতেই তাহাকে শেষ করিয়া দিবে। জুয়ার শয়তান এক অশুভ মুহূর্তে তাহার সমগ্র জীবনের উপার্জিত অর্থ নিমেষেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারে এবং সে সেই মুহূর্তেরই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। মদ্য পানের শয়তান সময় মত তাহার সংজ্ঞাহীনতার সুযোগে তাহার দ্বারা এমন এক মারাত্মক ভুল করাইতে পারে, যাহার ফলে সে মুহূর্তের মধ্যে দেউলিয়া হইতে পারে। সেও সেই সুযোগের সন্ধানে আছে। দুষ্কৃতির শয়তানও সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আছে, যখন সে তাহাকে হত্যা, আত্মহত্যা অথবা হঠাৎ ধ্বংসের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দিতে পারে। ধারণাই করা যাইতে পারা যায় না যে, যদি সেই ব্যক্তি এই শয়তানগুলির কবলে না পড়িত, তাহা হইলে তাহার উন্নতির কী অবস্থা হইত।

একটি জাতির বেলায়ও এই একই অবস্থা। সে গঠনমূখী শক্তি বলে উন্নতি সাধন করে। কিন্তু সঠিক পরিচালনা শক্তির অভাবে উন্নতির পথে কয়েক ধাপ অগ্রসর হইবার পর স্বীয় ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করিতে থাকে। কিছুকাল পর্যন্ত সৃষ্টিমুলক শক্তিগুলি তাহাকে সম্মুখের দিকে পরিচালিত করিতে থাকে। কিন্তু সংগে সংগে ধ্বংসকারী শক্তিগুলি তাহার জীবনী-শক্তি ঘূণের ন্যায় ভিতর হইতে ভক্ষণ করিতে থাকে। অবশেষে এমন শূন্যগর্ভ করিয়া ফেলে যে, হঠাৎ একটি আঘাতেই তাহার গৌরব সৌধ ধুলিসাৎ করিয়া দেয়। ফরাসী জাতির

ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা তাহাদের জন্য যে ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট বিরাট কারণগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

শারীরিক শক্তি নাশ

যৌন কামনার একচ্ছত্র শাসনের প্রাথমিক কুফল এই হইয়াছিল যে, ফরাসী দেশবাসীর শারীরিক শক্তি ক্রমশ লোপ পাইতে লাগিল। কামনার দাসত্ব তাহাদের মধ্যে সংযম ও ধৈর্য শক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। রতিজ দুষ্ট ব্যাধির আধিক্য তাহাদের স্বাস্থ্যের উপর সর্বনাশা ক্রিয়া করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর পর পর নূতন ভাবে সৈন্য সংগ্রহের (New Recruits) জন্য শারীরিক যোগ্যতার মান কমাইয়া দিতে হয়। কারণ প্রথমে যোগ্যতার যে মান নির্ণীত ছিল, সেই মানের অতি অল্প সংখ্যক যুবকই পরবর্তী সময়ে পাওয়া যাইত। ইহা একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্র, যাহা তাপ নির্ণয় যন্ত্রের (Thermometre) ন্যায় প্রায়ই নিশ্চয়তার সহিত বলিয়া দেয় যে, ফরাসী জাতির শারীরিক শক্তি ক্রমশ কত দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে! এই অধপতনের কারণগুলির মধ্যে রতিজ দুষ্ট ব্যাধি একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর যে সমস্ত সৈনিককে সিফিলিস ব্যাধির জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তাহাদের সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর হাজার। মাত্র একটি মধ্যম শ্রেণীর সামরিক ছাউনিতে একই সময়ে ২৪২ জন্য সৈনিক এই রোগে আক্রান্ত হয়। একদিকে সেই সংকটসংকুল অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন, যখন ফরাসী জাতি জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান ছিল, গোটা জাতির অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি সৈনিকের প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, একটি ফ্রাংক অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। সময়, শক্তি, যাবতীয় উপায়উপাদান ও প্রত্যেক বস্তু অত্যধিক পরিমাণে দেশরক্ষার কাজে ব্যয়িত হওয়ার প্রয়োজন ছিল; অন্য দিকে এই জাতির যুবকদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহাদের মধ্যে হাজার হাজার যুবক যৌন বিলাসের কারণে শুধু দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজের অযোগ্যই হইয়া পড়িল না বরং এই সংকট মুহূর্তে জাতির অর্থ ও উপায়উপাদান চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিল।

একজন ফরাসী বিশেষজ্ঞ ডাঃ ল্যারেড (Dr. Laredde) বলেন যে, ফ্রান্সে প্রতি বৎসর শুধু সিফিলিস এবং তজ্জনিত ব্যাধিতে ত্রিশ হাজার লোক

প্রাণত্যাগ করে। জ্বর রোগের পর ইহাই মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ। একটি রতিজ ব্যাধির এই অবস্থা! ইহা ব্যতীত এ ধরনের আরও অনেক ব্যাধি আছে।

পারিবারিক শৃংখলার বিলোপ সাধন

এই বল্গাহীন যৌন উন্মাদনা ও লাম্পট্যপ্রিয়তার সার্বজনীন প্রচলন ফরাসী সভ্যতার যে দ্বিতীয় বিরাট আপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহা হইল পারিবারিক শৃংখলা বিলোপ সাধন। নারী–পুরুষের যে স্থায়ী ও সুদৃঢ় সম্পর্কের দ্বারা পারিবারিক শৃংখলা স্থাপিত হয়, তাহার নাম বিবাহ। এই সম্পর্কের দ্বারাই মানব জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি, স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব স্থাপিত হয়। এই বস্তুই তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক জীবনে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। ইহাই বিশৃংখলতার অভিসম্পাতকে দমন করিতে তাহাদিগকে সভ্যতার দাস বানাইয়া দেয়। এই শৃংখলার সীমারেখার মধ্যে প্রেম, শান্তি এবং ত্যাগের এমন শান্ত ও সুমহান আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, যাহাতে নূতন বংশধর সঠিক চরিত্র, নির্ভুল শিক্ষা ও নির্মল চরিত্র গঠনের সংগে প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে নারী–পুরুষের অন্তর হইতে বিবাহ ও তাহার মহান উদ্দেশ্যের ধারণা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে, যেখানে কামরিপু চরিতার্থ করা ব্যতীত যৌন সম্পর্কের অপর কোন উদ্দেশ্যই মনে স্থান পায় না এবং যেখানে কামপিপাসু ও কামপিপাসিনীর দল ভ্রমরের ন্যায় পুষ্পে পুষ্পে মধু পান করিয়া বেড়ায়, সেখানে এই শৃংখলা স্থাপিত হইতে পারে না এবং থাকিতে পারে না। যেখানে নারী–পুরুষের এই যোগ্যতাই থাকে যে, তাহারা দাম্পত্য জীবনের গুরু দায়িত্ব, তাহার অধিকার, কর্তব্য ও নৈতিক নিয়মনীতির গুরুভার বহন করিবে, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক অবস্থার ফল এই হয় যে, প্রত্যেক বংশধরের শিক্ষা পূর্বতন বংশ হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে। লোকের মধ্যে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া যায় যে, সভ্যতার বন্ধন ছিন্ন হইতে থাকে। লোকের মধ্যে রূপ পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতস্ততকরণ এত বাড়িয়া যায় যে, জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন স্থিরতা বিদ্যমান থাকে না। পারিবারিক শান্তি না থাকার কারণে তাহাদের জীবন তিক্ত হইতে তিক্ততর হইতে থাকে এবং একটি চিরন্তন দুর্ভাবনা তাহাদিগকে মুহূর্তের জন্যও শান্তি দান করিতে পারে না। ইহাই ইহলৌকিক জাহান্নাম, যাহা লোকে নির্বুদ্ধিতাসুলভ ভোগলালসার উন্মাদনায় ক্রয় করিয়া লয়।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর হাজারে সাতআটজন নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই অনুপাত এত নগণ্য যে, ইহার দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়, ফরাসী অধিবাসীদের কেমন এক বিরাট অংশ অবিবাহিত রহিয়া যায়।

আবার যে নগণ্য সংখ্যক লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প এমন পাওয়া যায়, যাহারা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। এই একটি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যও তো তাহাদের থাকে। এমন কি যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করত তাহার সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করা জনসমাজে প্রচলিত এক কাম্য বস্তু ছিল। পল ব্যুরো বলেনঃ

> ফ্রান্সের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল যে, বিবাহের পূর্বে বিবাহেচ্ছু নারী তাহার ভাবী স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, সে তাহার অবৈধ সন্তানকে নিজের বৈধ সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সীনের (Siane) দেওয়ানী আদালতে জনৈকা নারী নিম্নোক্ত বিবৃতি দান করেঃ

> আমি বিবাহের পূর্বেই আমার স্বামীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, আমার বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, অবিবাহিতা অবস্থায় আমি যে সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম, তাহাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, আমি তাহার সঙ্গে আর স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিব কি না। এইরূপ ইচ্ছা আমার তখনও ছিল না এবং এখনও নাই। এইজন্যই যেদিন আমাদের বিবাহ হয় সেইদিনই সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় আমি আমার স্বামীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করি। আজ পর্যন্ত আর তাহার সঙ্গে মিলিত হই নাই। কারণ দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনের কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। *–পল ব্যুরোর পূর্ব বর্ণিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৫*

প্যারিসের একটি বিশিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ পল ব্যুরোর নিকট এই বলিয়া মন্তব্য করেন যে, সাধারণত নব্য যুবকদের বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য আপন গৃহেও একটি রক্ষিতার সেবা গ্রহণ করা। দশ বার বৎসর তাহারা চতুর্দিকে

স্বাধীনভাবে রসাস্বাদন করিয়া বেড়ায়। তারপর এমন এক সময় আসে, যখন তাহারা এইরূপ উচ্ছৃংখলতা ও লাম্পট্যে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া একটি নারীকে বিবাহ করিয়া বসে, যেন গৃহের শান্তিও কিয়দংশ লাভ করা যায় এবং স্বাধীন আনন্দ সুখবিলাসীর ন্যায় আনন্দ সম্ভোগও করিতে পারে।

–উক্ত গ্রন্থ দ্র.

ফ্রান্সে বিবাহিত লোকের ব্যভিচার করা মোটেই দূষণীয় এবং নিন্দার্হ নহে। কেহ স্ত্রী ব্যতীত গৃহে কোন রক্ষিতা রাখিলে তাহা গোপন রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সমাজও ইহাকে এক সাধারণ সম্ভাব্য বিষয় মনে করে।

–উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬–৭৭

এইরূপ অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, কথায় কথায় তাহা ছিন্ন হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই সকল হতভাগ্যের দাম্পত্য জীবন কয়েক ঘন্টার বেশী টিকিয়া থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সের এক সম্মানিত ব্যক্তি যিনি কয়েকবার মন্ত্রীত্বের আসনও অলংকৃত করিয়াছেন, তিনি বিবাহের মাত্র পাঁচ ঘন্টা পরে আপন স্ত্রীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। এমন সব তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যপারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে যে, তাহা শ্রবণ করিলে হাসি পায়। যেমন স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কেহ শয়নকালে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকিলে অথবা একে অপরের কুকুরকে ভাল না বাসিলে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সীনের দেওয়ানী আদালতে একবার একই দিবসে দুই শত চুরানব্বইটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিবাহের নূতন আইন পাশ হয়, তখন চারি সহস্র তালাক সম্পাদিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা সাড়ে সাত সহস্রে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ষোল সহস্রে ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একুশ সহস্রে পৌছে।

বংশ হত্যা

সন্তান প্রতিপালন একটি উন্নত ধরনের নৈতিক কার্য। যাহার জন্য প্রয়োজন হয় প্রবৃত্তির সংযম, লালসাবাসনার জলাঞ্জলী, দুঃখকষ্ট ও শ্রম স্বীকার এবং ধন প্রাণের উৎসর্গীকরণ। স্বার্থপর ও প্রবৃত্তির দাস যাহারা, তাহারা এই মহান

কার্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত নহে। কারণ একাকীত্ব বা সংশ্রবহীনতা ও পশুত্ব তাহাদিগকে পাইয়া বসে।

প্রায় শতাব্দীকাল হইতে ফরাসী দেশে গর্ভনিরোধ আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। এই আন্দোলনের ফলে ফরাসী দেশের প্রত্যেক নরনারী এমন কৌশল শিক্ষা করিয়াছে যদ্দারা তাহারা মদানন্দ উপভোগ করিয়াও তাহার স্বাভাবিক পরিণতি গর্ভসঞ্চার, সন্তান প্রসব ও বংশ বৃদ্ধি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এমন কোন নগর, উপনগর বা গ্রাম নাই, যেখানে গর্ভনিরোধের ঔষধাবলী ও সরঞ্জামাদি প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হয় না। ফলে এই সবের ব্যবহার শুধু উচ্ছৃংখল যৌনামোদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং বিবাহিত নরনারীও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে এবং ইহাই কামনা করে যে, সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া যেন তাহাদের সুখ সম্ভোগে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। ফরাসী দেশের জন্মহার যে পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন যে, গর্ভনিরোধের এই ব্যাপক মহামারী প্রতি বৎসর অন্ততপক্ষে ছয় লক্ষ সন্তানের জন্ম গ্রহণে বাধা দান করে। এই সকল কৌশল সত্ত্বেও যে সকল গর্ভসঞ্চার হয়, গর্ভনিপাত করিয়া তাহা নষ্ট করা হয়। এইরূপে আরও তিন চারি লক্ষ মানব সন্তানের পৃথিবীতে আগমন বন্ধ হইয়া যায়। গর্ভনিপাত শুধু অবিবাহিতা নারীই করে না, বরং বিবাহিতা নারীও এই ব্যাপারে তাহাদের সমতুল্য। নৈতিকতার দিক দিয়া এই কার্যকে সমালোচনার উর্ধ্বে এবং নারীর অধিকার মনে করা হয়। মনে হয় দেশের আইন এই বিষয়ে চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে। যদিও আইন গ্রন্থে ইহা এখনও অপরাধজনক বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে, তথাপিও ব্যাপার এই যে, তিন শত জনের মধ্যে কোনক্রমে একজনকে এই অপরাধে চালান দেওয়া হয়। যাহাদের চালান দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যেও শতকরা পঁচাত্তর জন কোর্ট হইতে মুক্তি লাভ করে। গর্ভনিপাতের ডাক্তারী কৌশল এত সহজ ও সর্বজনপরিচিত যে, অধিকাংশ নারী নিজেই গর্ভনিপাত করিতে পারে। যাহারা ইহা করিতে পারে না, তাহাদের ডাক্তারের সাহায্য লাভে বেগ পাইতে হয় না। ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভস্থ সন্তান হত্যা করা তাহাদের নিকটে যন্ত্রণাদায়ক দন্ত উৎপাটনের ন্যায় এক সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ মানসিকতা মাতৃ-প্রকৃতিকে করিয়া দিয়াছে যে, যাহার প্রেম ও স্নেহ-বাৎসল্যকে জগতে চিরকালেই পরম ও চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে সেই মাতা স্বীয় সন্তানাদির প্রতি শুধু বিরাগভাজন ও বিষন্নই নহে, বরং তাহাদের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। গর্ভনিরোধ নিপাতের নিষ্ফল চেষ্টার পরও যে সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের প্রতি নির্মম আচরণ করা হয়। পল ব্যুরো এই বেদনাদায়ক তথ্যটি নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেনঃ

> প্রতিদিন সংবাদ-পত্রাদিতে ঐ সকল সন্তানের দুর্দশা প্রকাশিত হয়, যাহাদের প্রতি তাহাদের মাতাপিতা নির্মম অমানুষিক আচরণ করিয়াছে। সংবাদপত্রেও কেবল অসাধারণ ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয়, কিন্তু লোকে ইহা ভালভাবেই জানে যে, সাধারণত এই সকল হতভাগ্য অনভিপ্রেত অতিথির প্রতি তাহাদের পিতামাতা কিরূপ নির্মম ব্যবহার করে। তাহাদের জনক-জননী তাহাদের প্রতি এইজন্য বিষন্ন ও উদাসীন যে, এই হতভাগ্যের দল তাহাদের জীবনের সুখ-সম্ভোগ একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সাহসিকতার স্বল্পতা অনেকক্ষেত্রে গর্ভনিপাতে বাধা দান করে এবং এই সুযোগে নিরপরাধ শিশু জগতের বুকে পদার্পণ করে। কিন্তু তাহার আগমনের পরেই তাহাকে পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়।
>
> —উক্ত গ্রন্থ, পৃ.৭৪

সন্তানের প্রতি এতোদৃশ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা এমন চরমে পৌছিয়াছে যে, একদা একটি নারীর ছয় মাসের শিশুর মৃত্যু হইলে সে তাহার মৃত সন্তানের শবদেহ সম্মুখে রাখিয়া নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করিল এবং প্রতিবেশীদের সম্মুখে বলিতে লাগিলঃ

> এখন আমরা দ্বিতীয় সন্তান হইতে দিব না। এই সন্তানটির মৃত্যুতে আমি ও আমার স্বামী পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখ তো, সন্তান কোন্ বস্তু? সে সর্বদা ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া কাঁদে, নোংরামি সৃষ্টি করে এবং ইহা হইতে কি বাঁচিবার উপায় আছে?
>
> —উক্ত গ্রন্থ, পৃ.৭৫

ইহা অপেক্ষা অধিকতর বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, প্রসূত হত্যা এক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করিতেছে। ফরাসী সরকার ও তথাকার বিচারালয়গুলি গর্ভনিপাতের ন্যায় এই মারাত্মক অপরাধকেউ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'Loir' আদালতে দুইজন নারীকে শিশু হত্যার অপরাধে হাযির করা হয় এবং উভয়কেই পরে মুক্তি দেওয়া হয়। তাহাদের একজন তাহার শিশু সন্তানকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তাহার প্রথম সন্তান এক আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে এবং সে দ্বিতীয় সন্তান প্রতিপালনেরও ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু মাতা সিদ্ধান্ত করে যে, এমন শত্রুর সে নিপাত করিয়াই ছাড়িবে। আদালতে তাহার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য বলিযা বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় নারী তাহার সন্তানকে প্রথমত গলা টিপিয়া মারে। ইহাতে তাহার জীবনবায়ু একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই মনে করিয়া সে তাহাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করিয়া মস্তক চূর্ণ করিয়া দেয়। জজ ও জুরীদের মতে সে মৃত্যুদন্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই বৎসরেই সীনের আদালতে একটি নর্তকীকে অনুরূপ অপরাধের জন্য হাযির করা হয়। সে তাহার সন্তানের জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে অতপর তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া এবং গলা কাটিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা করে। এই নারীকেও নিরপরাধ বলিয়া জজ ও জুরিগণ রায় দান করে।

যে জাতি স্বীয় বংশধরের শত্রুতা সাধনে এমন চরমে উপনীত হইতে পারে, পৃথিবীর কোন সুব্যবস্থাই তাহাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। নতুন বংশধরের জন্মলাভ একটি জাতির স্থিতিপরম্পরা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনিবার্য। যে জাতি আপন বংশধরের শত্রু হয়, সে প্রকৃপক্ষে নিজেরই শত্রু হইয়া পড়ে। সে আত্মহত্যা করিতে থাকে এবং তাহার কোন বহিশত্রু না থাকিলেও সে নিজেই নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিতে থাকে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বিগত ষাট বৎসর হইতে ফরাসীর জন্মহার ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। কোন বৎসর মৃত্যুহার জন্মহারকে অতিক্রম করে। কোন কোন বৎসর উভয়ই সমান থাকে। আবার কোন সময়ে জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অতি কষ্টে হাজারকরা একজনের অনুপাতে বাড়িয়া যায়। অপর দিকে ফরাসী দেশে বিজাতীয় বহিরাগতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের মোট চারি কোটি আঠার লক্ষ

অধিবাসীর মধ্যে আটাশ লক্ষ নববই হাজার বহিরাগত বিজাতীয় ছিল। এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী জাতি যে স্বীয় মাতৃভূমিতেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

ইহাই ঐ সকল মতবাদ ও দৃষ্টিভংগীর পরিণাম ফল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে নারী অধিকারের আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল।

আরও কতিপয় উদাহরণ

আমরা শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই ফরাসী দেশের মতবাদ এবং তথাকার পরিণাম ফল বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু এই ব্যাপারে ফরাসী দেশকেই একমাত্র দায়ী মনে করিলে অন্যায় করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত দেশ তথাকথিত মতবাদ ও সামাজিকতার পূর্ববর্ণিত সামঞ্জস্যহীন নীতিসমূহ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা প্রায়ই অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ব্যবস্থা ষোলকলায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার কথাই ধরা যাউক।

তরুণদের উপর পারিপার্শ্বিক যৌন প্রভাব

বিখ্যাত জর্জ বেনলিন্ডসে [Ben Lindsey] একদা ডেনভারস্থ তরুণদের অপরাধের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের সভাপতি [Chairman of the Juvenile Court of Donver] ছিলেন। এই কারণে আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের নৈতিক অবস্থা তাঁহার ভালভাবে জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার Revolt of Modern Youth' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার বালক-বালিকাগণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সাবালক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অতি অল্প বয়সেই ইহাদের মধ্যে যৌনপ্রবণতার উন্মেষ হয়। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ তিন শত বারজন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারেন যে, তাহাদের মধ্যে দুই শত পঞ্চাশ জন এগার হইতে তের বৎসর বয়সেই সাবালিকা হইয়াছে এবং তাহাদের এমন যৌন তৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা যায়, যাহা আঠার বৎসর বয়স্কা বালিকার মধ্যে হওয়া সম্ভব নহে।

–উক্ত গ্রন্থ, পৃ.৮২-৮৬

ডাঃ এডিথ হুকার [Edith Hooker] তাহার ' Laws of Sex' নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

বিশিষ্ট ভদ্র ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা এক অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বৎসরের বালিকা সমবয়স্ক বালকদের সহিত প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময়ে যৌনক্রিয়াও করিয়া থাকে।

তিনি আরও বলেনঃ

কোন বংশের উজ্জ্বল রত্ন সাত বৎসরের একটি বালিকা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় বন্ধুর সংগে সম্মিলিত হয়। আর একটি ঘটনা এই যে, দুইটি বালিকা ও তিনটি বালকের একটি দলকে পারস্পরিক যৌনকার্যে লিপ্ত দেখা যায়। তাহারা অন্য সমবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকেও উক্ত কার্যের জন্য প্ররোচনা দেয়। এই দলের মধ্যে দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাটিই সকলের বড় ছিল। কিন্তু তথাপিও সে বিভিন্ন প্রেমিকের প্রেম নিবেদন লাভ করিবার গৌরব অর্জন করে। —উক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩২৮

বালটিমোরের জনৈক ডাক্তারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সেই শহরে বার বৎসরের কম বয়সের বালিকার সহিত যৌনকার্য করার অভিযোগে এক বৎসরে সহস্রাধিক মামলা দায়ের করা হয়। —উক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৭৭

কামরিপু জাগ্রত করিবার যাবতীয় উপায় উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশের ইহাই প্রাথমিক পরিণাম ফল। আমেরিকার জনৈক গ্রন্থকার বলেনঃ

আমাদের অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ যে অবস্থায় কালাতিপাত করে, তাহা এত অস্বাভাবিক যে, দশ পনর বৎসর বয়সেই বালক-বালিকাদের মধ্যে একে অপরের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইবার মনোভাব জাগ্রত হয়। এইরূপ অকাল যৌনস্পৃহার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ হওয়াই স্বভাবিক। অন্ততপক্ষে ইহার পরিণাম ফল এই হয় যে, অল্পবয়স্কা তরুণিগণ বন্ধুদের সহিত গৃহ হইতে পলায়ন করে অথবা অল্প বয়সেই বিবাহিতা হয়। কিন্তু প্রেমের খেলায় যদি তাহারা অকৃতকার্য হয় তবে আত্মহত্যা করিয়া বসে।

বিদ্যালয়ে যৌন চর্চা

এইভাবে যে সমস্ত বালক–বালিকার মধ্যে অসময়ে যৌন প্রবণতা জাগ্রত হয়, তাহাদের প্রথম পরীক্ষাক্ষেত্র হয় বিদ্যালয়সমূহ। বিদ্যালয়গুলি দুই প্রকার হয়। এক প্রকার বিদ্যালয়ে শুধু একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বালক–বালিকা উভয়েরই সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে সমলৈঙ্গিক মৈথুন [Homo Sexuality] ও হস্তমৈথুনের [Masturbation] সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিতেছে। কারণ শৈশবকালেই যে ধরনের আবেগ–অনুভূতিকে জাগ্রত করা হয় এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ যাহার পূর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য কোন না কোন পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ডাক্তার হুকার বলেন যে, এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে, কলেজে, নার্সদের ট্রেনিং স্কুলে, ধর্মীয় শিক্ষাগারসমূহে সর্বদাই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, একই লিংগের দুইজন পরস্পর যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়াছে এবং বিপরীত লিংগের প্রতি তাহার কোন আগ্রহই নাই। –উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৩১

এতদসম্পর্কে তিনি আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বালিকা বালিকার সহিত এবং বালক বালকের সহিত যৌনক্রিয়ায় সম্মিলিত হইয়া ভয়াবহ পরিনামের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমলৈঙ্গিক মৈথুন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কিরূপ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। Dr. Lowry তাহার 'Herselt' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একবার এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চল্লিশটি পরিবারের নিকট গোপন পত্র দ্বারা জানাইয়া দেন যে, তাহাদের সন্তানদিগকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে চরিত্রহীনতার এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

–উক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৭৯

এখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করিব যেখানে বালক–বালিকার সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যেমন বর্তমান আছে, তাহা চরিতার্থ করিবার উপায়ও তেমনিই বিদ্যমান রহিয়াছে। শৈশবে যে যৌনস্পৃহা ও প্রবনতার সঞ্চার হয়, এই ধরনের বিদ্যালয়ে আসিবার পর তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ ঘটে। বালক–বালিকারা অতি জঘন্য ও অশ্লীল সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে অভ্যস্ত হয়। প্রেমপূর্ণ

গল্প-উপন্যাস-নামমাত্র আর্টের পুস্তিকাসমূহ, যৌন সমস্যা সম্বলিত অশ্লীল গ্রন্থাদি এবং গর্ভনিরোধ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রবন্ধাদি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন প্রভাবে সর্বাপেক্ষা এক আকর্ষনীয় বস্তু হইয়া পড়ে। খ্যাতনামা মার্কিন গ্রন্থকার হিনড্রিচ ভন লোয়েন বলেন, আমেরিকার বিশ্বদ্যিালয়গুলিতে যে সকল সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা অধিক চাহিদা, তাহা সকল প্রকার অপবিত্রতা, অশুচিতা, অশ্লীলতা ও প্রগলভতার সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। জনসাধারণের মধ্যে এই প্রকার সাহিত্য আর কোনকালেও এত স্বাধীনভাবে প্রচারিত হয় নাই।

এই সকল সাহিত্য হইতে যে সব জ্ঞান লাভ হয়, যুবক-যুবতিগণ সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে আলোচনা করত প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী মিলিয়া পেটিং পার্টিস-এর জন্য বাহির হয় এবং তথায় স্বাধীনভাবে মদ্য ও সিগারেট পান এবং নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়া জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করে।[১] লিন্ডসে সাহেবের অনুমান এই যে, হাই স্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করিবার পূর্বেই চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

শিক্ষার পরবর্তী সোপানগুলিতে ইহার অনুপাত অনেক বেশী। লিন্ডসে সাহেব বলেন, হাই স্কুলের বালকগণ বালিকাদের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়া অনেক পশ্চাতে। সাধারণত বালিকাগণই কোন না কোন প্রকারে অগ্রগামিনী হয় এবং বালকগণ তাহাদের ইংগিতে নৃত্য করিতে থাকে।

তিনটি প্রধান প্ররোচক বিষয়

স্কুল-কলেজে তবুও এক প্রকারের নিয়ম শৃংখলা আছে, যাহার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের মেলামেলায় কিয়দংশে বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সকল নব্য যুবক-যুবতীর দল যখন যৌনক্ষুধার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও উচ্ছৃংখল স্বভাব লইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করত জীবনক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখন তাহাদের আলোড়ন-উপদ্রব যাবতীয় বাধা-বন্ধনকেই অতিক্রম করে। এখানে তাহাদের যৌন প্রবণতা উত্তেজিত করিবার এক পরিপূর্ণ বারুদখানা বিদ্যমান থাকে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করিবার উপায়-উপাদানও অনায়াসে লাভ করা যায়।

---

১. How I can get married, P. 172

যে সমস্ত কারণে আমেরিকায় চরিত্রহীনতার অসাধারণ প্রচার প্রসার চলিতেছে, তৎসম্পর্কে একটি মার্কিন পত্রিকা নিম্নোক্ত মন্তব্য করেঃ

তিনটি শয়তানী শক্তি আছে এবং তাহাদের ত্রিত্ববাদ আজ আমাদের এই ভূভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করত এক নরক সৃষ্টি করিয়াছে। এই তিনটি শক্তি হইতেছেঃ

১. অশ্লীল সাহিত্য, ইহা প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে আশ্চর্যজনক দ্রুততার সহিত নির্লজ্জতার ব্যাপক প্রচার করিয়া আসিতেছে।
২. চলচ্চিত্র; ইহা শুধু সকাম প্রেম-প্রবণতাকে প্ররোচিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বরং উহার বাস্তব শিক্ষা দান করে।
৩. নারীদের অধপতিত চারিত্রিক মান; তাহাদের বেশ-ভূষা, অধিকাংশ সময়ে নগ্নতা, সিগারেট পানের ক্রমবর্ধমান অভ্যাস এবং পুরুষদের সহিত অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি কারণে অপরিচিতের সহিতও তাহাদের যোগসূত্র প্রগাঢ় হয়।

এই তিনটি বস্তু আমাদের এখানে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার ফলে খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার অবনতি এবং শেষ পর্যন্ত বিলোপ সাধন অবশ্যম্ভাবী হইবে। যদি এখনও আমরা ইহার গতিরোধ করিতে না পারি, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তি পূজা ও যৌন উন্মত্ততা রোম এবং অন্যান্য জাতিকে তাহাদের মদ্য, নারী ও নৃত্যগীতসহ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে, আমাদের ইতিহাসও অনুরূপভাবে লিখিত হইবে।

যে সকল যুবক-যুবতীর মধ্যে কণামাত্র উষ্ণ শোণিত বিদ্যমান আছে, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকারী এই তিনটি শয়তানী শক্তি তাহাদের আবেগ-অনুভূতির মধ্যে চিরন্তন আলোড়ন সৃষ্টি করে। বস্তুত অশ্লীলতার আধিক্যই এইরূপ আলোড়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল।

অশ্লীলতার আধিক্য

আমেরিকায় যে সকল নারী বেশ্যাবৃত্তিকেই তাহাদের স্থায়ী জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় চার হইতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে।[১] কিন্তু

১. Prostitution in the U.S.A., P. 64-69

আমেরিকার বেশ্যাদিগকে এতদ্দেশীয় বেশ্যাদের অনুরূপ মনে করা চলিবে না। ইহারা বংশানুক্রমিক বেশ্যা নহে। আমেরিকার বেশ্যা এমন এক নারী, যে গতকল্য পর্যন্ত কোন স্বাধীন পেশা অবলম্বন করিয়াছিল, অসৎ সংসর্গে থাকিয়া চরিত্রভ্রষ্ট– হইয়াছে এবং বেশ্যালয়ের শরণাপন্ন হইয়াছে। সে এখানে কিছুকাল কাটাইবে। অতপর বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করত কোন অফিস বা কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করিবে। তথ্যনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, আমেরিকার বেশ্যাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহপরিচারিকাদের [ডোমেস্টিক সারভেন্ট] মধ্যে হইতে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। অবশিষ্ট পঞ্চাশজন, হাসপাতাল, অফিস ও দোকানের চাকুরী পরিত্যাগ করত বেশ্যালয়ে গমন করে। সাধারণত পনর–বিশ বৎসর বয়সে এই ব্যবসা আরম্ভ করা হয় এবং পঁচিশ–ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে পুনরায় বেশ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে। ২

আমেরিকার চার–পাঁচ লক্ষ বেশ্যার অস্তিত্বের মূলে কি তাৎপর্য রহিয়াছে, তাহা এই আলোচনা হইতে আনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বেশ্যাবৃত্তি একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকার নিউইয়র্কে, রিউ–ডি জেনিরো, বুয়েন্স আয়ার্স উক্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিশেষ। নিউইয়র্কের দুইটি বৃহৎ ব্যবসায় কেন্দ্রের প্রতিটির স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে, যাহার সভাপতি এবং সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়। প্রতিটির একজন করিয়া আইন উপদেষ্টা তাহাদের পক্ষে ওকালতি করে। যুবতী নারীদিগকে ফুসলাইয়া অপহরণ করিবার জন্য হাজার হাজার দালাল নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রতিটি স্থানে শিকারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল শিকারী কিরূপ দক্ষতাসম্পন্ন তাহা এই বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, শিকাগো আগমনকারী বাস্তুত্যাগী সংঘের সভাপতি একবার পনর মাসের আগমনকারীদের সংখ্যা গণনা করেন। তাহাতে জানা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে শিকাগো গমনেচ্ছু ৭, ২০০ জন বালিকার এই মর্মে পত্র পাওয়া যায় যে, তাহারা শিকাগো পৌঁছিতেছে। কিন্তু মাত্র ১,৭০০ জন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে। অবশিষ্ট বালিকাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

বেশ্যালয় ব্যতীতও তথায় বহু Assignation Houses ও Call Houses আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারী পরস্পর

সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উক্ত স্থানে তাহাদের জন্য যথারীতি সুব্যবস্থা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, একটি শহরেই ঐরূপ ৭৮টি গৃহ আছে। অপর দুইটি শহরে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩ টি অনুরূপ গৃহ আছে।[১]

এই সমস্ত গৃহে যে শুধু অবিবাহিত নরনারীই গমন করে তাহা নহে; অনেক বিবাহিত নরনারীও তথায় গমন করে। জনৈক বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক মন্তব্য করেন 'নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ চারিত্রিক ও দৈহিক দিক দিয়া দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব প্রতিপালন করে না। নিউইয়র্কে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।'[২]

আমেরিকায় নৈতিক সংস্কারকদের একটি সভা Committee of Fourteen নামে অভিহিত। এই সভার পক্ষ হইতে অসচ্চরিত্রের আড্ডাগুলির সন্ধান, দেশের নৈতিক অবস্থার তথ্যানুসন্ধান এবং নৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাবলম্বন ব্যাপকভাবে করা হয়। ইহার রিপোর্টগুলিতে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকায় যত নৃত্যশালা, নৈশ ক্লাব, সৌন্দর্যশালা [Beauty Saloons], হস্ত কমনীয়করণের দোকান [Manleure Shops] মালিশ কক্ষ [Massage Rooms] ও কেশবিন্যাসের দোকান [Hair Dressing Saloons] আছে তাহা প্রায়ই বেশ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এমন কি তাহা হইতে নিকৃষ্টতর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ সেখানে যে সকল কুকার্য করা হয় তাহা অবক্তব্য।

রতিজ দুষ্টব্যাধি

যৌন উচ্ছৃংখলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হইতেছে রতিজ দুষ্টব্যাধি। অনুমিত হইয়াছে যে, আমেরিকার শতকরা ৯০ জন অধিবাসী এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। Encyclopadia Britanica হইতে জানা গিয়াছে যে, তথাকার সরকারী ঔষধালয়গুলিতে প্রতি বৎসর গড়ে দুই লক্ষ সিফিলিস ও এক লক্ষ ষাট হাজার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। পঁয়ষট্টিটি ঔষধালয় শুধু উক্ত ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সরকারী ঔষধালয় অপেক্ষা বেসরকারী ডাক্তারের নিকটে রোগীর ভীড় বেশী হইয়া থাকে। এখানে

---

১. Prostitution in the U.S.A., P.38
২. Heself, P. 116

শতকরা ৬১ জন সিফিলিস (গর্মি ঘা) ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হয়।
–উক্ত গ্রন্থ, খন্ড ২৩, পৃ. ৪৫

প্রতি বৎসর ত্রিশ–চল্লিশ হাজার শিশু জন্মগত সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। কঠিন জ্বররোগ ব্যতীত অন্যান্য যত প্রকার ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটে, তাহার মধ্যে সিফিলিস ব্যাধিজনিত মৃত্যুর হার অত্যধিক।

সেই প্রমেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, যুবকদের শতকরা ৬০ জন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইহাদের মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত উভয় শ্রেণীই রহিয়াছে।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে একমত যে, যে সকল বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যে সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়। [১]

তালাক ও বিচ্ছেদ

এইরূপ অবস্থায় পারিবারিক শৃংখলা ও দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন করিয়া অক্ষুন্ন থাকিতে পারে? যে সমস্ত স্বাধীনজীবী নারী কামরিপু চরিতার্থ করিবার প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাহাদের জীবনে পুরুষের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং বিবাহ না করিয়াই পুরুষ যাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহারা বিবাহকে একটা অনাবশ্যক বস্তু মনে করে। আধুনিক দর্শন ও জড়বাদী দৃষ্টিভংগী তাহাদের অন্তকরণ হইতে এই ধারণা মুছিয়া ফেলিয়াছে যে, বিবাহ ব্যতিরেকে কোন পর পুরুষের সংগে সম্পর্ক স্থাপনে কোন দোষ বা পাপ হইতে পারে। এই পরিবেশ সমাজকেও এমন চেতনাহীন করিয়া ফেলিয়াছে যে, এই ধরনের নারীকে সে ঘৃণা বা নিন্দনীয় মনে করে না। জর্জ লিন্ডসে আমেরিকার সাধারণ নারী জাতির মনোভাব নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ

বিবাহ আমি কেন করিব? আমার সংগিনীদের মধ্যে যাহারা গত দুই বৎসরে বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের দশজনের মধ্যে পাঁচজনের বিবাহই তালাকে পরিণত হইয়াছে। আমি মনে করি, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মেয়ে

---

১. Laws of sex, P. 204

প্রেমের ব্যাপারে স্বাধীন কার্যক্রম অবলম্বন করিবার স্বাভাবিক অধিকার রাখে। গর্ভনিরোধের যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের আছে। ইহার দ্বারা আমাদের এই আশংকোও দূর হইয়াছে যে, কোন অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করিয়া আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিবে। আমাদের বিশ্বাস, আধুনিক পন্থানুযায়ী গতানুগতিক আচার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনই বিবেকের কাজ হইবে।

এইরূপ মনোভাবাসম্পন্ন নির্লজ্জ নারীকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে একমাত্র প্রবল প্রেমানুরাগ। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই প্রেমানুরাগ আন্তরিক হয় না, একটা সাময়িক উত্তেজনার বশে হইয়া থাকে। উত্তেজনার নেশা কাটিয়া যাইবার পর স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে আর প্রেম অবশিষ্ট থাকে না। প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের কিঞ্চিত বিসদৃশ্য উভয়ের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার করে। অবশেষে তালাক অথবা বিচ্ছেদের আবেদনসহ তাহারা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়।

লিন্ডসে বলেন

১৯২২ খৃস্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিবাহই বিচ্ছেদে পর্যবসিত হইয়াছিল এবং প্রতি দুইটি বিবাহের জন্য একটি করিয়া তালাকের মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। ইহা শুধু ডেনভারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আমেরিকার প্রায় প্রতিটি নগরেই অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি আরও বলেনঃ তালাক এবং বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে–এবং ইহার সম্ভাবনাও প্রচুর রহিয়াছে–তাহা হইলে দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই বিবাহের জন্য যতটা লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তালাকের জন্যও ঠিক ততটা মামলা আদালতে দায়ের করা হইবে।[১]

একদা ডেট্রয়েটের (Detroit) 'ফ্রী প্রেস' নামক একটি সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

বিবাহের স্বল্পতা, তালাকের আধিক্য এবং বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী অথবা সাময়িক যৌন সম্পর্কের ব্যাপকতা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমরা পশুত্বের দিকে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছি। সন্তান উৎপাদনের প্রাকৃতিক কামনা

১. Revolt of Modern youth. P. 211-14

বিলুপ্ত হইতেছে; নবজাত সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে; সভ্যতা ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সুশৃংখলা যে অপরিহার্য, এই অনুভূতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে সভ্যতা ও শাসন ক্ষমতার ভিতর দিয়া এক নির্মম অবহেলা দামা বাঁধিয়া উঠিতেছে।

তালাক ও বিচ্ছেদের ব্যাপকতা নিরসনের উপায় হিসাবে Companionnate Marriage অর্থাৎ পরীক্ষামূলক বিবাহের প্রচলন করা হয়। কিন্তু এই সমাধান প্রকৃত ব্যাধি হইতে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত হইয়াছে। পরীক্ষামূলক বিবাহের অর্থ এই যে, পুরুষ ও নারী 'প্রাচীন ধরনের বিবাহে' আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে কিয়ৎকাল একত্রে বসবাস করিবে। এইরূপ একত্রে বসবাসকালে যদি তাহাদের মধ্যে মনের মিলন হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে নতুবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণ করিতে থাকিবে। পরীক্ষামূলক সময়ে তাহাদিগকে সন্তান উৎপাদন হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কারণ সন্তান উৎপাদিত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে যথারীতি বিবাহ বন্ধন বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িবে। ইহাই রাশিয়াতে Free Love অর্থাৎ 'স্বাধীন প্রেম' নামে অভিহিত।

জাতীয় আত্মহত্যা

প্রবৃত্তি পূজা, দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে বিতৃষ্ণ– পারিবারিক জীবন যাপনে বীতরাগ ও দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতিহীনতা নারীর প্রাকৃতিক মাতৃসুলভ আবেগ অনুরাগ প্রায়ই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহাই নারী জাতির মহানতম আধ্যাত্মিক অনুরাগ এবং ইহারই অস্তিত্বের উপর শুধু তাহযীব-তমদ্দুনই নহে, মানবতার অস্তিত্বও নির্ভরশীল। এই অনুরাগের অভাবেই গর্ভনিরোধ, গর্ভনিপাত ও প্রসূত হত্যার শয়তানী অনুরাগ জন্মলাভ করিয়াছে। আইনগত বাধা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় প্রতিটি যুবতী নারী গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারিণী। গর্ভনিরোধের ঔষধাবলী ও যন্ত্রপাতি স্বাধীনভাবে বাজারে বিক্রয় হয়। সাধারণ নারী তো দূরের কথা, স্কুল-কলেজের ছাত্রিগণও এই সকল উপাদান সংগে রাখে, যাহাতে প্রণয়ী বন্ধু হঠাৎ ভুলবশত সংগে না আনার কারণে মধুময় 'সান্ধ্য অভিসার' ফেলিয়া না যায়।

জর্জ লিণ্ডসে বলেন

উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৯৫ জন বালিকা আমার নিকট স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে যে, বালকদের সহিত তাহাদের যৌনক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের গর্ভ সঞ্চার হয়। অন্যদের মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। কিন্তু অধিকাংশই গর্ভনিরোধের যথেষ্ট জ্ঞান রাখিত। এই জ্ঞান তাহাদের নিকটে এমন সাধারণ বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে তাহা ধারণাই করিতে পারে না।

কুমারী মেয়েরা ঐসব ঔষধ ও যন্ত্রপাতি এইজন্য ব্যবহার করে যে, তাহাদের স্বাধীনতার পথে যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। বিবাহিতা নারীদের তাহা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তান হইলে তাহার প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বই শুধু গ্রহণ করিতে হয় না, বরং ইহার কারণে স্বামীর তালাক দেওয়ার পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল বিপদ এড়াইবার জন্যই বিবাহিতা নারী গর্ভনিরোধের ঔষধাবলী ব্যবহার করে। সকল নারীই এইজন্য সন্তানের মা হইতে ঘৃণাবোধ করে যে, জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে হইলে এই সন্তানরূপ বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু সন্তান প্রসবের ফলে তাহাদের সৌন্দর্যেও ভাটা পড়িয়া যায়।[১]

কারণ যাহাই হউক না কেন, যাহাদের এইরূপ নারীপুরুষের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের স্বাভাবিক পরিণাম ফলের পথ গর্ভপ্রতিষেধক দ্বারা রুদ্ধ করা হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫ জনের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে গর্ভসঞ্চার হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য ভ্রূণহত্যা ও প্রসূত হত্যার পথ উন্মুক্ত থাকিয়া যায়। জর্জ লিণ্ডসে বলেন যে, আমেরিকায় প্রতি বৎসর পনের লক্ষ গর্ভনিপাত করা হয় এবং হাজার হাজার নবজাত সন্তানকে হত্যা করা হয়। –উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২০

ইংলণ্ডের অবস্থা

আমরা এইরূপ বেদনাদায়ক বিষয়কে আর বেশী দীর্ঘতর করিতে চাই না। কিন্তু জর্জ র‍্যালী স্কটের 'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস' [A History of

১. Macfaddin Manhood and Marriage hs.Ç

Prostitution] নামক গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া এই প্রসংগ শেষ করা সমীচীন মনে করিতেছি না। গ্রন্থকার একজন ইংরেজ এবং তিনি স্বীয় মাতৃভূমির চিত্র নিম্নরূপ ভাষায় পরিস্ফুট করিয়াছেনঃ

যে সকল নারী দেহ ভাড়া দেওয়াকেই তাহাদের জীবিকার্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে– এবং ইহাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে– ইহারা জীবনের আবশ্যক দ্রাব্যাদি লাভ করিবার জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করিয়া থাকে এবং যাহাতে অতিরিক্ত দু'পয়সা অর্জন করিতে পারে, তাহার জন্য আনুষংগিকরূপে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। ব্যবসায়ী বেশ্যা ও ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু এই যে, ইহাদিগকে বেশ্যা নামে অভিহিত করা হয় না। আমরা অবশ্য তাহাদিগকে Amateur Prostitutes অর্থাৎ 'পেশাহীন বেশ্যা' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

এই সকল কামাতুর অথবা পেশাহীন বেশ্যার সংখ্যা আজকাল যে পরিমাণে দেখা যায়, তাহা অন্য সময়ে কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। সমাজের উঁচুনীচু সকল স্তরেই এই শ্রেণীর নারী দেখা যায়। যদি এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাকে কখনও আকার ইংগিতে বেশ্যা বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা অগ্নিশর্মা হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ প্রকাশে প্রকৃত ঘটনার কোন পরিবর্তন হয় না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাহাদের ও পিকাডিলীর কুখ্যাতা ও নির্লজ্জ বেশ্যাদের মধ্যে কণামাত্র পার্থক্য নাই।

.....অসৎ চালচলন এবং এতদ্বিষয়ে নির্ভীকতা, এমন কি বাজারী চালচলন পর্যন্ত এখানকার যুবতী মেয়েদের এক ফ্যাশান হইয়া পড়িয়াছে। সিগারেট পান, তীব্র মদ্যপান, ওষ্ঠদ্বয় লাল রঙে রঞ্জিতকরণ, যৌন বিজ্ঞান ও গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি, অশ্লীল সাহিত্য লইয়া আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই ইহাদের এক ফ্যাশান হইয়া পড়িয়াছে। ...বিবাহের পূর্বে নিঃসংকোচে অপরের সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, এইরূপ বালিকা ও নারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সকল সত্যিকার লাজনম্র কুমারী বালিকাকে গীর্জায় উৎসর্গীকরণ বেদীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত, তাহারা আজকাল একেবারেই বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল কারণে পরিস্থিতি এতদূর গড়াইয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেনঃ

সাজসজ্জার তীব্র আকাঙ্খা বালিকাদের মধ্যে এক দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করিয়াছিল এবং ইহারই বশবর্তী হইয়া তাহারা নব নব ফ্যাশানের মূল্যবান বেশভূষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের নানাবিধ সামগ্রীর প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা সেই নীতিবিরুদ্ধ বেশ্যাবৃত্তিরই অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবান নয়নাভিরাম বেশভূষায় সজ্জিত শত সহস্র তরুণী ও যুবতী নারীকে নিত্যই পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই এই কথা বলিবে যে, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ তাহাদের এহেন বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। অতএব একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, একমাত্র পুরুষই তাহাদের বেশভূষা ক্রয় করিয়া দেয়।

এইরূপ উক্তি আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেমন নির্ভুল ছিল, আজও তেমনি নির্ভুল; তবে পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্বে যে সকল পুরুষ তাহাদের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিত, তাহারা ছিল হয়ত তাহাদের স্বামী কিংবা পিতা অথবা ভ্রাতা। কিন্তু এখন তাহাদের পরিবর্তে অন্য লোক তাহা ক্রয় করিয়া দেয়।

এইরূপ অবস্থার জন্য নারী স্বাধীনতাও বহুলাংশে দায়ী। বিগত কয়েক বৎসর হইতে মেয়েদের প্রতি পিতামাতার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ এত কমিয়া গিয়াছে যে, তাহার ফলে মেয়েরা আজকাল যতখানি স্বাধীন ও বেপরওয়া হইয়া পড়িয়াছে, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বালকেরাও এতখানি হইতে পারে নাই।

সমাজের মধ্যে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপক প্রসারতার একটি প্রধান কারণ এই যে, মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অফিসাদি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী গ্রহণ করিতেছে। এই সকল স্থলে রাত্রদিন পুরুষের সংগে তাহাদের মেলামেশার সুযোগ হইতেছে। ইহা নারীপুরুষের নৈতিক মানকে অতি নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে। পুরুষ অগ্রগামী হইয়া কিছু করিতে চাহিলে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা নারীর থাকে না। ফলে

উভয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং তাহা নৈতিকতার সকল বন্ধন অতিক্রম করে। এখন যুবতী নারীর মনে বিবাহ এবং পবিত্র জীবন যাপনের ধারণা স্থানই পায় না। যে মদানন্দময় সময়ের সন্ধান এক সময়ে শুধু লম্পটশ্রেণীর লোকই করিত, আজকাল প্রত্যেক তরুণী তাহারই কামনা করে। কুমারীত্ব ও সতীত্বকে আজকাল প্রাচীন যুগের প্রথা মনে করা হয় এবং আধুনিক যুগের মেয়েরা ইহাকে এক বিপদ মনে করিয়া থাকে। ইহাদের মতে জীবনের আনন্দই এই যে, যৌবনকালে যৌনসম্ভোগের রংগিন সুরা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে হইবে। ইহারই জন্য ইহারা নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, হোটেল, বেশ্যালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারই আশায় সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সংগে মোটরযোগে আনন্দ অভিসারে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। মোটকথা, ইহারা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজেদেরকে এমন এক পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং করিয়া আসিতেছে, যাহা মানব মনে স্বভাবতই কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। অতপর ইহার যে অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম ফল হয়, তাহার জন্য ইহারা মোটেই শংকিত হয় না, বরং উহাকে অভিনন্দন জানায়।

সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন

আমাদের দেশে ও অন্য দেশগুলিতে যাহারা পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করে, তাহাদের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে জীবনের ঐরূপ চিত্রই পরিস্ফুট রহিয়াছে। এইরূপ জীবনের উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি তাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এইসব দৃষ্টিভঙ্গী, এইরূপ নৈতিক মূলনীতি এবং এইরূপ বৈষয়িক ও দৈহিক আনন্দ-সম্ভোগের উজ্জ্বল দিক তাহাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পর্দার প্রতি তাহাদের ঘৃণা এইজন্য যে, পাশ্চাত্যের যে নৈতিক দর্শনের প্রতি তাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহা পর্দা সম্পর্কিত নৈতিক দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং যে সমস্ত বৈষয়িক লাভ ও সুখ-সম্ভোগ তাহাদের কাম্য বস্তু, পর্দা তাহার প্রতিবন্ধক। এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবন-চরিত্রের অন্ধকার দিকটি অর্থাৎ ইহার বিষময় পরিণাম ফল মানিয়া লইতে ইহারা সম্মত কি-না। এই বিষয়ে ইহারা সকলে কিন্তু একমত নহে।

একদল এমন আছে, যাহারা এই সকল পরিণাম-ফল স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মতে ইহাও পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের উজ্জ্বল দিক-অন্ধকার দিক নহে।

দ্বিতীয় দল ইহাকে চিত্রের অন্ধকার দিকই মনে করে এবং ইহার পরিণাম-ফল স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহে। কিন্তু ঐরূপ জীবন যাপনের সহিত যে সকল উপভোগের সামগ্রী রহিয়াছে, তাহার প্রতি ইহারা মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় একটি দল আছে, যাহাদের না এই সব দৃষ্টিভংগী বুঝিবার জ্ঞান আছে, না ইহার পরিণাম-ফল সম্পর্কে তাহাদের কোন অনুভূতি আছে। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিণাম-ফলের মধ্যে কি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করিয়া শ্রম স্বীকার করিতেও ইহারা প্রস্তুত নহে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া যুগের অন্ধ অনুকরণ করিয়া যাইতে হইবে।

এই তিনটি দল এমনভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে যে, আলাপ-আলোচনায় ইহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে যে, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী কোন্ দলভুক্ত। এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে সাধারণত আলোচ্য বিষয়বস্তু এক কঠিন জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়। এইজন্য প্রতিটি দল বাছিয়া পৃথক করা প্রয়োজন বোধ করি এবং অতপর প্রত্যেকের বিষয়ে তদনুযায়ী আলোচনা করা উচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত দল

প্রথম দল জানিয়া শুনিয়া ঐ সকল মতবাদ ও সাংস্কৃতিক মূলনীতির উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। নব্য ইউরোপের সমাজ-শিল্পিগণ যে মনমস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করে এবং যে দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলী দেখে, ইহারা অবিকল তাহাই করে। ইহারা আপন আপন দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকেও সেই পাশ্চাত্য রঙে রঞ্জিত করিতে চায়। নারী শিক্ষার চরম লক্ষ্য তাহাদের এই যে, নারীরা যেন জীবিকার্জনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে এবং তৎসহ পর-পুরুষের মন জয় করিবার কলা কৌশলও হস্তগত করিতে পারে। তাহাদের মতে পরিবারের মধ্যে নারীর স্থান এই যে, সে-ও পুরুষের ন্যায় পরিবারের একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হইবে এবং সম্মিলিত বাজেটে সে তাহার অংশ পূরণ করিবে। তাহাদের মতে সমাজে নারীর স্থান এই যে, সে তাহার সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা এবং কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা সমাজ জীবনে এক রসের উপাদান যোগাইবে। তাহার কোকিল কণ্ঠে মনের মধ্যে এক আনন্দ শিহরন সঞ্চারিত করিবে। তাহার সংগীত কলায় কর্ণকুহর জুড়াইয়া দিবে। তাহার লাস্যময়ী নৃত্যে প্রাণে এক সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করিবে। তাহার 'চলিতে ছলকি পড়িছে কাঁকাল, যৌবন থর থর তনু' ভঙ্গীমায় আদম-সন্তানদের চিত্তবিনোদন করিবে। দর্শক নয়ন ভরিয়া তাহা উপভোগ করিবে এবং তাহাদের শীতিল রক্তকণায় তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতে থাকিবে। সে সমাজসেবা করিয়া বেড়াইবে, মিউনিসিপ্যালিটি ও কাউন্সিলের সভ্য হইবে, সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করিবে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আপন সময় ও মস্তিষ্ক ব্যয় করিবে। ক্রীড়া-কৌতুক ও খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করিবে। সন্তরণ, দৌড়, লম্ফ-ঝম্ফ, আকাশ পথে বিচরণ প্রভৃতিতে রেকর্ড ভংগ করিবে। তাহাদের মতে জাতীয় জীবনে নারীর করণীয় ইহা ব্যতীত আর

কিছুই নাই। মোট কথা, যাহা গৃহের বাহিরের, তাহাই সে করিবে এবং যাহা গৃহাভ্যন্তরের, তাহার ত্রিসীমানায় সে যাইবে না। এইরূপ জীবনকেই তাহারা আদর্শ জীবন মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস, পার্থিব উন্নতির ইহাই একমাত্র পথ এবং যে সব প্রাচীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই পথের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা সবই অর্থহীন ও ভ্রান্ত। ইউরোপ যেমন প্রাচীন নৈতিক মূল্যমানকে নূতন মূল্যমানের দ্বারা পরিবর্তিত করিয়াছে, ইহারাও তাহাই করিয়াছে। বৈষয়িক উন্নতি ও দৈহিক ভোগ-বিলাসই তাহাদের নিকট একমাত্র মূল্যবান কাম্য বস্তু। লজ্জা, সতীত্ব ও পবিত্রতা, নৈতিক চরিত্র, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও বিশ্বাসভাজনতা, বংশ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি তাহাদের নিকটে মূল্যহীনই নহে, বরং বর্বরোচিত ও কুসংস্কারজনিত প্রতারণামাত্র। এই সবের মূলোচ্ছেদ ব্যতীত উন্নতির পদক্ষেপ সম্ভব নহে।

ইহারা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দীনের খাঁটি মু'মিন। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বনে ইউরোপ তাহার মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করিয়াছে, ইহারাও সেই মতবাদে ঈমান আনিয়া সেই পন্থায় তাহা প্রাচ্যের দেশগুলিতে ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা করিতেছে।

নূতন সাহিত্য

সর্বপ্রথম তাহাদের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করুন, যাহা মন-মস্তিষ্ক গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বিশেষ। এই তথাকথিত সাহিত্যের (?) [প্রকৃতপক্ষে অপসাহিত্য] দ্বারা পূর্ণ শক্তিতে এই চেষ্টা করা হয়, যাহাতে ভবিষ্যত বংশধরদের নিকটে নূতন চরিত্র দর্শন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরা যায় এবং প্রাচীন নৈতিক মূল্যমানকে মন ও মস্তিষ্কের অণু-পরমাণু হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা যায়। আমি এখানে উর্দু সাহিত্য হইতে ইহার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করিব।

এই দেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ একটি মাসিক পত্রিকায় 'শিরীনের পাঠ' শীর্ষক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পলেখক উচ্চ শিক্ষিত, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রখ্যাত এবং একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। গল্পের সারাংশ এই যে, একটি তরুণী তাহার শিক্ষকের নিকটে পড়িতে বসিয়াছে। পড়িবার কালে সে তাহার এক তরুণ প্রেমিকের প্রেমপত্র আলোচনার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের

নিকটে উপস্থাপিত করে। একটি টি পার্টিতে সেই প্রেমিক বন্ধুটির সংগে তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে। তথায় জনৈক মহিলা তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। সেইদিন হইতেই তাহাদের মেলামেশা ও পত্রের আদান–প্রদান শুরু হয়। তরুণীর ইচ্ছা যে, তাহার শিক্ষক উক্ত প্রেমপত্রের একটা জবাব লিখিয়া দিবেন। শিক্ষক তাহাকে এই সমস্ত বাজে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পাঠের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তরুণী ও শিক্ষকের মধ্যে এতদ্বিষয়ে নিম্নরূপ কথোপকথন চলেঃ

তরুণীঃ পড়তে তো আমি চাই। কিন্তু এমন পড়া পড়তে চাই, যা আমাকে জাগ্রত স্বপ্নের আশা পূরণে সাহায্য করে। এমন পড়া পড়তে চাই না, যা আমাকে এখন থেকে আইবুড়ো করে রাখে।

শিক্ষকঃ আচ্ছা, এ মহাত্মা ছাড়াও কি তোমার অন্য কোন যুবক বন্ধু আছে?

তরুণীঃ হাঁ, কয়েকজন আছে। তবে এই যুবকটির বৈশিষ্ট্য এই যে, সে বড় মিষ্টি স্বরে ধমক দেয়।

শিক্ষকঃ আচ্ছা, তোমার পিতা এ পত্রের বিষয় জানতে পারলে কি হবে বলতো?

তরুণীঃ বা–রে! পিতা কি তার যৌবনকালে এ ধরনের প্রেমপত্র লিখেন নি? তিনি তো বেশ ফিটফাট বাবু ছিলেন। এখনও লিখে থাকলেই বা আশ্চর্যের কি আছে? এখনও তো তিনি বুড়ো হন নি।

শিক্ষকঃ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এ ধারণা করাই সম্ভব ছিল না যে, কেউ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের বালিকার নিকটে এ ধরনের প্রেমপত্র লিখবে।

তরুণীঃ তবে কি সে কালের লোকেরা শুধু ইতরশ্রেণীর লোকের সাথেই প্রেম করতো? বাঃ তবে তো সেকালে ইতর শ্রেণীর লোক বেশ আরামেই ছিল এবং সম্ভ্রান্তশ্রেণীরা ছিল বেশ দুষ্ট।

শিরীনের শেষ উক্তিগুলির মধ্যে গল্পলেখকের সাহিত্য দর্শনের সুর ঝংকৃত হয়।

শিরীন বলেঃ আমাদের মতো নব্য যুবতীদের দ্বিগুণ দায়িত্ব রয়েছে। যে সব আনন্দ–উল্লাস আমাদের গুরুজন হারিয়ে ফেলেছেন, তা পুনরুদ্ধার করা এবং যে সব ক্রোধ ও মিথ্যার অভ্যাস বিদ্যমান আছে, তা দূর করা আমাদের কর্তব্য।

আর একটি খ্যাতনামা সাহিত্য পত্রিকায় আজ হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে 'অনুতাপ' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। সহজ সরল ভাষায় তাহার সারাংশ এইঃ

সম্ভ্রান্ত বংশের একটি কুমারী বালিকা এক যুবকের প্রেমে পড়িয়া যায়। পিতামাতার অজ্ঞাতে সে তাহাকে আপন কক্ষে ডাকিয়া লয়। অতপর অবৈধ যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। অতপর সে তাহার এহেন গর্হিত অপবিত্র কার্যকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করিবার জন্য আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতেছেঃ

আমি এত চিন্তিতা কেন? আমার দুরু দুরু হিয়াই বা কেন?... আমার বিবেক কি আমাকে দংশন করে? আমার দুর্বলতার জন্য আমি কি লজ্জিতা? কিন্তু সেই সুন্দর চাঁদনী রাতের ঘটনা আমার জীবন গ্রন্থে সোনারী অক্ষরে লিখিত হয়েছে। যৌবনের সেই মদমত্ত মুহূর্তগুলির স্মরণ আমি আমার জীবনের মূল্যবান সম্পদ মনে করি। সেই মূহূর্তগুলি ফিরে পাবার জন্যে কি আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই?....

তবে কেন আমার হিয়া কাঁপছে? একি পাপের জন্যে ? আমি কি কোন পাপ করেছি? না, কোনই পাপ আমি করিনি। আমি কার কাছে পাপ করেছি? আমার পাপের জন্যে কার ক্ষতি হয়েছে? আমি তো উৎসর্গ করেছি। তারই জন্যে উৎসর্গ করেছি। হায়রে, তার জন্যে যদি আরও উৎসর্গ করতে পারতাম! পাপের ভয় আমি করি না। কিন্তু হাঁ, আমি এই সমাজ ডাইনীকে ভয় করি। তার কেমন অর্থবোধক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমার উপরে নিপতিত হচ্ছে।....

আমি তার জন্যেই বা কেন ভীতা হবো? তবে কি আপন পাপের জন্যে? কিন্তু আমার পাপই বা কি? আমি যা করেছি, সমাজের আর কোন মেয়ে তা

তা করে না কি? আহা, সেই মধুর রাত্রি আমার অধরে তার অধরামৃতের পরশ! নিবিড় বাহুবন্ধন! আর সুরভিত মধুময় বক্ষে কেমন এক অব্যক্ত আনন্দ আবেশে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি সমস্ত জগতটাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং তাতে কি হয়েছে? অন্যেই বা কি করতো? অন্য নারী কি সেই মুহূর্তে তাকে প্রত্যাখান করতে

পাপ? পাপ আমি কখনই করি নি। অনুতপ্ত আমি কখনই নই। পুনরায় তা করবার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।.. সতীত্ব? সতীত্ব আবার কোন্ বস্তু? সাধু কুমারীত্ব, না মনের পবিত্রতা? আমি আর কুমারী নেই। আমি কি আমার সতীত্ব হারিয়ে ফেলেছি?

অশান্তিপ্রিয় ডাইনী সমাজ যা খুশী তা করুক। সে আমার কি করতে পারে? কিছুই না। তার প্রগলভতাপূর্ণ বিদ্রুপের জন্যে আমি কেন ভয় করবো? তার কানাঘুষার জন্যেই বা কেন ভীতা হবো? আমার মুখমন্ডলই বা বিবর্ণ করি কেন? তার ব্যংগ–পরিহাসের জন্যেই বা কেন মুখ লুকাবো? আমার মন বলছে যে, আমি ঠিকই করেছি। তা হলে আমি কেন চোর হবো? তবে ঢাক–ঢোল পিটিয়ে কেনই বা একথা বলবো না যে, আমি এরূপ করেছি এবং বেশ করেছি।

নব্য সাহিত্যিকগণ এইরূপ যুক্তি–প্রমাণাদির অবতারণায় ভংগিমা এবং চিন্তাপদ্ধতি আধুনিক যুগের প্রত্যেক মেয়েকে–সম্ভবত তাহাদের আপন ভগ্নি ও কন্যাগণকেও–শিক্ষা দিতে চায়। তাহাদের শিক্ষা এই যে, চাঁদনী রাত্রিতে যদি কোন যুবতী নারীর পক্ষে কোন পর–পুরুষের আলিংগন লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তপ্ত বক্ষে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে। কারণ এমন অবস্থায় একমাত্র এইরূপ করাই সম্ভবপর। কোন নারী এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারে না। ইহা পাপ কার্য্য নহে, বরং ত্যাগ ও উৎসর্গ। ইহার দ্বারা সতীত্বের মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না। মনের পবিত্রতা সহকারে কুমারীত্বকে বির্সজন দিলে সতীত্বের কি আসে যায়? একটি নারীর জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকে। তাহার চেষ্টা –চরিত্রও এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে তাহার সমগ্র জীবন–গ্রন্থ এইরূপ স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত হয়।

এখন রহিল সমাজ। তাই সমাজ যদি এইরূপ সত্বীসাধ্বী নারীর প্রতি দোষারোপ করে, তাহা হইলে তাহাকে অশান্তি স্থাপনকারিণী ও ডাইনীই বলিতে হইবে। এইরূপ উৎসর্গকারিণী বালিকাদের প্রতি যাহারা দোষারোপ করে তাহারা দোষী, না ঐ সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কুমারী, যাহারা সুন্দর চাঁদনী রাতে উন্মুক্ত বক্ষের মধুর আলিংগনকে উপেক্ষা করিতে পারে না, তাহারা দোষী? যে অত্যাচারী সমাজ এহেন সুন্দর কাজকে কদর্য বলে, তাহার এমন কোন অধিকার থাকিতে পারে না যাহার জন্য মানুষ তাহাকে সমীহ করিয়া চলিবে এবং এমন সুন্দর কাজ করিয়া তাহার ভয়ে মুখ লুকাইতে হইবে। প্রত্যেকটি মেয়েকে প্রকাশ্যে ও নির্ভিক চিত্তে এই নৈতিক মহত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে এবং নিজে লজ্জিতা না হইয়া সমাজকেই লজ্জিত করিতে হইবে।

এইরূপ স্পর্ধা ও দুসাহস কোনদিন ব্যবসায়ী বারাংগনাদেরও হয় নাই। কারণ পাপকে পূণ্য, পুন্যকে পাপে পরিণত করিবার কোন নৈতিক দর্শন এই সকল হতভাগিনীদের ছিল না। সেকালের বেশ্যাগণ আপন সতীত্ব নষ্ট করিত বটে, কিন্তু নিজেকে হেয় ও পাপীয়সী মনে করিত। কিন্তু এখন নুতন সাহিত্য প্রতি পরিবারের কন্যা ও পুত্রবধুকে সেকালের বেশ্যা হইতে দশ ধাপ সম্মুখে আগাইয়া দিতে চায়। কারণ কুকার্য ও অশ্লীলতা ঢাকিবার জন্য সে নতুন দর্শন আবিষ্কার করিতেছে।

আর একটি পত্রিকা আছে, যাহা আমাদের দেশের সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে। এই পত্রিকায় 'দেবর' শীর্ষক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্প লেখকের পিতা নারীদের জন্য উন্নত ধরনের নৈতিক সাহিত্য রচনা করিয়া সমাজের প্রভূত শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এই মহান কাজের জন্য তিনি নারী সমাজের নিকটও সমাদৃত হন। কিন্তু তাহারই পুত্র উক্ত গল্পে এমন একটি বালিকার চরিত্র সুন্দররূপে অংকিত করিয়া তাহার ভগ্নিদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন যে, বিবাহের পূর্বে স্বীয় কল্পিত দেবরের পূর্ণ যৌবন এবং যৌবনোচ্ছ্বাসের কল্পনায় আপন দেহ-মনে এক অব্যক্ত পুলক শিহরণ অনুভব করিতেছে। কুমারী জীবনেই তাহার দৃষ্টিভংগী এমন ছিল যে, সে এইরূপ ধারণা করিত 'যে যৌবন নীরব ও শান্ত থাকিয়া ফুরাইয়া যায়, তাহা অকর্মণ্যতারই পরিচায়ক। আমার মতে যৌবনে চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাস

অবশ্যম্ভাবী এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণই তাহার উৎসর্গ। এইরূপ দৃষ্টিভংগী এবং ধারণা লইয়া সেই বালিকা যখন বিবাহ বাসরে স্বামীর শশ্রু শোভিত মুখ দর্শন করিল, তখন তাহার সুকুমার বৃত্তিসমুহ কুয়াশাবৃত্ত হইয়া পড়িল। তখন সে পূর্ব কল্পিত বাসনানুযায়ী স্থির করিয়া ফেলিল যে, স্বামীর সহোদর ভ্রাতার প্রেমপাশেই সে আবদ্ধ হইবে। ইহার সুযোগও শীঘ্রই ঘটিল। তাহার স্বামী শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত গমন করিলে দেবর–ভাবীতে প্রাণ ভরিয়া মজা লুটিল এবং উভয়ে যথাক্রমে ভ্রাতা ও স্বামীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল। গল্প লেখক এই কুকীর্তি স্বয়ং ব্যাভিচারিণী বালিকার লিখনীতেই প্রকাশ করিতেছে। সে তাহার অবিবাহিতা বান্ধবীর নিকট যাবতীয় কার্যকলাপ পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইতেছে। যাবতীয় প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া কিরূপে দেবর ও ভাবীর প্রেম চরম পরিণতি লাভ করিল, সে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া জানাইতেছে। নিবিড় বাহুবন্ধন ও যৌনমিলনের সময় দেহমনের যে আনন্দমত্তা ঘটে, তাহার কোন কিছুই পত্রে অপ্রকাশ রাখা হয় নাই। শুধু যৌন–ক্রিয়ার চিত্রাংকটুকুই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সম্ভবত এইরূপ ধারণা লইয়াই এই ত্রুটি–বিচ্যুতিটুকু রাখা হইয়াছে যে পাঠকপাঠিকা স্বয়ং কল্পনার তুলিতে সে অভাবটুকু পুরণ করিবে।

ফরাসী দেশের যে সাহিত্যের দৃষ্টান্ত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত যদি নুতন সাহিত্যের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইবে যে, এই শেষোক্ত অভিযাত্রীদল একই পথ ধরিয়া একই গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। সেই জীবন ব্যবস্থার জন্যই দৃষ্টিভংগী ও নৈতিকতার দিক দিয়া মন–মস্তিষ্ক তৈরী করা হইতেছে, বিশেষ করিয়া নারীদের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে লজ্জা–সম্ভ্রমের শেষ লেশটুকুও অবশিষ্ট না থাকে।

নূতন সংস্কৃতি

বাস্তবক্ষেত্রে যে শুধু এই নৈতিক দর্শন ও জীবন পদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা নহে, ইহার সংগে পুঁজিপতিসুলভ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক মুলনীতিও কার্যকরী হইয়াছে। পাশ্চাত্য জীবনের যে চিত্র নির্মিত হইয়াছে, এই ত্রিবিধ শক্তি সম্মিলিত উপায়ে তাহাই করিতেছে। যৌন–বিজ্ঞান সম্পর্কে নিকৃষ্টতম অশ্লীল সাহিত্য রচনা করিয়া তাহা স্কুল–কলেজের

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়ান হইতেছে। নগ্ন চিত্র ও চরিত্রহীনা নারীর ছবি প্রতিটি সংবাদপত্র, পুস্তিকা, গৃহ ও দোকান ঘরের শোভা বর্ধন করিতেছে। গৃহে গৃহে ও হাটে-বাজারে অতীব অশ্লীল অরুচিকর গ্রামোফোন রেকর্ড বাজান হইতেছে। সিনেমার যাবতীয় কার্যকলাপ যৌন উত্তেজনাই বাড়াইতেছে। শুভ্র উজ্জ্বল পর্দায় উহা প্রতি সন্ধ্যায় অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতাকে এমন চিত্তাকর্ষক করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে যে, প্রত্যেক বালক-বালিকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকে উৎকৃষ্ট আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ কামনা-বাসনা উদ্দীপক অভিনয় দর্শন করত যুবক-যুবতিগণ যখন রংগমঞ্চের বাহিরে পদার্পণ করে, তখন তাহারা অধীর উদ্যমে চতুর্দিকে প্রেম-ফাঁদ বিস্তারের সুযোগ খুঁজিতে থাকে। এই সব কিছুই ধণতান্ত্রিক সুযোগসুবিধার বিভিন্ন রূপ। এই ধনতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার কৃপায় বড় বড় শহরে দ্রুত গতিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে, তথায় নারীদের পক্ষে স্বয়ং জীবিকান্বেষণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার সাহায্যেই ঔষধ পত্রাদি ও যন্ত্রপাতিসহ প্রচারণা শুরু হইয়াছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশীর্বাদ প্রধানত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মাধ্যমেই প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌছিয়াছে। ইহা প্রধানত নারীদের জন্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়ত ইহা এমন কতকগুলি সংস্থা স্থাপিত করিয়াছে, যেখানে নারি-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত; ইহা আইনের বন্ধনকে এমন শিথিল করিয়া দিয়াছে যে, অশ্লীলতার ইচ্ছা প্রকাশই শুধু নহে, বরং উহাকে কার্যে পরিণত করিলেও তাহা অধিকাংশ সময়ে মোটেই অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এমতাবস্থায় যাহারা পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়সহকারে জীবনের এই পথে চলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাদের নৈতিকতা ও সামাজিকতায় প্রায় পূর্ণ বিপ্লবই ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের মহিলাগণ এমন বেশভূষায় বাহির হয় যে, তাহাদিগকে দেখিলে ফিল্ম অভিনেত্রী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের ঔদ্ধত্য এমন চরমে পৌছিয়াছে যে, ইহাদের বস্ত্রের নগ্নতা, রূপসৌন্দর্যের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি, সাজ-সজ্জার অতি আয়োজন এবং প্রতিটি কমনীয় ভংগী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যৌন-চুম্বক সাজা ব্যতীত এই সকল নারীর অন্য কোন লক্ষ্য বা

উদ্দেশ্যই নাই। ইহাদের লজ্জাহীনতা এমন চরমে পৌঁছিয়াছে যে, স্নানের পোশাক পরিধান করিয়া পুরুষের সহিত স্নান করা এবং সেই অবস্থায় ফটো তুলিয়া তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা এই শ্রেণীর কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার জন্য লজ্জাকর বিবেচিত হয় না। এমন কি লজ্জার কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। আধুনিক নৈতিক মতবাদ অনুযায়ী মানব-দেহের সকল অংশই সমান। যদি হাতের তালু এবং পায়ের তলা উন্মুক্ত রাখা চলে, তাহা হইলে নিতম্ব প্রদেশ ও কুচাগ্রভাগ উন্মুক্ত রাখিলে দোষ কি? জীবনের আনন্দ সম্ভোগ যাহার বহিপ্রকাশকে সামগ্রিকভাবে আর্ট বা শিল্পকলা বলা হয় -ইহাদের নিকট তাহা যাবতীয় নৈতিকতার উর্দ্ধে। এমন কি ইহারা তাহাদের চারিত্রিক কষ্টিপাথর। ইহাকে ভিত্তি করিয়া পিতা এবং ভ্রাতার আনন্দ ও গর্বে বুক ফুলিয়া যায়, যখন তাহারা দেখে যে, তাহাদের সম্মুখে কন্যাভগ্নি রংগমঞ্চের উপরে নৃত্য-গীত ও প্রেমপূর্ণ কমনীয় ভংগিমা দ্বারা শত শত উন্মুখ শ্রোতা ও দর্শকের প্রশংসাধ্বনি লাভ করিতেছে। বৈষয়িক সাফল্য-যাহার দ্বিতীয় নাম জীবনের উদ্দেশ্য...... তাহাদের মতে ঐ সকল বস্তু হইতে অধিকতর মূল্যবান যাহাকে বিসর্জন দিয়া ইহা লাভ করা যায় যে, নারী বাঞ্ছিত মুল পদার্থ এবং সমাজের জনপ্রিয়তা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিল, সে সতীত্ব হারাইয়া ফেলিলেও কিছুই হারাইল না, বরং সব কিছুই লাভ করিল। এই কারণে ইহা তাহারা কিছুতেই হৃদয়ংগম করিতে পারে না যে, কোন বালিকার বালকের সংগে কলেজে সহ-অধ্যয়ন অথবা ভরা যৌবনে শিক্ষার উদ্দেশ্যে একাকিনী ইউরোপ গমন কেনই বা দূষণীয় হইবে?

পাশ্চাত্যের দাসানুদাসগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে

ইহারাই ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা পর্দা প্রথার অধিকতর সমালোচনা করিয়া থাকে। তাহাদের মতে পর্দা এমন তুচ্ছ ও প্রকট মিথ্যা বস্তু যে, তাহা রহিতকরণের জন্য বিদ্রুপ ও কৌতুক পরিহাসই যথেষ্ট। কিন্তু এই ধারণা অবিকল এরূপ লোকের ন্যায়, যে তাহার মুখমন্ডলের উপর নাকের কোন আবশ্যকতাই বোধ করে না এবং এই জন্য সে যাহারই নাক দেখিতে পায় তাহাকেই বিদ্রুপ করিতে থাকে। এইরূপ নির্বোধ যুক্তির দ্বারা একমাত্র নির্বোধেরাই পরাভূত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে যদি কণামাত্র যৌক্তিকতার লেশ থাকিত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের ও

আমাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মূল্যমানের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যাহাকে আমরা মূল্যবান মনে করি, তাহা তাহাদের নিকট মূল্যহীন। অতএব নিজেদের মূল্যমানের নিরিখ অনুযায়ী যে কাজকে আমরা আবশ্যক মনে করি তাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহাদের দৃষ্টিতে শুধু অনাবশ্যক নহে, অর্থহীনও বিবেচিত হয়। কিন্তু এইরূপ মৌলিক মতভেদের স্থলে একমাত্র স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিই মতভেদের প্রকৃত মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করার পরিবর্তে উহার শাখা–প্রশাখা লইয়া কলহ করিতে পারে। মানবীয় মূল্যমান নির্ণয়ে একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মকেই মানিয়া চলিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষের শারীরিক গঠন প্রকৃতি যে বিষয়ের দাবি করে এবং যাহাতে মানুষের কল্যাণ ও সুখ–শান্তি হইতে পারে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মূল্যমান নিরূপণের যোগ্য।

অতএব, তাই এই কষ্টিপাথর দ্বারা যাচাই-পরীক্ষা করিয়া দেখি মূল্যমানের মতবিরোধে আমরা সঠিক পথে আছি, না তোমরা আছ। জ্ঞানবিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমাণ তোমাদের যাহা আছে, তাহা লইয়া আইস, যাহা আমাদের আছে তাহা আমরা উপস্থাপিত করিতেছি। অতপর ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবান লোকের ন্যায় লক্ষ্য করিয়া দেখ, গুরুত্ব কোন্ দিকে। এই পন্থায় যদি আমরা মূল্যমানের নিরিখ প্রমাণ করিয়া দেই, তাহা হইলে তোমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূল্যমানকে ইচ্ছা করিলে গ্রহণও করিতে পার কিংবা নিছক প্রবৃত্তির অনুরাগে গৃহীত মূল্যমানেরও অনুসরণ করিতে পার। কিন্তু স্মরণ রাখিও এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিলে তোমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িবে যে, আমাদের কর্মপদ্ধতির প্রতি উপহাস করার পরিবর্তে তোমরা নিজেরাই হাস্যস্পদ হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় দল

ইহাদের পরে আর একটি দল আছে। প্রথম দলে অমুসলমান ও নামেমাত্র মুসলমান উভয়েই আছে। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি সামগ্রিকভাবে মুসলমান দ্বারাই পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে আজকাল আধা–পর্দা এবং আধা প্রগতির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইহারা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়; এমন দোদুল্যমান দলের ন্যায়। একদিকে তাহারা ইসলামী ঝোঁক প্রবণতা পোষণ করে, চরিত্র, সভ্যতা, আভিজাত্য ও সুন্দর স্বভাবের ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত কষ্টিপাথর মানিয়া চলে, আপন নারীদিগকে সম্ভ্রম সতীত্বের ভূষণে অলংকৃত করিতে

এবং আপন গৃহগুলিকে নৈতিক অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিতে অভিলাষী হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সামাজিকতার মৌলিক নীতি অনুসরণে যে সকল পরিণাম ফল পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক, তাহা মানিয়া লইতেও ইহারা রাজী নহে। কিন্তু অপরদিকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মুলনীতি ও আইনকানুনকে চূর্ণ করত কিছুটা নিজেকে সংযত রাখিয়া এবং কিছুটা সংকোচ করিয়া নিজেদের স্ত্রী–ভগ্নি–কন্যাদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার পথেই লইয়া চলিয়াছে। ইহারা ভ্রমাত্মক ধারণা লইয়া আছে যে, তাহারা অর্ধ পাশ্চাত্য ও অর্ধ ইসলামী পন্থা একত্র করিয়া উভয় সভ্যতার সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করিবে অর্থাৎ তাহাদের গৃহে ইসলামী চরিত্রও অক্ষুন্ন থাকিবে, পারিবারিক জীবনের শৃংখলাও ঠিক থাকিবে। তৎসহ তাহাদের সামাজিকতার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার শুধু কুফলসমুহই নহে, বরং উহার আত্মপ্রবঞ্চনা, ভোগবিলাস ও বৈষয়িক সুযোগসুবিধাগুলিও সন্নিবেশিত থাকিবে। কিন্তু প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন লক্ষ্যসহ দুইটি বিপরীতমুখী সভ্যতার অর্ধাংশদ্বয়কে একত্রে গ্রথিত করাই ন্যায়সংগত ইহবে না। কারণ এইরূপ অসমঞ্জস্য একত্র করণের ফলে উভয়ের গুণাবলীর পরিবর্তে দোষগুলিই একত্র হওয়ার আশংকা বেশী থাকে।

দ্বিতীয়ত ইহাও অযৌক্তিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ যে, একবার ইসলামের সুদৃঢ় নৈতিক ব্যবস্থার বন্ধন শিথিল করিবার পর এবং মানুষ আইন ভংগ কার্যে আনন্দ লাভ করিতে থাকিবার পর উহাকে এমন এক সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে, যাহার দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা থাকিবে না। এই অর্ধ নগ্ন পরিচ্ছদের পরিবর্তন, এই সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার লালসা, এই বন্ধুবান্ধবের বৈঠকাদিতে নির্ভীক নির্লজ্জতার প্রাথমিক শিক্ষা, এই সিনেমা, নগ্ন চিত্রাদি এবং প্রেমপূর্ণ গল্প ও নাটকাদির প্রতি বর্ধনশীল অনুরাগ, এই পাশ্চাত্য ধরনে মেয়েদের শিক্ষা হয়ত তাহাদের পূর্ণ ক্রিয়া বিস্তার করিতে পারিবে না, হয়ত বর্তমান বংশধরও ইহার কুফল হইতে নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভবিষ্যত বংশধরও ইহার কুফল হইতে নিরাপদ থাকিবে, এইরূপ চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তুচ্ছ বিষয় হইতেই ভুলের সুত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত তুচ্ছ ভ্রমটিই বংশানুক্রমে বর্ধিত হইয়া এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সমস্ত ভ্রান্ত মৌলিক ভিত্তির উপর সমাজ ব্যবস্থার আধুনিক রূপ দেওয়া

হইয়াছিল তাহার পরিণাম ফল সগে সংগেই পরিস্ফুট হয় নাই বরং তাহার পূর্ণ পরিণাম ফল সম্প্রতি তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষে আসিয়া পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, এই পাশ্চাত্য ও ইসলামী ব্যবস্থার সংমিশ্রণ এবং এই অর্ধ প্রগতি প্রকৃতপক্ষে কোন চিরস্থায়ী ও অটল বস্তু নহে, বরং ইহার স্বাভাবিক অনুরাগ পাশ্চাত্যবাদের দিকেই রহিয়াছে। যাহারা এই পথে চলিতেছে, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, তাহারা যে যাত্রা শুরু করিয়াছে গন্তব্য স্থলে তাহারা নিজেরা পৌছিতে না পারিলেও তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি নিশ্চয়ই তথায় পৌছিয়াই ক্ষান্ত হইবে।

সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন

এমতাবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হইবার পূর্বে সকল লোককে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করিয়া নিম্নের মৌলিক প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইতে হইবে। তাহা এইঃ

তোমরা কি পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার ঐ সকল পরিণাম ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত আছ, যাহা ইউরোপ-আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহা উক্ত সমাজ ব্যবস্থারই স্বাভাবিক পরিণতি? তোমরা কি ইহাই চাও যে, তোমাদের সামাজেও ঐরূপ উত্তেজনামূলক ও যৌন উন্মাদনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হউক? তোমাদের জাতির মধ্যে ঐরূপ নির্লজ্জতা, সতীত্বহীনতা ও অশ্লীলতার প্লাবন হউক? রতিজ দুষ্টব্যাধি মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়ুক? পারিবারিক ও গৃহের শৃংখলা বিণস্ট হউক? তালাক অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ও পৃথকীকরণের ব্যাপক প্রচলন হউক? যুবক-যুবতী স্বাধীন যৌনক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ুক? জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা, প্রসূত হত্যা প্রভৃতির দ্বারা বংশ বৃদ্ধি বন্ধ করা হউক? যুবক-যুবতী সীমাতিরিক্ত যৌন উন্মত্ততায় নিজেদের বৃহত্তম কার্যকরী শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করুক? এমন কি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে অসময়ে যৌন প্রবণতার উন্মেষ হইতে থাকুক এবং তাহার ফলে মানসিক ও শারীরিক স্ফুরণে প্রথম হইতেই বিকল্পতা বদ্ধমূল হইয়া পড়ুক?

যদি বৈষয়িক লাভ ও ইন্দ্রিয় লালসার জন্য তোমরা এই সকল মানিয়া লইতে প্রস্তুত হও, তাহা হইলে দ্বিধাহীন চিত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে চল

এবং তখন আর ইসলামের নাম মুখে লইও না। ঐ পথে চলিবার পূর্বে ইসলামের সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা ঘোষণাও করিতে হইবে, যেন পরে তোমরা ইসলামের নামে কাহাকেও প্রতারিত করিতে না পার এবং তোমাদের এই লাঞ্ছিত অবস্থা যেন ইসলাম ও মুসলমানের জন্য কোন লজ্জা বা দোষের কারণ হইয়া না পড়ে!

কিন্তু তোমরা যদি এই সকল পরিণাম ফল মানিয়া লইতে প্রস্তুত না থাক, যদি তোমরা এমন এক মহান ও পবিত্র সংস্কৃতির আবশ্যকতা উপলব্ধি কর যেখানে পূত চরিত্র ও সভ্রমশীল অধিকার প্রতিপালিত হইতে পারে, যেখানে মানুষ তাহার মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য শান্ত পরিবেশ লাভ করিতে পারে, যেখানে নারীপুরুষ পারস্পরিক উত্তেজনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে নিরাপদ থাকিয়া নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা অনুযায়ী আপন সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করিতে পারে, যেখানে সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ পরিবার সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যেখানে বংশধর নিরাপদ হয় এবং জাতির সংমিশ্রণের আশংকাও থাকে না, যেখানে মানুষের পারিবারিক জীবন আনন্দ ও শান্তির নিকেতন হইয়া পড়ে, সন্তান-সন্ততির জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষার পাদপীঠ হইয়া পড়ে এবং পরিবারের সমুদয় লোক সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহানুভূতির সহিত কার্য সম্পাদন করিতে পারে? তাহা হইলে এই সকল মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাদিগকে পাশ্চাত্যমুখী হওয়া চলিবে না। কারণ পাশ্চাত্য এক সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে যাত্রা করিয়াছে এবং পশ্চিমে যাত্রা করিয়া পূর্বে উপনীত হওয়া যুক্তির দিক দিয়াও অসম্ভব। যদি সত্যই তোমাদের বাসনা এই হয়, তাহা হইলে তোমাগিকে ইসলামের পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

কিন্তু এই পথে পদক্ষেপ করিবার পূর্বে তোমাদিগকে ঐ সকল বৈষয়িক লাভ ও ইন্দ্রিয় ভোগ-বিলাসের আকাঙক্ষা মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে, যাহা পাশ্চাত্যের আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বাহ্যিক দৃষ্টিভংগী ও ভাবধারাকেও মন-মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা হইতে গৃহীত যাবতীয় মূলনীতিও বর্জন করিতে হইবে। ইসলামের নিজস্ব মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য আছে। তাহার নিজস্ব শাশ্বত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীও আছে। সে তাহার মৌলিক নীতি, উদ্দেশ্য ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীর স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী তদনুরূপই এক

সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছে। অতপর সে এই সামাজিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এক বিশেষ অনুশাসন নিয়ম নিষ্ঠার মাধ্যমে করিয়া থাকে। এই সকল নিয়ম-নীতি ও অনুশাসন [Discipline] প্রতিষ্ঠা করিতে চরম নিপুণতা ও মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কারণ ইহার অভাবে এই সামাজিক ব্যবস্থা ত্রুটিবিচ্যুতি ও বিশৃংখলা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ইহা প্লেটোর গণতন্ত্রের ন্যায় কোন কাল্পনিক ব্যবস্থা অথবা Sir Thomas More -এর কল্পিত সুখরাজ্য [Utopia] বা রামরাজ্য নহে, বরং ইহা চৌদ্দ শত বৎসরের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ব্যবস্থা। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন দেশ ও জাতির মধ্যে ইহার প্রভাবে ঐ সকল কুফলের এক-দশমাংশও পরিস্ফুট হইতে দেখা যায় নাই, যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতায় এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সুদৃঢ় ও সুপরীক্ষিত সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা যদি তোমরা লাভবান হইতে চাও, তাহা হইলে তাহার অনুশাসন ও নিয়ম নীতি পরিপূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে হইবে। অতপর এই সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতিবিরুদ্ধ অন্য কোন স্বকপোলকল্পিত অথবা অপরের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অচল ও ধিকৃত পন্থা ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করার কোন অধিকারই তোমাদের থাকিবে না।

তৃতীয় দলটি যেহেতু কতকগুলি নির্বোধ বিবেক-বিবেচনাহীন লোক লইয়া গঠিত, যাহাদের কোন বিচার করিয়া সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা নাই, সেইজন্য তাহারা উপেক্ষার পাত্র। অতএব ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা না করিয়া সম্মুখে অগসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রাকৃতিক বিধান

প্রকৃতি অন্য সকল প্রাণীর ন্যায় মানুষকেও নর ও নারী– এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহাদের উভয়ের প্রতি পারস্পরিক স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ আছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কে গবেষণা করিয়া জানা যায় যে, তাহাদের নারীপুরুষে বিভক্ত হওয়া এবং তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণবোধের উদ্দেশ্য নিছক তাহাদের জাতীয় স্থায়িত্ব বিধান। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে আকর্ষণবোধ–অন্য কথায় যৌনবোধ শুধু সেই পরিমাণেই দেওয়া হইয়াছে, যে পরিমাণ আবশ্যক তাহাদের বংশ বৃদ্ধি– তথা জাতীয় স্থায়িত্ব বিধানের জন্য। তাহাদের স্বভাবের মধ্যে এমন এক নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে যে, তাহা যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে দেয় না। পক্ষান্তরে মানবের মধ্যে যৌনবোধ সীমাহীন অপ্রতিহত এবং অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মাত্রায় অতি অধিক। তাহার যৌনক্রিয়ায় সময়ের অথবা ঋতুর কোন বাধা নিষেধ নাই। তাহার স্বভাবের মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহাকে কোন বিশেষ এক সীমারেখায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এক চিরন্তন পারস্পরিক যৌনবোধ বিদ্যমান থাকে। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও যৌনবোধের অফুরন্ত উপাদান আছে। তাহাদের অন্তকরণে কাম ও প্রেমের এক বিরাট আকাঙ্খা আছে। তাহাদের শারীরিক গঠন, দেহসৌষ্ঠব, লাবণ্য, স্পর্শ–ইন্দ্রিয় এবং প্রতি অংগপ্রত্যংগের মধ্যে বিপরীত লিংগের জন্য এক আকাঙ্খাবোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদের স্বর, চলনভংগী, অংগসৌষ্ঠব, কমনীয় ভংগী প্রভৃতির মধ্যেই আকর্ষণ শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিরাজ্যকে এমন অগণিত উপাদানে পরিপূর্ণ রাখা হইয়াছে যে, তাহা তাহাদের যৌন–আকাঙক্ষা উদ্দীপ্ত করত একেকে অপরের প্রতি প্রেমাসক্ত করিয়া দেয়। মলয় হিল্লোল, নদীর কলতান, স্থলোপরি মনোহর শ্যামলিমা, ফুলের সুরভি, পাখীর কূজন, মেঘের ঘনঘটা, চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য শোভা–মোটকথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিটি দৃশ্য এবং সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৌন্দর্য দিপ্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের যৌনবাসনা উদ্দীপ্ত করে।

অতপর মানবের শারীরিক শৃংখলার যাচাই-পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে যে শক্তির বিরাট আকর আছে, তাহা জীবনী শক্তি, কর্মশক্তি ও যৌনশক্তির একত্র সমাবেশ। দেহের মধ্যে কতিপয় নির্ণালী গ্রন্থি আছে, যাহা অংগ-প্রতংগবিশেষকে জীবন রস [Hormone] সিঞ্চনে উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করে।[১] উক্ত নির্ণালী গ্রন্থিসমূহ মানবের মধ্যে কর্মক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সৃষ্টি করে। উপরন্তু এই সকল গ্রন্থি তাহার মধ্যে যৌনবোধ জাগ্রত করে, যৌনক্ষমতা উদ্দীপ্ত করিবার আবেগানুভুতির স্ফুরণ আনয়ন করে। এই সকল আবেগ অনুভূতির স্ফুরণের জন্য সৌন্দর্য, লাবন্য, ঠাকঠমক, সাজসজ্জার বিবিধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া দেয়। অতপর এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা তাহার চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও কল্পনা শক্তির মধ্যেও সৃষ্টি করিয়া দেয়।

প্রকৃতির এবম্বিধ কার্যকুশলতা মানবের মানসিক শক্তিনিচয়ের মধ্যেও দেখা যায়। তাহার মনের মধ্যে যে সকল উদ্দীপক শক্তি আছে, তাহার দুইটি বিরাট আকাঙক্ষা থাকে। প্রথম আকাঙক্ষাটি স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তা বিধানে এবং আপন সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয়টি তাহাকে বিপরীত লিংগের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে। যৌবনে যখন মানুষের কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন এই দ্বিতীয় আকাঙক্ষাটি এত প্রবল হয় যে, অনেক সময় সে প্রথম আকাঙক্ষাকে দমিত করিয়া রাখে। ইহার প্রভাবে মানুষ এতখানি প্রভাবিত হইয়া পড়ে যে, স্বীয় জীবন বিসর্জন দিতে এবং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেও কোন দ্বিধাবোধ করে না।

তমদ্দুন গঠনে যৌন আকর্ষণের প্রভাব

এতসব কিসের জন্য? ইহা কি শুধু জাতীয় অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বিধান-তথা বংশ বৃদ্ধির জন্য? কখনই নহে। কারণ, মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখিবার

---

১. মানব দেহের অভ্যন্তরে কতগুলি নির্ণালী অন্তস্রাবী গ্রন্থি আছে। এই সকল নির্ণালী গ্রন্থি হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে Hormone বলে। হরমোন দেহের বিশেষ বিশেষ অংগ-প্রত্যংগকে উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করে। নারী পুরুষের মধ্যে নিম্নরূপ নয়টি অন্তস্রাবী নির্ণালী গ্রন্থি আছেঃ

Pineal, Pituitary, Thyroid & Pabathyriod. Thymus, Pancreas, Adrenal, Ovary, Placenta.

নারীদেহে উপরের সবগুলিই আছে এবং পুরুষের মধ্যে কয়েকটি মাত্র আছে। -অনুবাদক

জন্য তত পরিমাণ বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যত পরিমাণ প্রয়োজন হয় মৎস্য, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর। তাহা হইলে প্রকৃতি যে যাবতীয় প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে যৌনবোধ ও যৌন-আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার জন্য উদ্দীপক উপদানসমুহ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই বা কারণ কি হইতে পারে? তবে এত সব কি নিছক মানবের ভোগ বিলাসের জন্য? তাহাও নহে। প্রকৃতি কোন ক্ষেত্রেই ভোগবিলাসকে একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে উপস্থাপিত করে নাই। সে কোন এক মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে মানুষ ও অন্যান্য জীবকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভোগ বিলাস তথা যৌনসম্ভোগকে একটা রসাস্বাদস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছে, যেন তাহারা উক্ত কার্যকে নিজের মনে করিয়াই করিতে পারে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এই ব্যাপারে প্রকৃতির সম্মুখে কোন মহান উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে যতই চিন্তা-গবেষণা করা যাউক না কেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায় না যে, প্রকৃতি অন্যান্য প্রাণীকে বাদ দিয়া শুধু মানুষ জাতিকে লইয়া একটা তমুদ্দন রচনা করিতে চায়।

এইজন্য মানুষের মনে কাম ও প্রেমের এমন এক বাসনা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা নিছক দৈহিক মিলন ও বংশ বৃদ্ধির দাবিই করে না, বরং এক চিরন্তন সংগ লাভ, আন্তরিক সংযোগ ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের দাবি জানায়।

এইজন্য মানুষের মধ্যে সংগম ক্ষমতা অপেক্ষা যৌনবোধ অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে যৌনস্পৃহা ও যৌন আকর্ষণ যে পরিমাণে রহিয়াছে, তাহার এক দশমাংশও যদি সন্তানোৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। স্বাভাবিক বয়স লাভ করিবার পূর্বেই তাহার দৈহিক শক্তি নিশেষিত হইয়া যাইবে। মানুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণের যে আধিক্য রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মানুষ যাবতীয় পশুপক্ষী অপেক্ষা অধিকতর যৌনক্রিয়া সম্পাদন করিবে, বরং নারী ও পুরুষকে একত্রে সংযোগ করা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থায়ী ও সুদৃঢ় করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই কারণেই নারী-স্বভাবের মধ্যে আকর্ষণ ও বাসনার সংগে সংগে লজ্জা-সম্ভ্রম, যৌনক্রিয়ায় কৃত্রিম অনিচ্ছা, একটা পলায়নের মনোভাব এবং বাধাদানের স্বাভাবিক বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কম বেশী প্রত্যেক নারীর মধ্যেই আছে। এই পলায়নের মনোভাব ও কৃত্রিম অনিচ্ছা পশু স্ত্রীজাতিতেও দেখা যায়। কিন্তু মানব-নারীর মধ্যে ইহার শক্তি ও পরিমাণ বেশী মাত্রায় আছে। ইহাকে লজ্জা-সম্ভ্রমের ভাবাবেগ দ্বারা অধিকতর কঠোর করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, মানুষের মধ্যে যৌন চুম্বকের উদ্দেশ্য একটা চিরন্তন মিলন ব্যতীত কছিুই নহে। ইহা নহে যে, প্রতিটি যৌন বাসনা শুধু যৌনক্রিয়াতেই পর্যবসিত হইবে।

এই কারণে মানব সন্তানকে যাবতীয় পশু সন্তান অপেক্ষা অধিকতর দুর্বল ও অসহায় করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। পশুদের তুলনায় মানব-সন্তান কয়েক বৎসর যাবত পিতামাতা কর্তৃক নিরাপত্তা ও প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ও স্বাবলম্বী হওয়ার যোগ্যতা সে বহু বিলম্বে লাভ করে। ইহারও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, নারী পুরুষের সম্পর্ক নিছক যৌনসম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখা নহে বরং এই সম্পর্কের পরিণামস্বরূপ তাহাদিগকে সংযোগসহযোগিতায় বাধ্য করা।

মানুষের অন্তকরণে সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঢালিয়া দেয়া হইয়াছে। পশু-পক্ষী অতি অল্পকাল পর্যন্ত স্বীয় শাবকদের প্রতিপালন করত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। অতপর তাহাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্কই বাকী থাকে না। এমনকি তাহারা একে অপরকে চিনিতেও পারে না। পক্ষান্তরে মানুষ স্বীয় সন্তানাদির প্রাথমিক প্রতিপালনকাল অতীত হইবার পরও তাহাদের স্নেহ-মমতায় আকৃষ্ট থাকে। এই স্নেহবাৎসল্য পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে চলিতে থাকে। মানুষের স্বার্থপর পশুস্বভাব এই স্নেহ-বাৎসল্য ও প্রেম-ভালবাসায় এতই প্রভাবিত হইয়া পড়ে যে, সে নিজের জন্য যহা কামনা করে, তদপেক্ষা অধিক কামনা সে সন্তানাদির জন্য করিয়া থাকে। তাহার অন্তরে এইরূপ উচ্চাশার উদ্রেক হয় যে, সে সন্তানাদির জন্য যথাসম্ভব সচ্ছল হইতে সচ্ছলতর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তাহার নিজের শ্রম-মেহনতের ফল তাহাদের জন্য রাখিয়া যাইবে। এই প্রবল প্রেমানুরাগ সৃষ্টির দ্বারা নর-নারীর যৌনসম্পর্ককে একটা চিরন্তন মিলনে রূপান্তরিত

করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে। এই চিরন্তন মিলন-সংযোগকে পরিবার গঠনের সহায়ক করা হয়। অতপর জাতিসুলভ প্রেমপরম্পরা অন্য বহু পরিবারকে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ করে। ফলে প্রেম ও প্রেমাস্পদের সমন্বয়ে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের সংগঠন স্থাপিত হয়। এইভাবে একটা সামাজিকতা ও তামাদ্দুনিক সম্পর্ক অস্তিত্ব লাভ করে।

তমুদ্দুনের মৌলিক সমস্যা

এতদ্বারা জানিতে পারা গেল যে, মানব দেহের অনু-পরমাণু ও অন্তরাত্মার মধ্যে যে যৌনবাসনা ঢালিয়া দেওযা হইয়াছে এবং যাহার সাহায্যার্থে সৃষ্টিরাজ্যের স্তরে স্তরে উপাদানসমূহ ও উদ্দীপক বস্তুনিচয় ব্যাপকভাবে সংগৃহীত করা হইয়াছে, মানবকে ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির দিকে আকৃষ্ট করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃতি মানব সভ্যতার প্রকৃত উদ্দীপক শক্তি হিসাবেই এই বাসনা করিয়াছে। এই যৌনবাসনা ও আকর্ষণের ফলে মানব জাতির উভয় লিংগের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয় এবং এই সংযোগ-সম্পর্ক সামাজিক জীবনের সূত্রপাত করে।

যাচাই-পর্যালোচনার পর ইহা স্বতই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, নর-নারীর সম্পর্কের যে সমস্যা, তাহা প্রকৃতপক্ষে তমদ্দুনেরই মৌলিক সমস্যা। ইহারই সমাধানের উপরে তমদ্দুনের কল্যাণ ও অনাচার, উন্নতি ও অবনতি, দৃঢ়তা ও দুর্বলতা নির্ভর করে। মানব জাতির এই উভয় অংশের মধ্যে একটা পাশবিক সম্পর্ক আছে, যাহাকে অন্য কথায় নিছক যৌন ও সরাসরি সকাম বলা হয়। জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ বা বংশ বৃদ্ধি ব্যতীত ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। দ্বিতীয় সম্পর্কটি মানবীয়। উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে এক অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপন আপন সাধ্যানুযায়ী ও স্বাভাবিক যোগ্যতানুসারে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সাহায্যের জন্য তাহাদের যৌনপ্রেম সংযোগ-সহযোগিতার মাধ্যম হিসাবে কার্য করে। এই সকল পাশবিক ও মানবিক উপাদান একত্রে একই সময়ে তাহার দ্বারা তামাদ্দুনিক কার্যকলাপ চালাইয়া লয় এবং এই সকল কার্যকলাপ অব্যাহত রাখিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যক্তিবর্গ সংগ্রহ করিয়া লয়। উভয়বিধ

উপাদানগুলির সংমিশ্রণে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষিত হওয়া না হওয়ার উপরেই তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করে।

পূত পবিত্র তমুদ্দন গঠনে অপরিহার্য বিষয়সমুহ

এখন এই সমস্যাটির যাচাই পর্যালোচনা করিয়া আমাদের অবগত হওয়া দরকার যে একটি পূণ্যপূত তমদ্দুনের জন্য নারীপুরুষের পাশবিক ও মানবিক সম্পর্কের সুনামঞ্জস্য ও প্রকৃতিগত সংমিশ্রণ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? উপরন্তু ইহাও অবগত হওয়া দরকার যে, এই সংমিশ্রণে সামঞ্জস্য বিধানের কোন কোন ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তমুদ্দন বিশৃংখল হইয়া পড়ে।

১. যৌনবাসনায় মিতাচার

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য প্রশ্ন এই যে, এই যৌন বাসনা ও আকর্ষণ কিভাবে সংযত রাখা যায়। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবের মধ্যে এই বাসনা অন্যান্য জীবজন্তু হইতে অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। শুধু যে মানবদেহের অভ্যন্তরেই যৌন উদ্দীপক শক্তি প্রবল রহিয়াছে, তাহা নহে, বরং বিশাল বহির্জগতেরও চতুর্দিকে অফুরন্ত যৌন উত্তেজক উপাদানসমুহ ছড়াইয়া আছে। স্বয়ং প্রকৃতি সে সকল উপাদান এত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত রাখিয়াছে, উহাকে যদি মানুষ মনোযোগ সহকারে তাহার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা বর্ধিত ও উন্নত করিবার উপায় অবলম্বন করে এবং এমন এক তমদ্দুন গ্রহণ করে, যাহাতে তাহার যৌনতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে ও তৎপর সেই তৃষ্ণা মিটাইবার সহজ পন্থা নির্ণয় করিতে থাকে, তাহা হইলে এমতাবস্থায় উহা অবশ্যম্ভাবীরূপে বাঞ্ছিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইবে। মানবের পাশবিক উপাদান মানবিক উপাদানের উপর জয়ী হইবে এবং এই পাশবিক দানব তাহার মানবতা ও তমদ্দুন উভয়কেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

যৌন সম্পর্ক তাহার সূচনা ও উত্তেজক বিষয়সমূহের প্রতিটিকেই প্রকৃতি মধুর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই ইংগিত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি এবম্প্রকার মধুরতর আস্বাদনকে নিছক স্বীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ তমদ্দুন গঠনের জন্যই ব্যবহার করিয়াছে। এই আস্বাদ সীমাতিরিক্ত হইলে এবং মানুষ তাহার প্রতি বিভোর হইয়া পড়িলে তাহা শুধু তমদ্দুনই ধ্বংস করিবে না, বরং তাহা

মানুষেরও ধ্বংসের কারণ হইতে পারে, হইতেছে এবং অতীতেও বহুবার হইয়াছে।

যে সকল জাতি ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের নিদর্শনাবলী ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখুন। যৌন উন্মাদনা তাহাদের মধ্যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের সাহিত্য এই ধরনের উত্তেজনামূলক প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের ভাবধারা, গল্পকাহিনী, কবিতাবলী, চিত্রাদি, প্রতিমূর্তি, উপাসনালয়, গৃহাদি প্রভৃতি সকল কিছুই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে সকল জাতি বর্তমানে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের অবস্থাও অবলোকন করুন। তাহারা তাহাদের যৌন উন্মাদনাকে শিল্প, রস-সাহিত্য, সৌন্দর্যস্বাদ প্রভৃতি যে কোন সুন্দর ও নির্দোষ নামে অভিহিত করুক না কেন, ব্যাখ্যার হের ফের দ্বারা প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহার অর্থ কি এই নয় যে, সমাজে নারী, নারী অপেক্ষা পুরুষের সংগ লাভ এবং পুরুষ, পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংগ লাভের জন্য উদগ্রীব? নারী-পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জার স্পৃহা বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? ইহার কি কারণ হইতে পারে যে, নারী পুরুষের মিশ্র সমাজে নারীর দেহ বস্ত্রহীন হইয়া পড়িতেছে? ইহা কোন্ বস্তু, যাহার জন্য নারী তাহার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ উন্মুক্ত করিয়া জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে এবং পুরুষের পক্ষ হইতে 'আরও চাই, আরও চাই' দাবি উত্থিত হইতেছে? ইহার কি তাৎপর্য যে, নগ্নচিত্র, নগ্ন প্রতিমূর্তি, নগ্ন নৃত্য সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হইতেছে? ইহারই কি কারণ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সিনেমায় প্রেম-প্রণয়ের রসাস্বাদ পাওয়া না যায় এবং তাহার মধ্যে বচন ও ক্রিয়ায় যৌন-সম্পর্কের সূত্রপাত না হয়, ততক্ষণ তাহাতে কোন আনন্দই পাওয়া যায় না? এই সকল এবং অনুরূপ আরও বহুবিধ দৃশ্যাবলী যৌন উন্মাদনার জন্য নহে তো কিসের জন্য ? যে তমদ্দুনে এইরূপ অসমঞ্জস যৌন উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহার পরিণাম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

এইরূপ পরিবেশে যৌনবাসনার প্রাবল্য, উপর্যুপরি উত্তেজনা ও প্রতিনিয়ত যৌনক্রিয়ার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বৈকল্য ঘটে, চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত ও

বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, অশ্লীলতা বাড়িয়া চলে, যৌনব্যাধির বিস্তার লাভ ঘটে, গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রূণ ও প্রসূত হত্যার আন্দোলন শুরু হয়।[১]

নারী-পুরুষ পশুর ন্যায় যৌনসংমিলনে লিপ্ত হইতে থাকে। প্রকৃতি তাহাদিগকে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা যে অধিকতর যৌনবাসনা দান করিয়াছে, তাহারা তাহাকে প্রকৃতির অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কার্যে ব্যবহার করে এবং তাহাদের পশুত্ব যাবতীয় জীবজন্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়। এমনকি বানর ও নরছাগ তাহাদের নিকট হার মানে। এই ধরনের প্রবল পশু প্রবৃত্তি মানবীয় তাহ্যীব-তমদ্দুন, এমন কি গোটা মানবতাকে ধ্বংস করিয়া দিবে সন্দেহ নাই। যাহারা ইহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে, তাহাদের নৈতিক অধপতন তাহাদিগকে এতখানি নিম্নগামী করিয়া দিবে যে, উহা হইতে আর উত্থানের কোন আশাই থাকিবে না।

অনুরূপভাবে যে তমদ্দুনে স্বাভাবিক প্রয়োজনের পরিবর্তে চরম ন্যূনতা অবলম্বন করা হইবে, সেখানেও একই পরিণতি ঘটিবে। যৌনবাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া সীমা অতিক্রম করা যেমন ক্ষতিকর, তদ্রূপ উহাকে অতিমাত্রায়

---

১. জনৈক ডাক্তার বলেন, "সাবালকত্বের প্রারম্ভকাল বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। মন ও দেহের ক্রিয়াকলাপে সেই সময়ে এক বিপ্লবী অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সকল দিক দিয়া তাহা বিকশিত ও পরিস্ফুট হয়। সেই সময়ে এই সকল পরিবর্তন সহ্য করিবার জন্য এবং সে সকল বিকাশ ও পরিস্ফুটন লাভ করিতে সর্বশক্তির প্রয়োজন হয়। এইজন্য তখন মানুষের মধ্যে রোগের প্রতিরোধশক্তি অতি অল্প থাকে। সাধারণ দৈহিক বিকাশ ও পরিস্ফুটন, অংগ-প্রত্যংগের উন্নতি ও বর্ধন এবং মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনসমূহের জন্য যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, যাহার পর মানুষ শৈশব হইতে যৌবনে পদার্পণ করে, তাহা মানবদেহে ক্লান্তি আনয়ন করে। কারণ এই সময়ে মানবদেহ চরম চেষ্টা চরিত্রে নিমগ্ন থাকে। এই অবস্থায় তাহার উপর অস্বাভাবিক বোঝা চাপান সংগত হইবে না, বিশেষ করিয়া যৌনক্রিয়া এবং যৌন উত্তেজনা তাহার জন্য মারাত্মক হইবে।'

অপর একজন বিখ্যাত জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ বলেন, যৌন অংগসমূহ একটা চরম সুখ-তৃপ্তি ও আবেগ উত্তেজনার অসাধারণ অনুভূতির সঞ্চার করে বলিয়া ইহারা আমাদের মানসিক শক্তিরও একটা বিরাট অংশের ক্ষতি সাধনে সর্বদা প্রস্তুত হয়। তাহারা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিলে মানুষকে তামাদ্দুনিক সেবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগে বিভোর করিয়া রাখিবে। সামান্য অসাবধানতার জন্য মানুষের যৌনজীবনকে ভারসাম্যহীন করত মংগলদায়ক করার পরিবর্তে ক্ষতিকারক করিয়া দিবে। এই বিপদের প্রতিরোধ করাই শিক্ষার মহান উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

দমিত করাও ক্ষতিকর। যে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা মানুষকে ব্রহ্মচারী ও সংসারত্যাগী বানাইতে চায়, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু প্রকৃতি কখনও তাহার প্রতিপক্ষের দ্বারা পরাজিত হয় না, বরং তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। ইহা অতি সত্য যে, প্রকৃত সন্ন্যাস ধর্মের ভিত্তিতে কোন তমদ্দুন গঠিত হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে উহা তাহযীব-তমদ্দুন গঠনের পরিপন্থী। অবশ্য সন্ন্যাস মতবাদকে মনের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় এমন এক নিষ্কাম পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি করা যাইতে পারে যেখানে যৌন সম্পর্ককে একটি গর্হিত, ঘৃণা ও কুরুচিকর বস্তু মনে করা হইবে। ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই চারিত্রিক মান মনে করা হইবে এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে এই বাসনা দমিত করিবার চেষ্টা করা হইবে। কিন্ত যৌন-বাসনা দমিত করার অর্থ মানবতাকে দমিত করা। উহা একাকী দমিত হইবে না, বরং মানবের প্রতিভা, কর্মশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যম ও সাহস, সংকল্প ও বীরত্ব সকল কিছু সংগে করিয়াই দমিত হইবে। উহা দমিত হওয়ার ফলে মানবের সমগ্র শক্তি অবশ হইয়া পড়িবে। তাহার রক্তকণা শীতল ও জমাট হইয়া যাইবে, যাহা উদ্দীপিত করিবার কোন ক্ষমতাই তাহার মধ্যে থাকিবে না। কারণ এই যৌনশক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠতম উদ্দীপক শক্তি।

অতএব যৌনবাসনাকে সীমাতিক্রম ও চরম ন্যূনতা হইতে রক্ষা করিয়া এক মধ্যবর্তী সুসমঞ্জস্য আবস্থার মধ্যে আনয়ন করা এবং তাহাকে উপযোগী নিয়ম-নীতির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করাই একটি সৎ সাধু তমদ্দুনের প্রাথমিক কর্তব্য হইবে। সামাজিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, একদিকে মানুষ তাহার বাসনা ও সম্ভোগ-পরায়ণতার দ্বারা যে সকল অস্বাভাবিক উত্তেজনা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহার সকলই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অপর দিকে স্বাভাবিক উত্তেজনা প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রকৃতির অভীপ্সিত সকল পন্থা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২. পারিবারিক ভিত্তি স্থাপন

এখন স্বতই এই প্রশ্ন মনের কোণে উদিত হয় যে, প্রকৃতির ইচ্ছা কি? এই ব্যাপারে কি আমাদিগকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা হইয়াছে যে, চক্ষু বন্ধ করত ইচ্ছামত কার্য করিব এবং তাহাকেই প্রকৃতির বাসনা বলিয়া উল্লেখ করিব? বরং প্রকৃতির নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করিলে আমরা কি তাহার

অভিপ্রায় জানিতে পারিব না? সম্ভবত অনেকেই প্রথমোক্ত মতই পোষণ করে। এইজন্যই প্রকৃতির নিদর্শনাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই যখন উহা ঘটিয়া যায়, তাহাকে ইচ্ছামত প্রকৃতির অভিপ্রায় বলিয়া উক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু একজন তথ্যানুসন্ধিৎসু যখন তথ্যের সন্ধানে বাহির হয়, তখন কয়েক পদ অগ্রসর হওয়ার পরই তাহার মনে হয় যেন প্রকৃতি তাহার অভিপ্রায়ের দিকে স্পষ্ট অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে।

ইহা জানা কথা যে, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে সৃষ্টি করত উভয়ের মধ্যে যৌন আকর্ষণ ঢালিয়া দেওয়ার পশ্চাতে প্রকৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে বংশ বৃদ্ধি করা। কিন্তু মানুষের নিকট প্রকৃতির শুধু ইহাই একমাত্র দাবি নহে; বরং প্রকৃতি মানুষের নিকটে ইহা ব্যতীত আরও কিছু প্রত্যাশা করে। সামান্য চিন্তা-গবেষণা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, সেই দাবি কি এবং তাহা কোন্ ধরনের।

সর্বপ্রথম যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, যাবতীয় জীবজন্তু ব্যতীত একমাত্র মানব সন্তানই রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য অধিক সময়, শ্রম ও মনোযোগ দাবি করে। যদি তাহাকে একটি স্বতন্ত্র প্রাণী হিসাবেই ধরা যায়, তবুও আমরা দেখিতে পাই যে, নিজের জৈবিক চাহিদা মিটাইবার জন্য অর্থাৎ আহারের সংস্থান ও আত্মরক্ষা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া যায়। প্রথম দুই-তিন বৎসর তো সে এত অসহায় থাকে যে, মাতার প্রতিনিয়ত লালন-পালন ব্যতীত সে বাঁচিয়াই থাকিতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ বর্বরতার যে কোন প্রাথমিক পর্যায়ে থাকুক না কেন, সে নিছক পশু নহে। কোন না কোন স্তরের সভ্যতা তাহার জীবনের জন্য অনিবার্য হইয়া পড়ে। অতপর এই সভ্যতার কারণে সন্তানাদির প্রতিপালনের স্বাভাবিক দাবির সংগে আরও দুইটি দাবি সংযোজিত হয়। প্রথমত, যতটুকু তামাদ্দুনিক উপায়-উপাদান প্রতিপালনকারী লাভ করিতে পারে তাহার সমুদয়ই সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে। দ্বিতীয়ত, সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যেন, যে তামাদ্দুনিক পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তথাকার কার্য পরিচালনা করিবার এবং পূর্ববর্তিগণের স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য সে প্রস্তুত হইতে পারে। অতপর তমদ্দুন যতই উন্নতি

লাভ করিতে থাকিবে, এই উভয় দাবি ততই গুরুতর বোঝাস্বরূপ হইতে থাকিবে। এক দিকে সন্তান প্রতিপালনের আবশ্যকীয় উপায়-উপাদান ও অনিবার্য দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়িতে থাকিবে, অপরদিকে তমদ্দুন শুধু যে তাহার অস্তিত্বের জন্য স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মী দাবি করে তাহাই নহে, বরং তাহার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির জন্য ইহাও কামনা করে যে, বর্তমান বংশধর হইতে যেন ভবিষ্যত বংশধর উৎকৃষ্টত হইতে পারে অর্থাৎ অন্য কথায় প্রত্যেক শিশুর প্রতিপালক শিশুকে আপন হইতে উৎকৃষ্টতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। ইহা এক চরম ত্যাগ, যাহা মানুষকে তাহার আত্মস্বার্থ বলিদান করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

এইসব হইতেছে মানব প্রকৃতির দাবি। এই দাবিসমূহের প্রথম মুখপাত্র নারী। পুরুষ কিয়ৎকালের জন্য নারীর সংগলাভের পর তাহার দায়িত্ব হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই সংগ লাভের স্বাভাবিক পরিণাম নারী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এমন কি আজীবন ভোগ করিতে থাকে। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে অন্তত পাঁচ বৎসর কাল যাবত উক্ত সংগ লাভের পরিণাম ফল তাহাকে অবিরাম ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যদি তমদ্দুনের পরিপূর্ণ দাবি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুহূর্তকালের জন্য যে নারী পুরুষের সংগ লাভের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল, তাহাকে তাহার গুরু দায়িত্ব সুদীর্ঘ পনর বৎসর যাবত বহন করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, একটি যৌথ ক্রিয়ার দায়িত্ব গ্রহণে শুধু একপক্ষ কেমন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে? যতক্ষণ নারী তাহার অংশীদারের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা হইতে মুক্ত না হইয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বীয় সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হইয়াছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বীয় জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইতে অব্যাহতি দেওয়া না হইয়াছে, সে কেমন করিয়া এত বড় গুরু দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত হইবে? যে নারীর কোন অভিভাবক বা রক্ষক নাই, তাহার জন্য গর্ভসঞ্চার একটি দুর্ঘটনা, একটি বিপদ–একটি অতি সাংঘাতিক বিপদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করার বাসনা তাহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নতুবা এহেন গর্ভসঞ্চারকে সে কেমন করিয়া স্বাগতম জানাইতে পারে?

যদি মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং তমদ্দুনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয়, তাহা হইলে ইহা অনিবার্য যে, পুরুষ নারীর উপরে কোন গুরুভার চাপাইয়া দিলে সেই ভার বহন করিবার জন্য পুরুষও নারীর অংশীদার হইবে। কিন্তু এই অংশ গ্রহণে পুরুষকে কেমন করিয়া সম্মত করা যাইতে পারে? জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রকৃতির যে অনিবার্য নির্দেশ, সে বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে পুরুষের যাহা করণীয় তাহা সে রতিগমন করত মুহূর্তের মধ্যেই সমাধা করে। অতপর সে গুরুভার একাকী নারীর উপরেই রহিয়া যায় এবং তাহা কিছুতেই পুরুষের উপর প্রযোজ্য হয় না। যৌন আকর্ষণের দিক দিয়া চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে, ইহা পুরুষকে সেই নারীর সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে বাধ্য করে না। পুরুষ ইচ্ছা করিলে এক নারীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এইভাবে সে প্রতি ভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়া যাইতে পারে। অতএব যদি এ সকল কার্য তাহার ইচ্ছার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে যে স্বেচ্ছায় পরবর্তী গুরুভার বহন করিতে প্রস্তুত থাকবে, তাহার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। এমতাবস্থায় এমন কোন বস্তু আছে যে, তাহাকে তাহার শ্রম ও উপার্জন সেই নারী ও তাহার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করিতে বাধ্য করিবে? অন্য একটি সুন্দরী কুমারীর পরিবর্তে কেনই বা এই স্ফীতগর্ভ রমণীর প্রতি তাহার অনুরাগ থাকিবে? অযথা একটি অপদার্থ গোশ্‌তপিন্ড কেন সে আপন ব্যায়ে প্রতিপালন করিবে? অতপর নবজাত শিশুর ক্রন্দনচীৎকারে কেন সে তাহার নিদ্রা হারাম করিয়া দিবে? এই ক্ষুদ্র শয়তানটি যে প্রতিটি বস্তু ভাঙিয়া চুরমার করে, সারা বাড়ী নোংরা করিয়া ফেলে এবং কাহারও কোন বাধা নিষেধই মানিতে চাহে না-কেন তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে?

এই সমস্যার কিয়দংশ সমাধান প্রকৃতি স্বয়ং দান করিয়াছে। সে নারীর মধ্যে সৌন্দর্য, মাধুর্য, মনভুলানো শক্তি ও প্রেমানুরাগের জন্য ত্যাগ ও উৎসর্গ করিবার যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। এইসব অস্ত্র প্রয়োগে সে পুরুষের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা জয় করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লইতে পারে। উপরন্তু প্রকৃতি মানব শিশুর মধ্যেও এমন এক বিস্ময়কর বশীকরণ শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে যে, সে তাহার কষ্টদায়ক ধ্বংসাত্মক ও দুষ্টামিপূর্ণ স্বভাব-

চরিত্র সত্ত্বেও পিতামাতাকে স্নেহবাৎসল্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে। নৈতিক, তামাদ্দুনিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ–কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে মানুষকে বাধ্য করিবার জন্য শুধু এই সকলই যথেষ্ট নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের সংগে তাহার চিরদুশমন শয়তান লাগিয়াই আছে। সে মানুষকে স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা সর্বদা করিয়াই থাকে। প্রত্যেক যুগের প্রতিটি জাতির লোককে পথ ভ্রষ্ট করিবার জন্য তাহার প্রতারণার ঝুলিতে অফুরন্ত যুক্তি–প্রমাণাদি ও প্ররোচনা আছে।

ইহা ধর্মের এক অলৌকিক শক্তি যে, ইহা নরনারীকে জাতি ও তমদ্দুনের জন্য ত্যাগ ও উৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে। ইহা মানবরূপী স্বার্থান্ধ পশুকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে। একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণই প্রকৃতির ইচ্ছা সঠিক অবগত হইয়া নারী–পুরুষের মধ্যে যৌন–সম্পর্ক এবং তামাদ্দুনিক সহযোগিতার সঠিক পন্থা বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদেরই শিক্ষা ও পথনির্দেশেই পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে বিবাহের প্রচলন হইয়াছে। তাঁহাদেরই প্রচারিত নৈতিক ভিত্তির উপরেই মানুষের মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক কর্মকুশলতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, সে ইহার জন্য দুঃখ কষ্ট ও ক্ষয়–ক্ষতি সহ্য করিতে পারে। নতুবা প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, পিতামাতা অপেক্ষা সন্তানের বৃহত্তম শত্রু কে হইতে পারে? নবীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম–কানুনের দ্বারা পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যাহার সুদৃঢ় হস্তমুষ্ঠি বালক–বালিকাকে এহেন দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও এই প্রকার যৌথ কার্যের জন্য বাধ্য করে। নতুবা যৌবনের পাশবিক দাবি এত প্রবল হয় যে, কোন বাহ্যিক অনুশাসন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র নৈতিক দায়িত্ববোধ তাহাকে যৌন স্বেচ্ছাচারিতা হইতে নিরস্ত করিতে পারে না। যৌন অনুরাগ স্বতই সামাজিকতা বিরোধী [anti-social]। ইহা স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতার অনুরাগ জন্মায়। ইহার মধ্যে স্থিতিশীলতা নাই, দায়িত্বানুভূতি নাই। ইহা শুধু সাময়িক সুখ–সম্ভোগের জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এই দানবকে বশীভূত করিয়া তাহার এমন এক সমাজ–জীবনের সেবা গ্রহণ সহজসাধ্য নহে যাহা ধৈর্য, সহনশীলতা, শ্রম, ত্যাগ–তিতিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও পারিবারিক ব্যবস্থাই এই দানবকে ক্ষুদ্র বোতলে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার নিকট হইতে পাপিষ্ঠতা ও উচ্ছৃংখলতার দালালি [agency] কাড়িয়া লয়। অতপর

জীবন গঠনের জন্য অপরিহার্য নারী–পুরুষের এহেন অবিরাম সহযোগিতা ও যৌথকার্যের এজেন্ট নিযুক্ত করে। ইহা না হইলে মানুষের তামাদ্দুনিক জীবন শেষ হইয়া যাইবে; মানুষ পশুর মত জীবন যাপন করিবে এবং অবশেষে মানব জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

অতএব যৌনবাসনাকে স্বেচ্ছাচার ও অমিতাচার হইতে মুক্ত করত তাহার প্রাকৃতিক দাবি পূরণকল্পে স্বয়ং প্রকৃতি যে পন্থা উন্মুক্ত দেখিতে চায়, তাহা শুধু এই যে, নারী–পুরুষের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে চিরন্তন মিলন হউক এবং এই মিলনের দ্বারা পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হউক। তমদ্দুনের ন্যায় একটি বিরাট ও ব্যাপক কারখানা চালাইবার জন্য যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তাহা পরিবারের এই ক্ষুদ্র ওয়ার্কশপে [কারখানা] তৈরী করা হয়। বালক–বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিবার সংগে সংগেই ওয়ার্কশপের পরিচালকগণ তাহাদের যথাসম্ভব সুষ্ঠু দাম্পত্য ব্যবস্থার চিন্তা করেন যেন তাহাদের দাম্পত্য মিলনের ফলে উৎকৃষ্টতর বংশধর জন্মলাভ করিতে পারে। অতপর তাহাদের পরে যে বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, এই ওয়ার্কশপের প্রত্যেক কর্মী পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত তাহাদিগকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্টতর করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে জীবনের প্রথম মুহূর্ত শুরু করিবার সংগে সংগেই নবপ্রসূত সন্তান পারিবারিক সীমানার মধ্যে প্রেম, যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাদীক্ষার এমন এক পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে যেন স্বীয় বিকাশ লাভের জন্য সে 'আবে–হায়াত' [সঞ্জীবনী সুধা] লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পরিবারের মধ্যেই সন্তান এমন দুই ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করে যাহারা শুধু তাহাকে ভালই বাসে না, বরং অন্তরে এই অনুরাগ পোষণ করে যে, যেরূপ মর্যাদায় সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা সে লাভ করুক। পৃথিবীতে একমাত্র পিতামাতার সন্তানকে সর্বদিক দিয়া উন্নততর ও অধিকতর সুখী ও সমৃদ্ধ দেখুক। এইভাবে তাহারা অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতে ভবিষ্যত বংশধরকে বর্তমান বংশধর হইতে উন্নততর করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের এই চেষ্টার মধ্যে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। তাহারা নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, আপন সন্তানাদিরই কল্যাণ কামনা করে এবং তাহাদের জীবন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত দেখার মধ্যেই স্বীয় শ্রমের পারিতোষিক লাভ করে। পরিবারের এই কারখানায় এমন একনিষ্ঠ শ্রমিক ও নিঃস্বার্থ কর্মী কোথায় পাওয়া যাইবে যাহারা মানব জাতির কল্যাণহেতু শুধু

অবৈতনিক শ্রমই করে না, বরং তাহাদের সময়, শান্তি, শক্তি, যোগ্যতা ও শ্রমলব্ধ সকল কিছু তাহাদেরই সেবার জন্য ব্যয় করিতে পারে? এমন আর কে আছে যে এই কাজের জন্য তাহার প্রতিটি মূল্যবান বস্তু উৎসর্গ করিতে প্রস্তু হয়, অথচ তাহার ফলভোগ অপরে করে? যে অপরের জন্য উৎকৃষ্ট কর্মী ও খাদেম তৈরী করিয়া লওয়ার মধ্যে আপন শ্রমের পারিতোষকি লাভ করে? ইহা অপেক্ষা মানবতার পবিত্রতর ও মহত্তর আকাঙক্ষা আর কিছু হইতে পারে কি?

প্রতি বৎসর মানব জাতির অস্তিত্ব ও মানবীয় তমদ্দুনের সংযোগ–পরম্পরা ও উন্নতির জন্য এইরূপ লক্ষ কোটি দম্পতির প্রয়োজন, যাহারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এই মহৎ সেবার দায়িত্বে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই ধরনের কর্মক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে। পৃথিবীতে যে বিরাট কারখানা চলিতেছে, তাহা একমাত্র এইভাবেই চলিতে পারে, যদি এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবক উপর্যপরি গঠিত হয় এবং এই কারখানা চালাইবার জন্য তাহারা লোক সংগ্রহ করিয়া দেয়। যদি নূতন লোক ভর্তি না হয় এবং স্বাভাবিক কারণে পুরাতন কর্মী কাজের অনুপযোগী হইয়া পড়ে তাহা হইলে কাজের লোক ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। একদা এই গঠনকারী সত্তা বিকল অবস্থায় পড়িয়া রহিবে। তমদ্দুনের এই মেশিনকে যাহারা পরিচালিত করিতেছে তাহাদের কর্তব্য শুধু ইহাই নহে যে, তাহারা নিজেদের জীবনেই ইহা চালাইতে থাকিবে, বরং ইহাও তাহাদের কর্তব্য যে, তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবার লোকও তাহারা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিবাহ যে শুধু যৌন–অনুরাগ প্রশমিত করিবার একটি বৈধ পন্থামাত্র তাহা নাহে, বরং ইহা একটি সামাজিক অপরিহার্য কর্তব্য, ব্যক্তির উপর সমাজের স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং ব্যক্তিকে এ অধিকার কখনও দেওয়া যাইতে পারে না যে, সে বিবাহ করা না করার সিদ্ধান্ত নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখিবে। যাহারা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে, তাহারা সমাজের শুধু পরাংগপুষ্ট জীবই নহে, বরং বিশ্বাসঘাতক ও লুন্টনকারীও বটে। জগতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জীবনের প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিবার পর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিবার সময় পর্যন্ত ঐ সকল অফুরন্ত সম্পদ ভোগ করিতে থাকে,

যাহা পূর্ববর্তিগণ সঞ্চয় করিয়া রাখে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির বদৌলতেই সে জীবন ধারণ করার, প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হওয়ার এবং মানবতার বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। এই সময়ের মধ্যে সে শুধু গ্রহণই করিতে থাকে, কিছু দান করে না। সমাজ তাহার অপূর্ণ শক্তিকে পূর্ণত্ব দান করিবার জন্যই তাহার সম্পদ ও সময় ব্যয় করিয়া থাকে, এই আশায় যে, যখন সে স্বয়ং কিছু দান করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবে তখন নিশ্চয়ই তাহা করিবে। এখন যদি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাবি করিয়া বলে যে, সে শুধু তাহার আপন প্রবৃত্তিই চরিতার্থ করিবে, কিন্তু এই প্রবৃত্তি সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে না, তাহা হইলে সে সমাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণাই করে। তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অন্যায় ও অবিচারই বলিতে হইবে। সমাজের মধ্যে যদি কণামাত্রও চেতনাবোধ থাকে, তাহা হইলে এই অপরাধীকে ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা অথবা কোন সম্মানিত ব্যক্তি মনে করিবার পরিবর্তে একটি চোর, দস্যু ও প্রতারকই মনে করিবে। আমরা ইচ্ছায়ই হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, ঐ সমস্ত ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছি, যাহা আমাদের পূর্ববর্তিগণ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা এই উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছি, তাহার ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে পারি অথবা নাও পারি? মানব জাতির এহেন সম্পদের উত্তরাধিকারী কোন ভবিষ্যত বংশধর তৈরি করি বা না করি? আমাদিগকে যেভাবে গঠন করা হইয়াছে, সেইভাবে এই সকল সম্পদ সামলাইবার জন্য দ্বিতীয় একটি দল গঠন করি বা না করি?

৩. যৌন লাম্পট্যের মূলোৎপাটন

বিবাহ ও পারিবারিক ভিত্তি স্থাপনের সংগে সংগে ইহারও প্রয়োজন যে, বৈবাহিক দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগের যৌন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। কারণ ইহা না করিলে প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না, যাহার জন্য সে বিবাহ ও পারিবারিক ভিত্তি স্থাপনের দাবি করে।

প্রাচীন জাহেলিয়াতের ন্যায়, বর্তমান জহেলিয়াতের যুগেও অধিকাংশ লোক ব্যভিচারকে একটি প্রাকৃতিক কর্ম মনে করিয়া থাকে। তাহাদের মতে বিবাহ

তমুদ্দন কর্তৃক আবিষ্কৃত নিছক একটি কৃত্রিম ও অতিরিক্ত বস্তু মাত্র। তাহাদের ধারণা এই যে, প্রকৃতি যেমন প্রতিটি ছাগীর জন্য ছাগ এবং প্রতিটি কুকুরীর জন্য কুকুর সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি প্রত্যেক নারীর জন্য পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, যখন ইচ্ছা ও সুযোগ হইবে এবং যখন নারী–পুরুষ পরস্পর সম্মত হইবে, তখন পশুদের মধ্যে যেমন যৌনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমনি তাহাদের মধ্যেও হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মানবীয় প্রকৃতির নিতান্তই ভুল ব্যাখ্যা। তাহারা মানুষকে নিছক পশুই মনে করিয়াছে। অতএব যখনই তাহারা 'প্রকৃতি' শব্দ ব্যবহার করে, তখন তাহার দ্বারা মানবীয় প্রকৃতির পরিবর্তে পাশবিক প্রকৃতিই বুঝায়। যে ব্যাপক যৌন সম্পর্ককে তাহারা 'প্রাকৃতিক' বলে, তাহা পশুদের জন্য কখনই প্রাকৃতিক হইলেও মানবের জন্য প্রাকৃতিক নহে। ইহা শুধু মানব–প্রকৃতির পরিপন্থী নহে, বরং শেষ পরিণতির দিক দিয়া বিচার করিলে যে পাশবিক প্রকৃতি মানুষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহারও পরিপন্থী। ইহার কারণ এই যে, মানবের মধ্যে মানবত্ব ও পশুত্ব দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু নহে। প্রকৃতপক্ষে একই সত্তার ভিতরে উভয়ের সমন্বয়ে একই ব্যক্তিত্ব গঠন করে এবং উভয়ের প্রয়োজনাবলী পরস্পর এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটি উপেক্ষিত হইলে অপরটি আপনা–আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাহ্যত ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ব্যভিচারের দ্বারা পাশবিক প্রকৃতির প্রয়োজন তো পূরণ হয়। কারণ বংশ বৃদ্ধি ও মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যও একমাত্র যৌনক্রিয়ার দ্বারাই পূর্ণ হয়, তাহা বিবাহের মাধ্যমেই হউক কিংবা তাহা ব্যতিরেকেই হউক। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এই কার্য যেমন মানবীয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যাহত করে, তেমনই পাশবিক প্রকৃতির উদ্দেশ্যও ব্যাহত করিয়া দেয়। মানব প্রকৃতি দাবি করে যে, যৌন সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী হউক যাহাতে পিতামাতা মিলিতভাবে সন্তান প্রতিপালন করিতে পারে এবং পরিমিত কাল পর্যন্ত পুরুষ শুধু সন্তানের নহে, সন্তানের মাতারও পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। যদি পুরুষের এই বিশ্বাস না জন্মে যে, সন্তান তাহার ঔরসজাত, তাহা হইলে তাহা প্রতিপালনের জন্য সে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার আদৌ করিবে না এবং উক্ত সন্তান তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, ইহাও সে মানিয়া লইবে না। এইরূপ যদি নারীরও এই বিশ্বাস না জন্মে

যে, যে পুরুষ তাহার গর্ভসঞ্চার করিতেছে সে তাহার ও তাহার সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত তাহা হইলে সে নারীও গর্ভ ধারণের বিপদ ঘাড়ে লইতে সম্মত হইবে না। সন্তান প্রতিপালন ব্যাপারে যদি পিতামাতা সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিবে না যাহা দ্বারা সে মানবীয় তমদ্দুনের কোন উপযোগী কর্মী হইতে পারে। এই সবই হইতেছে মানব-প্রকৃতির চাহিদা। এই সকল চাহিদা পদদলিত করিয়া যখন নারী-পুরুষ নিছক পশুর ন্যায় সাময়িক সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে পশু প্রকৃতির চাহিদা বা প্রয়োজনকেও [অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন ও বংশ বৃদ্ধি]অবহেলা করে। কারণ সে সময়ে সন্তান উৎপাদন ও বংশ বৃদ্ধির দিকে তাহার কোন লক্ষ্য থাকে না এবং থাকিতেও পারে না। সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে যৌন-আস্বাদের বাসনার জন্যই হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতির ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আধুনিক জাহেলিয়াত যুগের ধ্বজাধারিগণের নিজেদেরই এ দুর্বলতা আছে। এইজন্য তাহারা আর একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া বলে যে, যদি সমাজের দুইটি লোক মিলিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত আনন্দ-সম্ভোগে কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহাতে সমাজের কি ক্ষতি করা হয় যে, সে ইহাতে হস্তক্ষেপ করে? যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করে অথবা প্রতারণা প্রবঞ্চনা করে কিংবা সামাজিক কোন বিপদ-বিসম্বাদের কারণ ঘটায়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অবশ্য সমাজের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ইহার কোনটাই সংঘটিত হয় না এবং কেবল দুই ব্যক্তির আনন্দ উপভোগেরই বিষয় হয়, তখন তাহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিবার কি অধিকার সমাজের আছে? এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে [Private affairs] যদি হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার এই ধারণা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এক অজ্ঞতা বিশেষ, যাহা জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের প্রথম কিরণ প্রতিভাত হওয়ার সংগে সংগে বিদূরিত হয়। সামান্য চিন্তা-গবেষণার পরই লোকে ইহা অনুধাবন করিতে পারে যে, ব্যক্তির জন্য যে ধরনের স্বাধীনতার দাবি করা হইতেছে, সমাজ-জীবনে তাহার কোন স্থান নাই। এইরূপ স্বাধীনতা যাহারা কামনা

করে, বনে-জংগলে গমন করত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করাই তাহাদের শ্রেয়। মানব সমাজ প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা ও সম্বন্ধ-সম্পর্কের এমন এক জাল, যাহার সহিত প্রত্যেক মানুষের জীবন অন্যান্য অসংখ্য মানবের সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকেই অন্যান্যের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনই অন্যান্যের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্ক যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কোন কার্যকেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং একক বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না, এমন কোন ব্যক্তিগত কার্যের ধারণাই করা যাইতে পারে না। অংগ-প্রত্যাংগের ক্রিয়া তো দূরের কথা, মনের কোণে লুক্কায়িত এমন কোন বাসনাও নাই, যাহা আমাদের অস্তিত্বের উপরে এবং অতপর প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্যান্যের উপরে ক্রিয়াশীল না হয়। আমাদের মন ও দেহের এক একটি ক্রিয়ার পরিণাম ফল আমাদের নিকট হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এত দূর-দূরান্তে গিয়া পৌছে যে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। এমতাবস্থায় ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে, কোন ব্যক্তি বিশেষের আপন শক্তির ব্যবহার সে ব্যতিরেকে অন্য কাহারও উপর প্রভাব বিস্তার করে না? অতএব, ইহাতে কি অন্য কাহারো কিছুই করিবার নাই এবং এই ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাই কি উচিত? যদি আমার এমন স্বাধীনতা না থাকে যে, আমার হাতের কাষ্ঠখন্ড যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ঘুরাইতে থাকিব, আমার পা দুইটিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়া যথা ইচ্ছা তথা গমন করিব, আপন শকটকে যথেচ্ছ চালাইব এবং আপন গৃহে ইচ্ছামত আবর্জনা স্তূপীকৃত করিব এবং যদি এ ধরনের অন্যান্য অগণিত ব্যক্তিগত কার্যকলাপ সামাজিক নিয়ম-কানুনের অধীন হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে শুধু আমার রতিক্রিয়া এমন কোন্ মর্যাদার অধিকারী হইল যে, তাহাকে কোন সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতির অধীন করা হইবে না এবং আমাকে এমন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে যে, আমার ইচ্ছামত তাহাকে নিয়োজিত করিব?

একজন পুরুষ ও একজন নারী নিভৃত স্থানে সকলের অগোচরে যে যৌনসম্ভোগ করে, সমাজ-জীবনে তাহার কোন ক্রিয়া হয় না এমন কথা শিশুসুলভতা [childish talks] মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যে সমাজের সহিত কোন ব্যক্তির পত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে, তাহার কার্যকলাপের ক্রিয়া শুধু সেই সমাজের উপরই হয় না, বরং সমগ্র মানবতার উপরই হয়। শুধু বর্তমানকালের

লোকদের উপর হয় না, বরং ভবিষ্যত বংশধরগণও ইহার পরিণাম ভোগ করে। যে সামাজিক ও সমাজতাত্ত্বিক রীতি-নীতির বন্ধনে সমগ্র মানবতা আবদ্ধ, তাহা হইতে কোন একক ব্যক্তি কোন অবস্থাতেও কোন সুরক্ষিত স্থানে পৃথকভাবে থাকিতে পারে না। সে যেমন মুক্ত মাঠে, হাটে-ঘাটে অথবা সভাসমিতিতে থাকিয়া সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত থাকে, তেমনই আবদ্ধ কক্ষে ও প্রাচীর অভ্যন্তরে সুরক্ষিত থাকিয়াও সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত থাকে। যে সময়ে নিভৃতে সে স্বীয় সন্তানোৎপাদন শক্তি একটি সাময়িক ও অপরিণামদর্শী ও আনন্দ সম্ভোগে বিনষ্ট করে, সে সময়ে সে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক জীবনে উচ্ছৃংখলতা ছড়াইতে, জাতির অধিকার ক্ষুন্ন করিতে এবং সমাজের অসংখ্য নৈতিক, বৈষয়িক ও তামাদ্দুনিক ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকে। সে আপন স্বার্থে ঐ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আঘাত করে যাহা দ্বারা সে সমাজের অংগঅংশ হিসাবে উপকৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠার স্থায়িত্বের জন্য সে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। সমাজ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে রাষ্ট্রক্ষেত্র পর্যন্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সৈন্য বিভাগ পর্যন্ত, কল-কারখানা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণাগার পর্যন্ত যতগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা একমাত্র এই বিশ্বাসে যে, ইহার দ্বারা উপকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য আপন অনিবার্য করণীয় অংশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু যখন সেই বে-ঈমান স্বীয় কামশক্তি এমন ভাবে ব্যয় করিল যে, সন্তানোৎপাদন, বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের কোন ইচ্ছাই তাহার রহিল না, তখন সে এক আঘাতে এই সমগ্র ব্যবস্থার মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। যে সামাজিক চুক্তির সহিত সে মানুষ হিসাবে জড়িত ছিল, তাহা ভংগ করিয়া ফেলিল। সে আপন দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে তাহা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। সে কোন সম্ভ্রান্ত লোক হইতে পারে না-সে একজন চোর, প্রতারক ও পরস্বপহারী। তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার অর্থ সমগ্র মানবতার প্রতি যুলুম করা।

সামাজিক জীবনে এক ব্যক্তির মর্যাদা উপলব্ধি করিবার পর নিসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের মন ও দেহে যে এক প্রকারের শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে, বরং সমগ্র মানবতার জন্য আমাদের নিকট আমানতস্বরূপ গচ্ছিত আছে। আমাদিগকে প্রতিটি শক্তির জন্য সমগ্র মানবাতর নিকটে জবাবদিহি করিতে হইবে। যদি আমরা নিজের জীবনের

অথবা শক্তিগুলির মধ্যে কোনটির অপচয় করি অথবা আপন অপকর্মের জন্য নিজের ক্ষতি সাধন করি, তাহা হইলে আমাদের এই কার্যের প্রকৃত ফল ইহা হইবে না যে, আমাদের যাহা ছিল তাহা অপচয় অথবা ক্ষতি করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ইহা এইরূপ বিবেচিত হইবে যে, সমগ্র মানব জগতের জন্য আমাদের নিকটে যাহা আমানতস্বরূপ গচ্ছিত ছিল, তাহা আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি এবং ইহা দ্বারা মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি। পৃথিবীতে আমাদের সত্তা সাক্ষ্য দেয় যে, অপরের দুঃখকষ্ট ভোগ ও দায়িত্বভার বহন করিয়া জীবনের জ্যোতিধারা আমাদের দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছে বলিয়াই আমাদের জগতে পদার্পণ করা সম্ভব হইয়াছে। অতপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষা বিভাগ আমাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে রত রহিয়াছে। লক্ষ কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্র্যব্যাদির সংস্থান হইয়াছে। যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিয়া আমাদের শক্তি–সামর্থ্য যোগাইয়াছে, শিক্ষা দানের চেষ্টা করিয়াছে এবং আমাদিগকে বর্তমান মর্যদায় উন্নীত করিয়াছে। এসবের কি এই প্রতিদান হইবে? এই কি সুবিচার হইবে যে, যে জীবন ও শক্তি–সামর্থের সৃষ্টি, স্থায়িত্ব ও পরিস্ফুটনের জন্য অপরে এতখানি অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে আমরা অযথা বিনষ্ট করিয়া ফেলি অথবা মংলগকর করিবার পরিবর্তে ক্ষতিকর করি? এই কারণেই আত্মহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞ ও দার্শনিক [নবী সঃ] হস্তমৈথুনকারীকে অভিশপ্ত বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। (ناكح اليد ملعون) হস্তমৈথুনকারী অভিশপ্ত–হাদীস। এইজন্যই সমমৈথুন অর্থাৎ লুত সম্প্রদায়ের কুকার্যকে গর্হিত অপরাধ বলা হইয়াছে। এই কারণেই ব্যবিচার, ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনও একটা সুবর্ণ মুহূর্ত নহে, বরং সমগ্র জাতির প্রতি অবিচারবিশেষ।

গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যভিচার ক্রিয়ার সহিত কত সামাজিক অনাচার ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যেমনঃ

১. সর্বপ্রথম ব্যভিচারীর যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকে। এইভাবে জনকল্যাণকর কার্যের জন্য সে শুধু তাহার দৈহিক শক্তিরই ক্ষতি সাধন করে না, বরং সমাজ ও বংশধরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রমেহ রোগ সম্পর্কে প্রত্যেক চিকিৎসকই একমত যে, ইহা দ্বারা মূত্রদ্বারে যে ক্ষত হয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরারোগ্য হয়। জনৈক চিকিৎসক মন্তব্য করিয়াছেন

যে, একবার প্রমেহ রোগ হইলে তাহা আর নিরাময় হয় না। ইহার ফলে যকৃত, মূত্রস্থলি, মল-মূত্রদ্বার প্রভৃতি অংগগুলি অধিকাংশ সময়ে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা গেঁটে বাত ও অন্যান্য রোগসমূহেরও কারণ হইয়া পড়ে। ইহাতে চিরদিনের জন্য বন্ধ্যা রোগেরও আশংকা থাকে। ইহা অপরের জন্যও সংক্রামক হইয়া পড়ে। অতপর ইহার আর এক মারাত্মক পরিণাম সিফিলিস বা গর্মি ঘা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র শারীরিক সংগঠন ইহার দ্বারা বিষাক্ত হইয়া পড়ে। আপাদমস্তক প্রতিটি অংগ প্রত্যংগে ইহার বিষক্রিয়া সংক্রমিত ইহারা পড়ে। ইহা শুধু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৈহিক শক্তিই বিনষ্ট করিয়া ফেলে না, বরং এক ব্যক্তি হইতে বিভিন্ন উপায়ে অসংখ্য অগণিত ব্যক্তির মধ্যে এই রোগের বীজাণু সংক্রমিত হইয়া পড়ে। রোগীর নিরপরাধ সন্তান সন্তুতি বংশানুক্রমে ইহার পরিণাম ফল ভোগ করিতে থাকে। দুরাচারী পিতা কয়েক মুহূর্তের যৌন সম্ভোগকে যে তাহার জীবনের একান্ত কামনীয় বস্তু মনে করিয়াছিল, তাহারই স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ সন্তান অন্ধ, বোবা, বধির অথবা উন্মাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২. প্রত্যেক ব্যভিচারী যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যভিচার ক্রিয়ার সহিত নিশ্চিতরূপে সংশ্লিষ্ট নৈতিক দুর্বলতা হইতে রক্ষা পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। নির্লজ্জতা, প্রতারণা, মিথ্যা দুরভিসন্ধি, স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব, কুপ্রবৃত্তি দমনে অক্ষমতা, অসৎ চিন্তাধারা, যৌনক্রিয়ার মজা লুটিবার মনোবৃত্তি, অস্থিরমতিত্ব, অবিশ্বাস প্রভৃতি ব্যভিচারের এমন সব নৈতিক কুফল যাহা ব্যভিচারীর মনের উপর দৃঢ় প্রতিফলিত হয়। এই সকল দোষ যে ব্যক্তি পোষণ করে, তাহার দুর্বলতার কুফল যে শুধু যৌনক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ-তাহা নহে, বরং তাহার নিকট হইতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে ইহা বিস্তার লাভ করে। সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে যদি এই দোষগুলি বিস্তার লাভ করে তাহা হইরে তাহা দ্বারা শিল্পকলা, সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারালয়, সামরিক পরিচর্যা, দেশ পরিচালনা প্রভৃতি সকল কিছুই বিপন্ন ও অচল হইয়া পড়িবে। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থামতে ব্যক্তিবর্গের এক একটি নৈতিক বৈশিষ্ট্য তো সমগ্র জাতির জীবনে প্রতিফলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে জাতির অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে কোন স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই এবং যে জাতির অধিকাংশ লোক

বিশ্বস্ততা, ত্যাগ, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণাবলী হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহাদের রাজনীতিতেই বা স্থিতিশীলতা আসিবে কোথা হইতে?

৩. ব্যভিচারকে বৈধ বলিয়া স্থান দেওয়ার সংগে সংগে সমাজের ব্যভিচারবৃত্তি প্রচলিত রাখাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি বলে যে, একজন যুবকের চিত্ত বিনোদনের অধিকার আছে, সে সংগে সংগে ইহাও স্বীকার করিয়া লয় যে, সমাজে বেশ কিছু সংখ্যক এমন শ্রেণীর নারীর প্রয়োজন আছে, যাহারা সর্বদিক হইতে অতীব নীচ ও হীন জীবন যাপন করিবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই সকল নারী কোথা হইতে আসিবে? ইহারা অবশ্য অবশ্য সমাজেরই লোক হইবে। ইহারা সমাজের কোন না কোন ব্যক্তির কন্যা অথবা ভগ্নিই হইবে। যাহারা এক-একটি গৃহের অভিনেত্রী, এক-একটি পরিবারের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং কত শিশু সন্তানের অভিভাবক হইতে পারিত, এমন লক্ষ লক্ষ নারীকে সমাজচ্যুত করিয়া হাটে-বাজারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে হইবে যেন সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্রাবখানার ন্যায় লম্পট প্রকৃতির পুরুষদের মলত্যাগের মহলরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহার দ্বারা যেন নারীদের যাবতীয় সম্ভ্রমসুলভ বৈশিষ্ট্য হরণ করা যাইতে পারে এবং তাহাদিগকে রূপ-যৌবন বিক্রয়ের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্তু তাহাদিগকে যেন এমনভাবে প্রস্তুত করা যায়, যাহাতে স্বীয় প্রেম, দেহ-মন, আপন সৌন্দর্য ও কমনীয়ভংগী প্রতি মূহুর্তে নূতন নূতন ক্রেতার নিকটে বিক্রয় করিতে পারে এবং কোন ফলপ্রসূ সেবার পরিবর্তে আজীবন অপরের কাম-লালসা চরিতার্থকরণের জন্য ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

৪. ব্যভিচারকে বৈধ বলিয়া গ্রহন কারলে বিবাহের তামাদ্দুনিক রীতিনীতি নষ্ট হইয়া যায়। পরিণামে বিবাহের পরিবর্তে সমাজের সর্বত্র শুধু ব্যভিচারই রহিয়া যায়। এই সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, ব্যাভিচার-মনা নারী-পুরুষের মধ্যে সুষ্ঠু দামপত্য জীবন যাপনের যোগ্যতা খুব কমই থাকে। কারণ দূরভিসন্ধি, হীনমন্যতা, সম্ভোগ-লালসা ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতি এই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় এবং এই ধরণের লোকের মধ্যে কামনা-বাসনার অস্থিরতা এবং কুপ্রবৃত্তি দমণের দুর্বলতা জন্মে। ইহা ঐ সকল গুনাবলীকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয় যাহা একটি সার্থক দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রয়োজন হয়। তাহারা যদি দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধও হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সেই মধুর ব্যবহার, সংযোগ, পারস্পরিক বিশ্বাস, স্নেহ-হৃদ্যতার সম্পর্ক কখনই সুদৃঢ় হইবে না- যাহার ফলে সুসন্তান লাভ হইতে পারে এবং একটা আনন্দমুখর

পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে। আবার যেখানে ব্যভিচারের পথ সুগম হয়, সেখানে বিবাহের তামাদ্দুনিক নীতি বলবৎ থাকা কার্যত মোটেই সম্ভব নহে। কারণ দায়িত্ব গ্রহণের পরিবর্তে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ যাহাদের হইবে, তাহাদের এমন কি প্রয়োজন আছে যে, তাহারা আপন স্কন্ধে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবে?

৫. ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্যভিচারের বৈধতা ও প্রচলন দ্বারা শুধু তমদ্দুনের মূল্যোৎপাটনই হয় না; বরং মানব বংশেরই মূলচ্ছেদ করা হয়। অবাধ যৌনসম্পর্কের ফলে নারী-পুরুষ কাহারও মধ্যে এই ইচ্ছা হয় না এবং হইতেও পারে না যে, সে মানব জাতির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্য কিছু করে।

৬. ব্যভিচারের দ্বারা সমাজ ও মানব জাতির জন্য সন্তান লাভ হইলে তাহা অবৈধ সন্তানই হয়। বংশের মধ্যে বৈধ-অবৈধ সন্তানের পার্থক্যকরণ নিছক ভাবপ্রবণতাপ্রসূত নহে- যদিও কিছু সংখ্যক নির্বোধ তাহাই মনে করে- প্রকৃতপক্ষে অনেক দিক দিয়া অবৈধ সন্তান উৎপাদন করা স্বয়ং সেই সন্তানের এবং সমগ্র মানবীয় সভ্যতার প্রতি নির্মম অবিচার করা হয়। প্রথমত পিতামাতা যখন একটা পাশবিক প্রবৃত্তিতে মত্ত হয়, তখনই সন্তান গর্ভস্থ হয়। একটি বিবাহিত দম্পত্তির মধ্যে যৌনক্রিয়ার সময়ে যে পবিত্র মানবীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা অবৈধ যৌনসংমিলনকালে কখনই সম্ভব হয় না। একটা নিছক পাশবিক যৌন-উন্মত্ততাই উভয়কে সংমিলিত করে এবং সেই সময়ে যাবতীয় মানবিক বৈশিষ্ট্য উভয়কে সংমিলিত করে এবং সেই সময়ে যাবতীয় মানবিক বৈশিষ্ট্য হইতে তাহারা দূরে থাকে। এইরূপ অবৈধ সন্তানকে 'স্বাগতম' জানাইবার জন্য না তাহার মাতা, না তাহার পিতা প্রস্তুত থাকে। সে একটি ইপ্সিত বস্তু হিসাবে নহে; বরং পিতা-মাতার নিকটে একটি গলগ্রহ অথবা অবাঞ্ছিত বিপদ স্বরূপ। পিতার স্নেহ-বাৎসল্য ও সাহায্য-সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র মায়ের এক তরফা প্রতিপালনই তাহার ভাগ্যে জোটে এবং তাহাও অসন্তোষ ও আন্তরিকতাবিহীন উচ্ছ্বাস-উদ্যমের সহিত। দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা, মামা এবং পরিবারের অন্যান্য পরমাত্মীয়ের আদর প্রতিপালন হইতে সে হয় বঞ্চিত। এইরূপ সন্তান স্বভাবতই সর্ববিধ অবস্থাতেই একটি ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ মানবরূপেই গড়িয়া উঠে। না ইহার কোন সঠিক চরিত্র গঠন হইতে পারে, না পারে ইহার কোন প্রতিভার বিকাশ হইতে। সে

উন্নতি ও কার্যকুশলতার উপায়-উপাদান পাইতে পারে না। সে স্বয়ং অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত, উপকরণহীন, বন্ধুহীন, সহায়-সম্বলহীন ও মযলুম হইবে এবং সে বৈধ সন্তান হিসাবে তমদ্দুন গঠনে যতখানি উপযোগী হইতে পারিত, এমতাবস্থায় ততখানি কখনই হইতে পারিবে না।

অবৈধ যৌনক্রিয়ার সমর্থকরা বলে যে, সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সন্তানের পিতা-মাতা তাহাকে অবাধ যৌনসম্পর্ক দ্বারা জন্মদান করিবে এবং তামাদ্দুনিক সেবার উপযোগী করিয়া লালন-পালনের জন্য তাহাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের এই ধরনের প্রস্তাব করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার দ্বারা নারী-পুরুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষিত হইবে। উপরন্তু যৌন প্রবৃত্তির পশ্চাতে সন্তানের জন্মদান ও তাহার প্রতিপালনের যে বাসনা রহিয়াছে, তাহাও বিবাহ বন্ধন ব্যতিরেকেই চরিতার্থ হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান বংশধরদের জন্য এমন একজাতীয় শিক্ষা ও সরকারী প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছে যে, তাহার ফলে স্বাতন্ত্রের বিকাশ এবং ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের কোনই উপায় নাই। যে পদধতিতে একই সংগে লক্ষ লক্ষ সন্তানকে একই আদর্শে, একই নিয়মে এবং একই ঢঙে গঠন করা হইবে, সেখানে সন্তানদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ কখনই সম্ভব নহে। এখানে তো তাহাদের মধ্যে বড় জোর একটা কৃত্রিম সমতা সৃষ্টি করত তাহাদিগকে একই রকম করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। এই কারখানা হইতে সন্তানগণ একই ধরনের ব্যক্তিত্বসহ বাহির হইবে, যেমন কোন বিরাট ফ্যাক্টরী হইতে লৌহখন্ডগুলি একই ছাঁচে তৈরী হইয়া আসে। চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় যে, মানুষ সম্পর্কে এই সকল নির্বোধ লোকদের ধারণা কত নীচ ও জঘন্য। ইহারা মানব সন্তানকে 'বাটা কোম্পানীর জুতার ন্যায় গড়িতে চায়। ইহা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত যে, সন্তানের ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলা একটি অতি সূক্ষ্মশিল্প (art) বিশেষ। এই শিল্প একটি ক্ষুদ্র চিত্রালয়েই সম্পাদিত হইতে পারে-যেখানে প্রত্যেক চিত্রকরের দৃষ্টি একটি চিত্রের পতি নিবদ্ধ থাকে। একটি কারখানায়, যেখানে ভাড়াটিয়া মজুর এক ধরনের লক্ষ লক্ষ চিত্র তৈরী করে, সেখানে সন্তান প্রতিপালনের মত সূক্ষ্ম শিল্পের বিকাশ সাধনের পরিবর্তে তাহার ধ্বংসই হইবে।

অতপর জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে এমন কর্মীবৃন্দের প্রয়োজন হইবে, যাহারা সমাজের পক্ষ হইতে সন্তানদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবে। প্রকাশ থাকে

যে, এই কার্যের জন্য ঐ সকল কর্মীই উপযোগী হইতে পারে, যাহারা স্বীয় ভাবপ্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে এবং যাহাদের মধ্যে নৈতিক সংযম-সংবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা তাহারা সন্তানদের মধ্যে সংযম-সংবরণ সৃষ্টি করিবে কেমন করিয়া? এখন প্রশ্ন এই যে, এই ধরনের লোক কোথা হইতে আমদানী করা হইবে? তাহারা তো জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এই জন্যই কায়েম করিতে চাহে যে, নারী-পুরুষকে তাহাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বল্গাহীন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে যখন সমাজ হইতে সংযম-সংবরণ প্রবৃত্তি দমনের শক্তিই অংকুরে বিনষ্ট করা হইল, তখন অন্ধের পল্লীতে চক্ষুষ্মান কোথায় পাওয়া যাইবে, যে নূতন বংশধরকে পথে দেখিয়া চলিতে শিক্ষা দিবে?

৭. স্বার্থান্ধ পুরুষ ব্যভিচারের দ্বারা যে নারীকে সন্তানের মাতা করিয়া দেয়, সে নারীর জীবন চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যায়। জনগণের পক্ষ হইতে লাঞ্ছনা ও ঘৃণা এবং বিপদের পাহাড় তাহার উপরে এমনভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে যে, সমগ্র জীনবব্যাপী সে ইহার দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে থাকে। আধুনিক নৈতিক আদর্শ এইরূপ সমাধান পেশ করিতেছে যে, সকল প্রকার মাতৃত্বকে একসমান দেখিতে হইবে। সে মাতৃত্ব বিহাহের মাধ্যমে হউক অথবা অন্য উপায়ে হউক। বলা হয় যে, সকল অবস্থাতেই মাতৃত্ব শ্রদ্ধার পাত্র। আরও বলা হয় যে, সরলতার কারণে অথবা অসাবধানতাবশত যে নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অভিশপ্ত ও কলংকিত করা সমাজের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি এক বিরাট অবিচার। কিন্তু এই সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, ইহার দ্বারা ব্যভিচারী নারীর যতই সুবিধা হউক না কেন, সমাজের জন্য সামগ্রিকভাবে ইহা এক বিরাট বিপর্যয়। সমাজ একটি অবৈধ সন্তানকে স্বভাবতই যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চক্ষে দেখে, তাহা একদিকে নর-নারীর পাপ ও দুষ্কর্মের বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ এবং অপরদিকে ইহা সমাজের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত রাখিবার নিদর্শন বিশেষ। যদি বৈধ এবং অবৈধ সন্তানের মাতাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ এই হইবে যে, সমাজ হইতে মংগল-অমংগল, ভাল-মন্দ ও পাপ-পূণ্যের তারতম্য দূরীভূত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি তাহাই হয়, [অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ সন্তানের মাতাকে সমান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়] তবুও অবৈধ সন্তানের মাতাকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার কি সমাধান ইহার দ্বারা

হইবে? নূতন দৃষ্টিভংগীর বাহকগণ উভয় মাতাকে সমান মনে করিলেও প্রকৃতি ইহাদিগকে কখনও সমান মনে করিবে না এবং প্রকৃতপক্ষে উভয়ে কোন দিনও সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। ইহাদের সাম্য, বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তি, ন্যায় ও সত্যের বিপরীত। যে নির্বোধ নারী যৌন-আবেগের সাময়িক উত্তেজনায় বশীভূত হইয়া নিজের দেহকে এমন এক স্বার্থান্ধ পুরুষের অধীন করিয়া দিল যে, তাহার এবং সন্তানের প্রতিপালনের কোন দায়িত্বই সে গ্রহণ করিতে রাজী নহে, সে নারী ঐ বুদ্ধিমতী নারীর সমান কেমন করিয়া হইতে পারে, যে একজন সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীর ব্যক্তিকে স্বামীরূপে না পাওয়া পর্যন্ত তাহার যৌবনের আবেগ-অনুভূতিকে সংযত রাখিয়াছে? কোন বুদ্ধি-বিবেক এই উভয় নারীকে এক সমান মনে করিবে? উভয়কে সমান করিবার এক প্রদর্শনী করা যাইতে পারে কিন্তু যে ভরণ- পোষণ, সংরক্ষণ, সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার দৃষ্টি, শুভাকাঙ্খা, শান্ত ও স্থৈর্য একটি বিবাহিতা নারী লাভ করে, তাহা ঐ বির্বোধ ব্যভিচারিণী কোথা হইতে লাভ করিবে? তাহার অবৈধ সন্তানের জন্য পিতার স্নেহ এবং পৈত্রিকগোষ্ঠীর স্নেহ-ভালবাসা কোন বাজার হইতে আমদানী করা যাইবে? বড় জোর আইনের বলে তাহাকে আর্থিক সাহায্য করা যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে একটি মাতা ও সন্তানের শুধু কি অর্থেরই প্রয়োজন হয়? অতএব ইহা সত্য যে, বৈধ ও অবৈধ মাতৃত্বকে সমান অধিকার দিলে পাপাচারীদের বাহ্যিক সান্ত্বনা যতই হউক না কেন, ইহা তাহাদিগকে তাহাদের নির্বুদ্ধিতার বিষময় পরিণাম হইতে এবং অবৈধ সন্তানদিগকে জন্মগত স্বাভাবিক ক্ষতি হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

উপরিউক্ত কারণে সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিস্ফূরণের জন্য ইহা একান্ত অপরিহার্য যে, সমাজে যৌনকার্যের প্রসার একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং যৌবনাবেগ প্রশমিত ও চরিতার্থ করিবার একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইতেছে দাম্পত্য জীবনের পথ। নর-নারীকে ব্যভিচারের স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাহাদিগকে অন্যায় প্রশয় দেওয়া এবং সমাজের প্রতি শুধু অবিচার করাই নহে, উহাকে হত্যা করা। যে সমাজ এই বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করে ও ব্যভিচারকে নিছক একটি আনন্দ মুহূর্ত (Having a good time) মনে করিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিতে চায় এবং অবাধ বীজ বপনের (Sowing wild oats) প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে

চায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটি অজ্ঞ সমাজ। সে স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন নহে। সে নিজেই শত্রুতা সাধন করে। যদি সে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অনুধাবন করিতে পারে যে, যৌনসম্পর্কের ব্যাপারে সামাজিক স্বার্থের উপরে ব্যক্তি স্বাধীনতার কি বিষময় প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা হইলে সে চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতিকে যেমন মনে করে, ইহাকেও তেমন মনে করিবে; বরং চুরি–ডাকাতি হইতে অধিকতর মারাত্মক মনে করিবে। চোর, ডাকাত এবং হত্যাকারী বড় জোর এক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তির ক্ষতি করে কিন্তু ব্যভিচারী গোটা সমাজ এবং ভবিষ্যত বংশধরগণের উপরে ডাকাতি করে। একই সময়ে সে লক্ষ–কোটি মানবের ধন অপহরণ করে। তাহার অপরাধের পরিমাণ অন্যান্য অপরাধ হইতে অধিকতর সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। ইহা যখন সর্বজনস্বীকৃত যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেহ কাহারও উপরে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার বিরুদ্ধে সমাজের সাহায্যের জন্য আইনের বলপ্রয়োগ সমীচীন হয় এবং যখন ইহার ভিত্তিতে চুরি, হত্যা, লুন্ঠন, প্রবঞ্চনা ও পরস্বপহরণের অন্যান্য উপায়গুলিকে অপরাধ মনে করিয়া শাস্তি বিধানের দ্বারা তাহার পথ রুদ্ধ করা হয়, তখন দেশের আইন সমাজের রক্ষক হইয়া ব্যভিচারকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিবে না–ইহার কোনই কারণ নাই।

আদর্শের দিক দিয়াও ইহা সুস্পষ্ট যে, বিবাহ এবং ব্যভিচার একই সময়ে একটি সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হইতে পারে না। যদি এক ব্যক্তির জন্য বিবাহ ব্যতিরেকে যৌনপ্রবৃত্তি প্রশমিত করা বৈধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই একই কার্যের জন্য আবার অপরের জন্য বিবাহ বিধির প্রচলন অর্থহীন। ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ যে, রেলগাড়ীতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা বৈধ ঘোষণা করিয়া সংগে সংগে টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থাও চালু রাখা হইয়াছে। কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এই উভয় ব্যবস্থাকে একই সংগে গ্রহণ করিতে পারে না। যুক্তিসংগত ব্যবস্থা এই যে, টিকিট বিক্রয়ের প্রথা একেবারে রহিত করিতে হইবে। কিন্তু যদি ইহা চালু রাখিতে হয়, তাহা হইলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ অপরাধজনক ঘোষণা করিতে হইবে। তদ্রুপ বিবাহ এবং ব্যভিচার সম্পর্কেও উভয়ের প্রয়োগ এক অন্যায় ও অসংগত ব্যাপার। যদি তমদ্দুনের জন্য বিবাহ ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করা হয়–যেমন ইতিপূর্বে ইহা যুক্তিদ্বারা

প্রমাণিত হইয়াছে-তাহা হইলে ব্যভিচারকে অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা একান্ত আবশ্যক হইবে।[১]

অজ্ঞতার ইহা এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য যে, যে সকল বিষয়ের পরিণাম অতি সীমাবদ্ধ হয় এবং অল্পকাল মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে, শুধু তাহাই উপলব্ধি করা হয়। কিন্তু যাহার পরিণাম ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী হওয়ার কারণে অনুভব করা যায় না এবং বিলম্বে ফল প্রকাশিত হয়, তাহার কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না-ইহার প্রতি কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না। চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতির ব্যাপারে গুরুত্বদান এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ ইহাই। যে ব্যক্তি তাহার গৃহে প্লেগের ইঁদুর জমা করিয়া রাখে অথবা সংক্রামক ব্যাধি ছড়ায়, বর্বর সমাজও তাহাকে ক্ষমার পাত্র মনে করে না। কারণ তাহার কার্য প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিকারক দেখায়। কিন্তু যে ব্যভিচারী তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তমদ্দুনের মূল কর্তন করে, সে অজ্ঞ বর্বরদের নিকটে সকল প্রশ্রয় লাভ করে। কারণ তাহার দ্বারা যে ক্ষতি হয়, তাহা যুক্তি সংগত হইলেও অনুভূত হয় না। অতএব অজ্ঞদের মস্তিষ্কে ইহা প্রবেশই করে না যে, ব্যভিচারের মধ্যে অপরাধজনক কার্য কি হইতে পারে। যদি তামাদ্দুনিক ভিত্তি বর্বরতার পরিবর্তে বিবেক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই পদ্ধতি কখনই গৃহীত হইবে না।

৪. অশ্লীলতার প্রতিরোধ পদ্ধতি

---

১. একটি সাধারণ বিকৃত ধারণা রহিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে একটি যুবকের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কোন না কোন সুযোগ থাকা উচিত। কারণ যৌবনে কামভাব দমন করা কঠিন এবং দমন করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কিন্তু যে সকল সূত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সকলই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কামপ্রবৃত্তির আবেগ দমন করা যায় না, তাহা এক অস্বাভাবিক ব্যাপার [abnormal] এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি এই কারণে হয় যে, একটা ভ্রান্ত তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা জোর করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করে। আমাদের সিনেমা, সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য-সংগীত এবং নারী-পুরুষের এই মিশ্র সমাজে সাজ-সজ্জায় ভূষিতা নারীদের অবাধ সংস্পর্শলাভই স্বাভাবিক মানুষকে অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণ করিয়া তুলিবার কারণ। নতুবা একটি শান্ত ও পূণ্যপূত আবহাওয়ায় সাধারণ নারী-পুরুষের মধ্যে এমন কোন যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেই পারে না যাহা মানসিকতা ও নৈতিক শিক্ষার ফলে দমন করা যায় না। যৌবনে যৌনক্রিয়া না করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অতএব স্বাস্থ্যের জন্য ব্যভিচার বিধেয়-এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা, উভয়ের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন যে, সমাজের যে সব ভ্রান্ত ব্যবস্থা এবং বিলাসবহুল জীবনের যে সব ভ্রান্ত মানের কারণে বিবাহ কঠিন এবং ব্যভিচার সহজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে।

তমদ্দুনের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়কে বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে আইনত অপরাধ ঘোষণা করত তাহার জন্য একটা শাস্তির ব্যবস্থাই যথেষ্ট হইবে না; বরং এতদসহ চারিপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। যেমনঃ

ক) শিক্ষা–দীক্ষার মাধ্যমে মানুষের এতখানি মানসিকতার সংস্কার সাধন করিতে হইবে যেন সে স্বয়ং উক্ত কার্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, উহাকে পাপকার্য মনে করে, তাহার নৈতিক চেতনা তাহাকে যেন উক্ত পাপকার্য হইতে বিরত রাখে।

খ) এই পাপকার্যের বিরুদ্ধে সামাজিক চরিত্র ও জনমত এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন জনসাধারণ উহাকে অপরাধ ও লজ্জাজনক কাজ মনে করে এবং উহাকে এমন ঘৃণার চক্ষে দেখে যেন জনমত ঐ সকল লোককেও উক্ত পাপকাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে–যাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে অথবা যাহাদের নৈতিক চেতনা দূর্বল রহিয়াছে।

গ) যে সকল উপায়–উপাদান মানুষকে এই পাপকার্যে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে, তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার মধ্যে সে সমুদয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এতদসহ যে সকল উপায়–উপাদান মানুষকে পাপকার্য করিতে বাধ্য করে, যথাসম্ভব তাহারও মূলোৎপাটন করিতে হইবে।

ঘ) তামাদ্দুনিক জীবনে এই পাপকার্যের বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত পাপকার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও যেন তাহা সহজে করিতে না পারে।

বিবেক উপরিউক্ত চারিটি পদ্ধতির সত্যতা ও আবশ্যকতার সাক্ষ্য দেয় এবং প্রকৃতিও ইহাই দাবী করে। কার্যত সমগ্র দুনিয়ার কার্যপদ্ধতিও ইহাই যে, সামাজিক আইন যে সকল বিষয়কে অপরাধরূপে গণ্য করিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য শাস্তির ব্যবস্থার সংগে সংগে এই চারি প্রকারের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এখন যদি ইহা স্বীকৃত হয় যে, যৌন সম্পর্কের প্রসার তমদ্দুন ধ্বংস করে এবং সমাজের পরিপন্থী একটা বিরাট অপরাধ সংঘটিত করে, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করিতে শাস্তি বিধানের সংগে সংগে উপরে বর্ণিত

সকল প্রকার সংস্কারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার জন্য জনগণের শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। জনগণকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। যে সকল বিষয় মানুষের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহাও তামাদ্দুনিক সীমারেখা হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। বিবাহের ব্যাপারে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সামাজিক ব্যবস্থা হইতে তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার উপরেও এতখানি বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে হইবে যে, যদি কেহ বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায়, তাহা হইলে সে পথ যেন রুদ্ধ করা হয়। ব্যভিচারকে পাপ এবং অপরাধ স্বীকার করার পর কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করিতে পারিবে না।

যে সকল নৈতিক ও সামাজিক মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া ব্যভিচারকে পাপ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তাহা একদল স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের হঠকারিতা এই যে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদির পরিবর্তে শুধু সংস্কারমূলক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করা উচিত। তাঁহারা বলেন, "শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগ্রত করিয়া দাও, তাহাদের মনের দাবী ও নৈতিক চেতনাকে এতখানি জোরদার করিয়া দাও, যেন ইহা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়। নতুবা আধ্যাত্মিক সংস্কার-সংশোধনের পরিবর্তে শাস্তিমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ এই হইবে যে, তোমরা মানুষের সংগে শুধু শিশুসুলভ আচরণই করিতেছনা; বরং মানবতার অপমান করিতেছ।"

আমরাও এতখানি স্বীকার করি যে, মানবতার সংস্কার-সংশোধনের পথ ইহাই। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার শেষ প্রান্ত ইহাই যে, মানবের অন্তরে এমন এক শক্তির সৃষ্টি হয়, যাহার দ্বারা সে নিজে নিজেই সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সম্মান করিতে থাকে এবং তাহার মন তাহাকে নৈতিক বন্ধন ছিন্ন করা হইতে বিরত রাখে। এই উদ্দেশ্যেই মানুষের শিক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাদের সভ্যতা কি প্রকৃতপক্ষে সেই প্রান্তে উপনীত হইয়াছে? সাধারণ ও নৈতিক শিক্ষার দ্বারা মানবকুলকে কি এতখানি পরিমার্জিত করা হইয়াছে যে, তাহার আধ্যাত্মিকতার উপরে নির্ভর করা

যাইতে পারে এবং সামাজিক ব্যবস্থার সংরক্ষণকল্পে প্রকাশ্য কোন শাস্তিমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার আবশ্যকতা নাই? অতীত যুগের কথা ছাড়িয়া দিন। ইহা তো তাঁহাদের ভাষায় 'অন্ধযুগ'। এই বিংশ শতাব্দী-এই 'জ্যোতির্ময় যুগ' সম্মুখে বর্তমান রহিয়াছে। এই যুগে ইউরোপ এবং আমেরিকার মত সভ্য দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত। নাগরিকগণ উচ্চশিক্ষায় গর্বিত। কিন্তু সেখানে কি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সংস্কার অপরাধ ও আইনভংগ বন্ধ করিয়া দিয়াছে? সেখানে কি চুরি-ডাকাতি হয় না? সেখানে কি হত্যাকান্ড হয় না? ধোকা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার-অনাচারের ঘটনা কি সংঘটিত হয় না? সেখানে কি পুলিশ, বিচারালয়, কারাগার, সাংস্কৃতিক খতিয়ান ও হিসাব-নিকাশের কোন প্রয়োজন হয় না? সেখানে কি জনগণের মধ্যে এমন নৈতিক দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হইয়াছে যে, এখন আর তাহাদের সংগে 'শিশু সুলভ' আচরণ করা হয় না? যদি ঘটনা তাহা না হয়, যদি এই সভ্যযুগেও সমাজের আইন-শৃংখলাকে শুধুমাত্র জনগণের নৈতিক চেতনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া না যায়, যদি এখনও প্রত্যেক স্থানেই অপরাধ বন্ধ করিবার জন্য শাস্তিমূলক ও প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা 'মানবতার অপমান' করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার কি কারণ হইতে পারে যে, শুধু যৌনসম্পর্কের ব্যাপারে 'মানবতার অপমান' অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে? শুধু এই একটি ব্যাপারে এই সকল 'শিশুদের' সহিত 'বয়োজ্যেষ্ঠদের' ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য এত হঠকারিতা চলিতেছে কেন? একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহাদের মনের কোণে কোন ধরনের চোর লুকাইয়া আছে।

বলা হয় যে, যে সকল বিষয়কে যৌন-উত্তেজক মনে করিয়া তমদ্দুনের সীমাবহির্ভূত করা হইতেছে তাহা তো শিল্প এবং সৌন্দর্যবাদের প্রাণস্বরূপ। এই সকল পরিহার করিলে তো মানব-জীবনের সৌন্দর্য-উৎসই শুষ্ক হইয়া যাইবে। অতএব তমদ্দুনের সংরক্ষণ এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য কিছু করিতে চাহিলে তাহা এমনভাবে করা উচিত যাহাতে চারুশিল্প এবং সৌন্দর্য সম্ভোগে কোন আঘাত না লাগে। আমরাও এই ভদ্রলোকদের সহিত এতটুকু একমত যে, শিল্প এবং সৌন্দর্য সম্ভোগ প্রকৃতই মূল্যবান বস্তু। ইহার সংস্করণ ও উন্নয়ন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সামাজিক জীবন এবং সামাজিক কল্যাণ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। কোন শিল্প ও সম্ভোগের জন্য ইহা উৎসর্গ করা যাইতে

পারে না। শিল্প ও সৌন্দর্যসম্ভোগের বিকাশ ও পরিস্ফুটন করিতে হইলে তাহার জন্য এমন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা সামাজিক জীবন ও তাহার কল্যাণের সমন্বয় সাধন করিতে পারে। যে শিল্প ও সৌন্দর্যসম্ভোগ জীবনের পরিবর্তে ধ্বংস এবং কল্যাণের পরিবর্তে বিপর্যয় আনয়ন করে, তাহাকে সামাজিক গন্ডির মধ্যে পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। ইহা আমাদের কোন ব্যক্তিগত অথবা ঘরোয়া দৃষ্টিভংগী নহে; বরং ইহাই বিবেক ও প্রকৃতির দাবী। সমগ্র জগত ইহাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে এবং সর্বত্র ইহাকে কার্যকরী করা হয়। যে সকল বিষয়কে জগতে সামাজিক জীবনের জন্য ধ্বংসকারক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মনে করা হয়, তাহাকে শিল্প ও সৌন্দর্যসম্ভোগের নাম করিয়া কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। কোন সাহিত্য ভাঙন, দ্বন্দ্ব-কলহ, হত্যা-লুন্ঠন প্রভৃতির প্ররোচনা দিলে তাহাকে যেমন শুধু সাহিত্যের খাতিরে বরদাশ্‌ত করা হয় না, তেমনি কোন সাহিত্যের মাধ্যমে প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি ছড়াইবার জন্য প্ররোচিত করিলে তাহাও কুত্রাপি সহ্য করা হয় না। যে সকল সিনেমা-থিয়েটার শান্তিভংগ ও বিদ্রোহের জন্য উত্তেজনা ছড়ায়, তাহাকে জগতের কোন গভর্নমেন্টই জনসাধারণ্যে অভিনীত হওয়ার অনুমতি দেয় না। যে সকল চিত্রের মধ্যে অত্যাচার, দ্বন্দ্ব-কলহ ও অনাচারের আবেগ প্রকাশিত হয় কিংবা যাহার দ্বারা নৈতিকতার সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ ভংগ করা হয়, তাহা যতই শিল্প নৈপুণ্যের বাহক হউক না কেন, কোন আইন এবং কোন সমাজের বিবেক উহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নহে। পকেটমারা বিদ্যা যদিও একটি অতি সূক্ষ্ম কৌশল বিশেষ এবং হাত সাফাইয়ের কলা- কৌশল চরমভাবে বিবেচিত হইলেও কোন মানুষই ইহার বিকাশ সাধন পসন্দ করে না। নোট, চেক ও দলিল-দস্তাবেজ জাল করিতে অসাধারণ মস্তিষ্ক শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু এই কলা- কৌশলকে কেহই বৈধ মনে করে না। প্রতারণা, জুয়াচুরি বিদ্যায় মানব মস্তিষ্ক স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির কত ধরনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু কোন সভ্যসমাজ এই সকল কৃতিত্বের সম্মান করিতে ভালবাসে না। ইহা এক স্বীকৃত সত্য যে, সমাজ জীবন, উহার শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি ও মংগল যে কোন চারুশিল্প এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ হইতে অধিকতর মূল্যবান। অতএব, কোন শিল্পের জন্য ইহাকে উৎসর্গ করা যায় না। অবশ্য এ বিষয়ে একমাত্র মতানৈক্যের বিষয় শুধু এই যে, যাহাকে আমরা

সমাজ জীবন ও উহার মংগলের পরিপন্থী মনে করি, অপরে তাহা করে না। যদি তাহাদের দৃষ্টিভংগী আমাদের ন্যায় হইত তাহা হইলে তাহারাও আমাদের ন্যায় শিল্প ও সৌন্দর্যসম্ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করার আবশ্যকতা অনুভব করিত।

ইহাও বলা হয় যে, অবৈধ যৌনসম্পর্ক বন্ধ করিবার জন্য নারী–পুরুষের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা এবং সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা বন্ধ করা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের চরিত্রের উপর সন্দেহ সংশয় পোষণ করা। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যেন সকল মানুষকেই চরিত্রহীন মনে করা হইল এবং তাহারা নারী–পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে মোটেই আস্থাশীল নহে। ইহা বড়ই যুক্তিযুক্ত কথা। এই যুক্তিপদ্ধতিটি আর একটু প্রসারিত করুন। গৃহদ্বারে ব্যবহৃত তালা যেন ইহাই ঘোষণা করে যে, গৃহস্বামী পৃথিবীর সকল মানুষকেই চোর মনে করিয়াছে। পুলিশের অস্তিত্ব ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে যে, গভর্নমেন্ট দেশের সকলকেই অসাধু মনে করেন। টাকার আদান–প্রদানে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়, তাহারও কারণ এই যে, একপক্ষ অপর পক্ষকে আত্মসাৎকারী মনে করে। অপরাধ বন্ধ করিবার জন্য যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, উহার দ্বারা যাহারাই প্রভাবিত হয়, তাহাদের সকলকেই সম্ভাব্য অপরাধী মনে করা হইয়াছে। এই যুক্তিপদ্ধতির দ্বারা তো আপনাকেও প্রতি মুহূর্তে চোর–বদমায়েশ, পরস্বপহারী এবং সন্ধিগ্ধ চরিত্র মনে করা হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা তো আপনার আত্মসম্মানে এতটুকু আঁচও লাগে না। তবে ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে আপনার অনুভূতি এত দুর্বল কেন?

উপরে যে বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে, আসলে ব্যাপার তাহাই। যাহাদের মনে প্রাচীন নৈতিক ধারণার জীর্ণপ্রভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা ব্যভিচার এবং যৌন–অনাচারকে গর্হিত মনে করে। তবে এতখানি গর্হিত মনে করে না যে, উহা একেবারে নির্মূল করিতে হইবে। এই কারণে সংস্কার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে তাহাদের ও আমাদের দৃষ্টিভংগী পৃথক। যদি প্রাকৃতিক তথ্যাবলী তাহাদের নিকটে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তাহারা এই ব্যাপারে সঠিক অবস্থা হৃদয়ংগম করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আমাদের সহিত একমত হইবে যে, মানুষ যতক্ষণ মানুষ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ উহার মধ্যে মনুষত্বের উপাদান বর্তমান আছে, ততক্ষণ সে তমদ্দুন মানবের কুপ্রবৃত্তি ও তাহার আনন্দসম্ভোগ অপেক্ষা সমাজ–জীবনের উন্নতি

অধিকতর প্রিয় মনে করিবে, সে এই সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন হইতে পারে না।

৫. দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক অবস্থা

পারিবারিক ভিত্তিস্থাপন ও যৌন-উচ্ছৃংখলতার পথ রুদ্ধ করিবার পর একটি সৎ তমদ্দুনের জন্য যাহা অত্যাবশ্যক তাহা এইযে, সমাজ ব্যবস্থায় নারী–পুরুষের সম্পর্কের সঠিক রূপ নির্ধারণ করিতে হইবে। ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহাদের অধিকার নিরূপিত করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যথার্থভাবে দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিতে হইবে। পরিবারের মধ্যে তাহাদের পদমর্যাদা এবং তাতা এমনভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যেন মিতাচার ও সমতার মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকে। তমদ্দুনের যাবতীয় সমস্যার মধ্যে এই সমস্যাটি বড় কঠিন। কিন্তু মানুষ ইহার সমাধানে অধিকাংশ সময়ে ব্যর্থ হইয়াছে।

এমন কতক জাতি আছে যাহারা নারীকে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব দিয়াছে। কিন্তু আমরা এমন একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই না যে, এই সকল জাতির কোন একটি জাতি তাহযীব ও তমদ্দুনের কোন উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছে। অন্ততপক্ষে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তো এমন কোন জাতির নামগন্ধ পাওয়া যায় না যাহারা নারীকে পুরুষের শাসক বানাইয়া পৃথিবীতে কোন শক্তি ও পদমর্যাদা লাভ করিয়াছে অথবা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতীই পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দিয়াছে। কিন্তু এই প্রাধান্য অধিকক্ষেত্রে অত্যাচারের রূপ ধারণ করিয়াছে, নারীকে দাসীতে পরিণত করিয়াছে। তাহাকে অপমানিত ও পদদলিত করা হইয়াছে। তাহাকে কোন প্রকার আর্থিক ও তামাদ্দুনিক অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাকে পরিবারের একটা নগণ্য পরিচারিকারূপে এবং পুরুষের কামরিপু চরিতার্থের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। পরিবার বহির্ভূত একদল নারীকে কিছু পরিমাণ শিক্ষা ও সভ্যতার অলংকারে ভূষিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একমাত্র এই জন্য যে, তাহারা যেন পুরুষের যৌন চাহিদা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া পূর্ণ করিতে পারে। যেমন তাহারা স্বীয় সংগীত–কলার দ্বারা কর্ণস্বাদ, নৃত্য ও দেহভংগীর দ্বারা চক্ষুস্বাদ এবং পরম ও চরম যৌন–আবেদনের দ্বারা দৈহিকস্বাদে পরিণত হইতে পারে। ইহাই ছিল পুরুষের

কুপ্রবৃত্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত নারীত্বের অপমান ও লাঞ্ছনার অতীব লজ্জাকর পন্থা। যে জাতি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, সে ধ্বংস হইতে রক্ষা পায় নাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা তৃতীয় এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, নারী-পুরুষের সমতা ও সমানাধিকার থাকিতে হইবে। উভয়ের দায়িত্ব অনুরূপ এবং প্রায় একই হইবে। উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিবে, উভয়ে আপন আপন জীবিকা অর্জন করিবে এবং স্বাবলম্বী হইবে। সামাজিক ব্যবস্থার এই পদ্ধতি এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কারণ এখনও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট। জীবনের কোন বিভাগে এখনও নারী-পুরুষ সমান হইতে পারে নাই। পরিপূর্ণ সাম্যের আকারে যে সমস্ত তাহার লাভ করা উচিত ছিল, তাহা সে এখনও লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু যতটুকু পরিমাণে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা সে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় একটা বিপর্যয়ই সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিপূর্বে ইহার ফলাফল আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অতএব এখানে নূতন করিয়া কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি না। এই বর্ণিত ত্রিবিধ প্রকারের তমদ্দুনই ন্যায়, মিতাচার ও সংগতি হইতে বঞ্চিত। কারণ তাহারা প্রকৃতির নির্দেশ হৃদয়ংগম করিতে এবং যথাযথভাবে তদনুয়ায়ী পন্থা অবলম্বন করিতে অবহেলা করিয়াছে। বিবেক-বুদ্ধি সহকারে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃতি স্বয়ং এই সকলের সুষ্ঠু সমাধান দিয়াছে। বরং ইহাও প্রকৃতির একটা বিরাট শক্তি, যাহার প্রভাব নারী না ততখানি নীচতায় নামিয়া আসিতে পারে, যতখানি তাহাকে নামাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং না ততখানি উপরে উঠিতে পারে, যতখানি সে উঠিতে চাহিয়াছে অথবা পুরুষ তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষ তাহার ভ্রমান্ধ বিবেক ও আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুই বিপরীত চরমপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি ন্যায়, মধ্যমপন্থা ও মিতাচার অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে এবং স্বয়ং ইহার পন্থা বলিয়া দেয়।

মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ যে সমান, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। নারী-পুরুষ মানবজাতির দুইটি অংশ। তমদ্দুন গঠনে, সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন ও রূপায়ণে এবং মানবতার সেবায় উভয়ে সমান অংশীদার। মন-মস্তিষ্ক, বিবেক, অনুভূতি, প্রবৃত্তি ও মানবিক প্রয়োজন উভয়েরই আছে।

তামাদ্দুনিক সংস্কার ও উন্নতিবিধানের জন্য উভয়ের মানসিক উন্নতি, মস্তিষ্কচর্চা, বিবেক ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সমভাবে প্রয়োজন, যাহাতে তামাদ্দুনিক সেবায় প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিকা পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। এই দিক দিয়া সমতার দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। পুরুষের ন্যায় নারীকেও তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতানুসারে যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করিতে সুযোগ দেওয়াও একটা সৎ তমদ্দুনের একান্ত দাবী। জ্ঞানার্জন ও উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় তাহাকেও তামাদ্দুনিক ও আর্থিক অধিকার দিতে হইবে। সমাজে তাহাকে এমন মর্যাদা দান করিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে আত্মসম্মানের অনুভূতির উদ্রেক হয় এবং ঐ সকল মানবীয় গুণের সঞ্চার হয় যাহা শুধু আত্মসম্মানের অনুভূতির দ্বারাই হইতে পারে। যে সকল জাতি এই ধরনের সমতা অস্বীকার করিয়াছে, যাহারা নিজেদের নারী সমাজকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত ও সামাজিক অধিকারসমূহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহারা স্বয়ং অধপতনের গহ্বরে পতিত হইয়াছে। কারণ মানবজাতির অর্ধাংশকে অধপতিত করার অর্থ মানবতাকে অধপতিত করা। হীনা, লাঞ্ছিতা মাতার গর্ভ হইতে সম্মানী, অশিক্ষিতা মাতার ক্রোড় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অধপতিতা মাতার লালনাগার হইতে উন্নতচিন্তার মানুষ আশা করা বৃথা।

কিন্তু সমতার একটা দ্বিতীয় দিক আছে। তাহা এ যে, নারী-পুরুষ উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক হইবে, উভয়ে একই ধরনের কাজ করিবে। উভয়ের উপরে জীবনের সকল বিভাগের গুরুদায়িত্ব সমানভাবে অর্পিত হইবে এবং তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় উভয়ের স্থান একই প্রকারের হইবে। ইহার সমর্থনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া বলা হয় যে, নারী-পুরুষ শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া এক (Equipotential)। উভয়ের মধ্যে এই ধরনের সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যও উভয়ের দ্বারা একই প্রকারের কাজ লওয়া। উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনই যুক্তিযুক্ত হইবে না-যতক্ষণ না প্রমাণ করা হইয়াছে যে, উভয়ের শারীরিক গঠনও একই রূপ, প্রকৃতি উভয়ের উপরে একই ধরনের দায়িত্ব অর্পন করয়াছে এবং উভয়ের মানসিক অবস্থাও অভিন্ন। আজ পর্যন্ত মানুষ যত

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহার দ্বারা ইহার বিপরীত উত্তরই পাওয়া যায়।

জীব বিজ্ঞানে নারীর প্রকৃতি বিন্যাস

জীব বিজ্ঞানের (Biology) তত্ত্বানুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নারী স্বীয় আকৃতি, অবয়ব এবং বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগ হইতে আরম্ভ করিয়া অণু-পরমাণু এবং (Protein molecules of tissue cells) পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে পুরুষ হইতে পৃথক। যখন গর্ভে সন্তানের মধ্যে (Sex Formation) [গঠন-আকৃতি] হয়, সেই সময় হইতেই উভয় শ্রেণীর শারীরিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করিতে থাকে। নারীর শারীরিক গঠন এমনভাবে করা হয়, যেন সে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের যোগ্য হইতে পারে। প্রাথমিক (Womb Formation) হইতে আরম্ভ করিয়া সাবালকত্ব পর্যন্ত তাহার শরীরের পূর্ণ বিকাশ এই যোগ্যতার পরিপূর্ণতার জন্যই হইয়া থাকে এবং ইহাই তাহার ভবিষ্যত জীবনের পথ নির্ধারণ করিয়া দেয়।

সাবালক হইবার পর মাসিক ঋতু আরম্ভ হয়। ইহার দ্বারা তাহার যাবতীয় অংগ-প্রত্যাংগের কর্মক্ষমতা প্রভাবান্বিত হয়। শরীরতত্ত্ববিদগণের পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, মাসিক ঋতুকালে নারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়ঃ

১. শরীরে তাপ-সংরক্ষণ শক্তি কমিয়া যায়। ফলে অধিক মাত্রায় শারীরিক তাপ নির্গত হইয়া তাপমাত্রা কমিয়া যায়।

২. নাড়ি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, রক্তের চাপ কমিয়া যায়, শ্বাস গ্রহণে পার্থক্য দেখা যায়।

৩. Endocrines, Tonsils এবং Lymphatic Glands- এ পরিবর্তন দেখা যায়।

৪. Protein Metabolism কমিয়া যায়।

৫. Phosphates এবং Chlorides কম পরিমাণে নির্গত হয় এবং Gaseous Metabolism-এর অবনতি হয়।

৬. হজমশক্তি ব্যাহত হয়। খাদ্যবস্তুর প্রোটিন ও চর্বির ভাগ শরীর গঠনে অপর্যাপ্ত হয়।

৭. শ্বাস গ্রহণের শক্তি হ্রাস পায় এবং বাকশক্তির যন্ত্রাদিতে পরিবর্তন সূচিত হয়।
৮. স্নায়ুমন্ডলী অবসন্ন ও অনুভূতিশক্তি শিথিল হয়।
৯. স্মরণশক্তি কমিয়া যায় এবং কোন বিষয়ে একাগ্রতা থাকে না।

এই সকল পরিবর্তন একটি সুস্থ নারীকে রুগ্নতার এত নিকটবর্তী করিয়া দেয় যে, সুস্থতা এবং রুগ্নতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। শতকরা এমন ত্রিশজন নারী পাওয়াও দুষ্কর, যাহাদের ঋতুকালে কোন বেদনা বা কষ্ট হয় না। একবার এক হাজার যাটজন নারীকে পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন ঋতুকালে কোন না কোন প্রকারের বেদনা অথবা কষ্ট ভোগ করিয়াছে। শরীর বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এলিম নুডিক বলেনঃ

ঋতুমতী স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাধারণত যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা নিম্নরূপঃ

মাথাব্যথা, অবসাদ, অংগ-প্রত্যংগে বেদনা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, স্বভাবে রুক্ষতা, মূত্রনালীতে যন্ত্রণা, হজমশক্তি হ্রাস পাওয়া, কোন কোন অবস্থায় কোষ্ঠ কাঠিন্য, সময় সময় বমির ভাব এবং বমন হওয়া। বেশ কিছু সংখ্যক নারীর বক্ষে মৃদু বেদনা বোধ হয় এবং কোন সময়ে তাহা অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়। কোন কোন নারীর এই সময়ে কন্ঠস্বর ভারী হইয়া পড়ে। আবার কখনও হজমশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়।

ডাক্তার ক্রেগার যত নারীকে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অর্ধেক এমন ছিল যাহাদের ঋতুকালে হজমশক্তির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে এবং শেষের দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়াছে।

ডাক্তার গীব হার্ড বলেনঃ

এমন নারী খুব কমই পাওয়া গিয়াছে যাহাদের মাসিক ঋতুকালে কোন কষ্ট হয় নাই। অধিকাংশ এমন পাওয়া গিয়াছে যাহাদের মাথা বেদনা,

অবসাদ, নাভীর নিম্নভাগে বেদনা হইয়াছে এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে। এই সময়ে তাহাদের মেজাজ খিটখিটে হয় এবং কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

এই অবস্থায় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মাসিক ঋতুকালে একটি নারী প্রকৃতই রুগ্ন হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার ব্যারাম, যাহা প্রতি মাসেই একটি স্ত্রীলোককে আক্রান্ত করে।[১]

এই সকল শারীরিক পরিবর্তন নারীর মানসিক শক্তি ও অংগ-প্রত্যংগাদির উপর অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্রিয়া করে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (Dr. Voicechevsky) গভীর পর্যবেক্ষণের পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে নারীর একাগ্রতাশক্তি ও মানসিক শ্রমশক্তি হ্রাস পায়। অধ্যাপক (Krschiskevsky) মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐ সময় নারীদের স্নায়ুমন্ডলী উত্তেজিত হইয়া পড়ে। অনুভূতি শক্তি শিথিল ও সামঞ্জস্যহীন হইয়া যায়। সুবিন্যস্ত চিন্তা-প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। এমনকি পূর্ব হইতে মনের কোণে প্রতিফলিত স্থির-সিদ্ধান্তেও বিচলতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে তাহার দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্যকলাপে সে অভ্যস্ত এই সময়ে তাহাও ঠিক থাকে না।

এই সময়ে ট্রামের মহিলা কন্ডাকটর টিকেট দিতে এবং রেজকী গণনা করিতে ভুল করিবে। মোটর চালিকা ভয়ে ভয়ে ও ধীরে ধীরে মোটর চালনা করিবে এবং প্রতিটি মোড়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে। একজন মহিলা টাইপিস্ট ভুল টাইপ করিবে, টাইপ করিতে বিলম্ব করিবে, চেষ্টা সত্ত্বেও শব্দ ছুটিয়া যাইবে, ভুল বাক্য টাইপ করিবে এবং এক অক্ষরে আঙ্গুলের আঘাত করিতে যাইয়া অন্য অক্ষরের উপর আঙ্গুল পড়িবে। মহিলা ব্যারিষ্টার সঠিকভাবে মামলা প্রমাণ করিতে পারিবে না। মামলা পেশ করিতেও যুক্তি প্রদর্শনে ভুল করিবে। মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বোধশক্তি হ্রাস পাইবে এবং সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করিবে। একজন দন্ত চিকিৎসিকা দন্ত উৎপাটনের যন্ত্রপাতি কাজের সময়ে সহজে হাতের কাছে পাইবে না। একজন গায়িকা তাহার সুর ও তালমান হারাইয়া ফেলিবে। এমন কি একজন কণ্ঠবিশারদ স্বর শুনিয়াই বলিয়া দিতে পারিবে যে, গায়িকা ঋতুমতী। মোটকথা, ঋতুকালে নারীর মন-মস্তিষ্ক এবং

১. গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা মাসিক ঋতুকে 'মাসিক ব্যারামই' বলিয়া থাকে। -অনুবাদক

স্নায়বিক যন্ত্র দুর্বল ও বিশৃংখল হইয়া পড়ে। তাহার ইচ্ছানুযায়ী অংগ-প্রত্যংগাদি কার্য করিতে পারে না; বরং আভ্যন্তরীণ একটা প্রভাবশীল শক্তি তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার দ্বারা অনিচ্ছাকৃত কার্য হইতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার কর্ম-স্বাধীনতা আর থাকে না এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিবার যোগ্যতা সে হারাইয়া ফেলে।

অধ্যাপক লাপিনস্কি [Lapinsky] তাহার The Development of personality in Women নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে, মাসিক ঋতুকালে নারীদের কর্মস্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। একটা প্রভাবশীল শক্তি তাহাকে বাধ্যানুগত করিয়া ফেলে। স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা না করার ক্ষমতা প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল পরিবর্তন একজন স্বাস্থবতী নারীর মধ্যে সংঘটিত হয় এবং ইহা ক্রমশ রোগে পরিণত হয়। এইরূপ বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, এই অবস্থায় নারী পাগলিনীর ন্যায় হইয়া পড়ে। সামান্য উত্তেজনায় অতিমাত্রায় রাগান্বিত হওয়া, পশু ও নির্বোধের ন্যায় কোন কিছু করিয়া ফেলা, এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করা অসম্ভব নহে। ডাক্তার ক্রাফট এবিং [Kraft Ebing] বলেন, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল নারীকে বিনয়ী, ভদ্র এবং প্রফুল্লচিত্ত দেখতে পাই, মাসিক ঋতুকালে তাহাদের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আসিয়া যায়। এই সময়টি তাহাদের নিকটে যেন একটা 'ঝড়ের' ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহারা রুক্ষ, ঝগড়াটে এবং অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। বাড়ীর চাকর-বাকর, ছেলে-মেয়ে এবং স্বামী পর্যন্ত তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া পড়ে। এমন কি অপরিচিত লোকের প্রতিও তাহারা ভাল ব্যবহার করে না। কোন কোন বিশেষজ্ঞ গভীর অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারীদের অধিকাংশ অপরাধমূলক কার্য ঋতুকালে সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ এই সমময়ে তাহারা নিজেকে সংযত রাখিতে পারে না। এমন সময়ে একজন অতি সৎ নারীও চুরি করিয়া বসে এবং পরে অনুতপ্ত হয়। ওয়েনবার্গ [Weinberg] গভীর পর্যবেক্ষণের পর মন্তব্য করিয়াছেনঃ

আত্মহত্যাকারী নারীদের শতকরা ৫০ জন ঋতুকালেই এই কাজ করিয়া থাকে। ইহার ভিত্তিতে ডাক্তার ক্রাফট এবিং এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, অপরাধী সাবালিকা নারীর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা চলাকালে কর্তৃপক্ষের

অনুসন্ধান করা উচিত যে, এই অপরাধ তাহার ঋতুকালে সংঘটিত হইয়াছিল কি না।

মাসিক ঋতু অপেক্ষা গর্ভাবস্থা অধিকতর কঠিনকাল। ডাঃ রিপ্রেভ [Reprev] বলেন যে, নারীর অতিরিক্ত দৈহিক উপাদানগুলি ক্ষুধার্ত অবস্থায় যত পরিমাণে নির্গত হয়, গর্ভাবস্থায় তদপেক্ষা অধিক পরমাণে নির্গত হয়। নারীর স্বাভাবিক অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিবার যে মক্তি থাকে, গর্ভাবস্থায় তাহা থাকে না। এই সময়ে নারীর যে অবস্থা হয়, তাহা যদি পুরুষের হয় অথবা নারীর অগর্ভাবস্থায় হয়, তাহা হইলে তাহাকে রোগী বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এই সময়ে কয়েক মাস তাহাকে রোগী বলিয়া ঘোষণা করতে হইবে। এই সময়ে কয়েক মাস ধরিয়া তাহার স্নায়বিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহার যাবতীয় মানসিক উপাদানগুলি একটা একটানা বিশৃংখলায় পতিত হয়। সে রোগ ও সুস্থতার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে। অতপর তুচ্ছ কারণে সে রুগ্নতার সীমায় উপনতি হয়। ডাক্তার ফিশার বলেন যে, একজন সুস্থ নারী গর্ভধারণকালে কঠিন মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগে। তাহার মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা দেখা যায়। স্মৃতিশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে এবং অনুভূতি, চিন্তা-গবেষণা ও বোধশক্তি কমিয়া যায়। হিউলাক, ইলিয়াস, এল্‌বার্ট মোল এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সর্ববাদিসম্মত অভিমত এই যে, গর্ভকালীন শেষ মাসটি এমন অবস্থায় কাটে যে, এই সময়ে নারীর কোন প্রকার দৈহিক ও মানসিক শ্রম করিবার যোগ্যতাই থাকে না।

সন্তান প্রসবের পর বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকে। প্রসূতির সেপটিক রোগে ভুগিবারও আশংকা থাকে। গর্ভকালের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অংগ-প্রতংগে একটা আলোড়ন-সঞ্চালনের সৃষ্টি হয়, যাহার কারণে সমস্ত শারীরিক ব্যবস্থা বিশৃংখল হইয়া পড়ে। কোনরূপ আশংকা না থাকিলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে তাহার কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লাগিয়া যায়। এইভাবে গর্ভ সঞ্চারের পর হইতে পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত নারী প্রকৃত পক্ষে রুগ্না অথবা অর্ধরুগ্না থকে। ফলে তাহার কর্মশক্তি স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অর্ধেক অথবা তদপেক্ষা কম হইয়া পড়ে।

অতপর স্তন্যদানের কালটা এমন যে, এই সময়ে সে নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না; বরং প্রকৃতি তাহার নিকটে যে আমানত গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহা পূরণের জন্যই সে জীবন ধারণ করে। এই সময়ে তাহার শরীরে মূল্যবান পদার্থসমূহ তাহার সন্তানের জন্য স্তন্যদুগ্ধে পরিণত হয়। আহার্য বস্তু হইতে যতটুকু পরিমাণে তাহার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই তাহার দেহে সন্নিবেশিত হয় এবং অবশিষ্ট স্তন্যদুগ্ধে পরিণত হয়। ইহার পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাহার সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়।

বর্তমান যুগে স্তন্যদান সমস্যার এইরূপ সমাধান করা হইয়াছে যে, শিশুদিগকে বাহির হইতে আহার্য যোগাইতে হইবে। কিন্তু ইহা কোন সুষ্ঠ সমাধান নহে। কারণ প্রকৃতি মাতৃস্তন্যে শিশু প্রতিপালনের যে সামগ্রী সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপযোগী বিকল্প আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা বিরাট অন্যায় ও স্বার্থপরতা বৈ আর কিছুই নহে। এই বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞ একমত যে শিশুর সত্যিকার বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃস্তন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য আর কিছুই নহে।

মাতা যাহাতে তাহার শিশু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ইহয়া নিশ্চিন্ত মনে বহির্বাটীর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তাহার জন্য শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে 'নার্সিং হোম' বা 'শিশু-সদনের' প্রস্তাব উথাপিত হইয়াছে। কিন্তু 'নার্সিং হোম বা শিশু-সদনে, অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ সরবরাহ করা সম্ভব নহে। শৈশবের প্রাথমিক অবস্থায় যে স্নেহ-ভালবাসা, যে দরদ ও শুভাকাঙ্খার প্রয়োজন হয়, তাহা ভাড়াটিয়া প্রতিপালিকার হৃদয়ে কোথা হইতে আসিবে? শিশু প্রতিপালনের এই নূতন পদ্ধতি এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। শিশু সদনের নূতন কারখানার তৈরী বংশধর এখনও ফলদান করে নাই। এখন পর্যন্তও তাহাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং কীর্তি-কলাপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব এই পরীক্ষাকার্যের সাফল্য ও অসাফল্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই মন্তব্য করা সমীচীন হইবে না যে, জগত মাতৃক্রোড়ের সুষ্ঠু বিকল্প ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়াছে। শিশুর প্রাকৃতিক লালনাগার ও শিক্ষাগার যে মাতৃক্রোড়ে, এই সত্য এখনও সর্বজন স্বীকৃত।

এখন ইহা একজন সামান্য বিবেকসম্পন্ন লোকেরও বোধগম্য যে, নারী–পুরুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং যোগ্যতা যদি সমানও হয়, তথাপি প্রকৃতি উভয়ের উপরে সমান দায়িত্ব অর্পণ করে নাই। বংশীয় স্থায়িত্বের জন্য বীজ বপন ব্যতীত পুরুষের উপর কোন কাজ চাপান হয় নাই। ইহার পর সে সম্পূর্ণ স্বাধীণ। জীবনের অন্য যে কোন কাজ সে করিতে পারে। পক্ষান্তরে বংশীয় স্থায়িত্ব বিধানের জন্য কাজ করিবার সকল দায়িত্ব নারীর উপরে অর্পিত হইয়াছে। যখন সে মাতৃগর্ভে একটা ভ্রূণাগারে অবস্থান করিত; তখন হইতেই তাহাকে এই দায়িত্ব সামলাইবার যোগ্য করিয়া পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করা হয়। তাহার শরীরের যাবতীয় যন্ত্রাদি ইহারই উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। ইহারই জন্য তাহার সমগ্র যৌবনে মাসিক ঋতুর বিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই সময় প্রতিমাসে তিন হইতে দশদিন পর্যন্ত সে কোন অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালনে এবং কোনরূপ কঠিন শারীরিক ও মানসকি পরিশ্রম করিতে অপরাগ হয়। ইহারই জন্য তাহাকে গর্ভ ও গর্ভোত্তরকালীন পূর্ণ একটি বৎসর ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই সময়ে সে প্রকৃতপক্ষে অর্ধজীবিত অবস্থায় থাকে। ইহারই জন্য স্তন্যদানের দুইটি বৎসর তাহার এমনভাবে কাটে যে, সে স্বীয় রক্তদ্বারা মানবতার ক্ষেত্রে জলসেচন করে এবং বুকের স্রোতধারায় উহাকে সুজলা–সুফলা করিয়া তোলে। ইহারই জন্য শিশুর প্রাথমিক পরিচর্যা প্রতিপালনের কয়েকটি বৎসর এমন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে তাহার অতিবাহিত হয় যে, এই সময়ে রাতের নিদ্রা এবং দিনের বিশ্রাম তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়। এইভাবে সে স্বীয় সুখ–শান্তি, আনন্দ–উপভোগ, প্রকৃতির বাসনা সকল কিছুই ভবিষ্যত বংশধরের জন্য বিসর্জন দেয়।

প্রকৃত ব্যাপারে এই হইলে চিন্তা করিয়া দেখুন সুবিচার কোনটি। ইহাই কি সুবিচার যে, নারী প্রকৃতিপ্রদত্ত সকল দায়িত্ব একাই পালন করিবে এবং উপরন্তু সকল তামাদ্দুনিক দায়িত্বের বোঝাও তাহার স্কন্ধে চাপান হইবে যাহা পালন করিবার জন্য পুরুষকে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে? তাহাকে কি এ কথা বলা হইবে? 'হে নারী! যে সকল দুঃখ–কষ্টের বোঝা প্রকৃতি তোমার উপরে চাপাইয়াছে, তাহাও বহন কর এবং তদুপরি আমাদের সহিত যোগদান করত জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম কর। দেশ–শাসন, বিচার, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, দেশে শান্তি স্থাপন, দেশরক্ষা প্রভৃতি কাজে আমাদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ কর। আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া

আমাদের চিত্তবিনোদন কর। আমাদের বিলাস-বাসন, আনন্দ-উল্লাস ও সুখ-সম্ভোগের উপাদান সংগ্রহ কর।'

ইহা সুবিচার নহে-অবিচার, সাম্য নহে-স্পষ্ট অসাম্য। সুবিচার তো ইহাই হওয়া উচিত যে, প্রকৃতি যাহার উপরে অনেক বেশী দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছে, তাহাকে সমাজের লঘু ও সহজ কাজ করিতে দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতি যাহার উপরে কোনই দায়িত্ব অর্পণ করে নাই, তাহাকেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক শ্রমসাপেক্ষ কার্য করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত তাহাকে পরিবারের ভরণ- পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে।

নারীর উপরে বহির্বাটির কাজ চাপান শুধু অবিচারই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লেখিত পুরুষোচিত কার্য সমাধা করিবার পূর্ণ যোগ্যতাও তাহার নাই। যাহার কর্মশক্তি অটল, যে ধারাবাহিকভাবে এবং সর্বদা স্বীয় কর্তব্য এইরূপ যোগ্যতার সহিত সমাধা করিতে পারে এবং যাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তির উপর আস্থাশীল হওয়া যায়, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এই সকল কার্য করার যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু যে সকল কর্মী প্রতি মাসে পর্যাপ্তকাল অযোগ্য অথবা স্বল্পযোগ্য হইয়া পড়ে এবং যাহাদের কর্মশক্তি বারংবার বাঞ্ছিত মান হইতে নিম্নগামী হয়, তাহারা কেমন করিয়া এই সকল দায়িত্বের বোঝা বহন করিবে? নারীগঠিত একটি সেনাবাহিনী অথবা নৌ-বাহিনীর কথা চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার মধ্যে ঠিক যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক ঋতুমতী হইয়া অর্ধ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, বেশ কিছু সংখ্যক সুতিকাগৃহে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে এবং একটা বিশস্তদল গর্ভধারণ করিয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে? সেনাবাহিনীর উদাহরণ দিলে আপনি বলিবেন যে, ইহা তো বড় কঠিন কাজ। কিন্তু পুলিশ, বিচার বিভাগ, দৌত্যকার্য, রেলওয়ে এবং শিল্পবাণিজ্যের কথাই বলুন। ইহার মধ্যে কোনটার দায়িত্বই বা এমন; যাহার জন্য সদানির্ভরশীল যোগ্য কর্মশক্তির প্রয়োজন হয় না? তাহা হইলে যাহারা নারীর দ্বারা পুরুষের কাজ লইতে চায়, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সমগ্র নারী জাতিকে পুরুষ বানাইয়া মানব বংশ ধ্বংস করিতে হইবে অথবা শতকরা কিছু সংখ্যক নারীকে বাধ্যতামূলকভাবে পুরুষ সাজাইয়া শাস্তি ভোগের জন্য নির্বাচিত করিতে হইবে অথবা সমাজের সকল প্রকার কাজে যোগ্যতার মান অবনত করা হইবে।

কিন্তু আপনি উপরিউক্ত পন্থাগুলির যে কোনটিই অবলম্বন করুন না কেন, নারীকে পুরুষের কাজের জন্য প্রস্তুত করা প্রকৃতির দাবি ও রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইহা মানবতা ও নারী সমাজ কাহারও জন্য মংগলজনক নয়। যেহেতু শরীর-বিজ্ঞান অনুযায়ী নারীকে সন্তান প্রসব ও তাহার প্রতিপালনের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইজন্য মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়াও তাহার মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, সহানুভূতি, স্নেহ বাৎসল্য, হৃদয়ের কোমলতা, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, নমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রভৃতি গুণাবলী গচ্ছিত রাখা হইয়াছে-যাহা প্রকৃতিপ্রদত্ত দৈনন্দিন কার্যের সম্পূর্ণ উপযোগী।

দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে ক্রিয়ার এবং নারীকে ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য নারীর মধ্যে এমন সব গুণের সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা তাহাকে শুধু প্রভাবিত হওয়ার দিকে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত করে। তাহার মধ্যে কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা, কোমলতা ও নমনীয়তা আছে। প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে প্রভাব গ্রহণের উপাদান আছে। ক্রিয়ার পরিবর্তে ক্রিয়া গ্রহণের ক্ষমতা আছে। দৃঢ়তা ও অটলতার পরিবর্তে নতি-স্বীকার ও বিনয়-নম্রতার প্রবণতা আছে। ঔদ্ধত্য ও সাহসিকতার পরিবর্তে অস্বীকৃতি, পলায়নের মনোভাব ও বাধাদান আছে। যে সকল কার্যে এবং জীবনের যে সকল বিভাগে কঠোরতা, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, প্রতিবন্ধকতা ও উপেক্ষা-অবহেলার প্রয়োজন হয়, যাহাতে ক্ষীণ আবেগ ইচ্ছার পরিবর্তে দৃঢ়-সংকল্প ও অভিমতের প্রয়োজন হয়, সেখানে নারী কিরূপে সাফল্য অর্জন করিতে পারে? সমাজের এই সকল বিভাগে নারীকে টানিয়া আনার অর্থ নারীত্বকে ধ্বংস করা এবং সকল বিভাগকেও ধ্বংস করা।

ইহার দ্বারা নারীর উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই হয়। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রতিভা দমিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কৃত্রিম যোগ্যতা সৃষ্টি করাকে উন্নতি বলে না, বরং স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ সাধন ও স্ফুরণ এবং তাহার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াকেই প্রকৃত উন্নতি বলে।

ইহাতে নারীত্বের কোন সাফল্য নাই, বরং অসাফল্যই রহিয়াছে। জীবনের কোন দিকে নারী দুর্বল এবং পুরুষ সবল অগ্রসর। আবার কোন দিকে পুরুষ দুর্বল, নারী অগ্রগামিনী। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় জীবনের এমন দিকে হতভাগ্য নারীকে দাঁড় করান হইতেছে, যেদিকে সে দুর্বল। ইহার অবশ্যম্ভাবী

পরিণাম এই হইবে যে, নারী সর্বদা পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট প্রমাণিত হইবে। যত প্রকার পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, নারী জাতির মধ্য হইতে এরিস্টটল, ইবনে সীনা, কান্ট, হেগেল, ওমর খাইয়াম, শেক্সপীয়র, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, সালাহউদ্দীন, নিযাম-উল-মুল্ক তূসী, বিস্‌মার্ক প্রমুখ ব্যক্তির ন্যায় কোন ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিবীর পুরুষ জাতি মিলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও তাহাদের মধ্য হইতে একটি সাধারণ শ্রেণীর মাতাও প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

ইহাতে তমদ্দুনের মংগল না হইয়া অমংগলই হয়। মানবীয় জীবন ও সভ্যতার জন্য যেমন কঠোরতা-নির্মমতার প্রয়োজন আছে, তেমন প্রয়োজন আছে কোমলতা ও নমনীয়তার। যতখানি প্রয়োজন আছে দক্ষ সেনাপতির, বিচক্ষণ পরামর্শদাতার ও উৎকৃষ্ট শাসকের ততখানি প্রয়োজন আছে উৎকৃষ্ট মাতার, উৎকৃষ্ট সহধর্মিনী ও পরিবার-পরিজনের। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাহাকেই বাদ দেওয়া হউক না কেন, তমদ্দুন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই।

ইহা এমনই এক কর্মবন্টন (Division of work) যাহা প্রকৃতি উভয় শ্রেণীর মধ্যে করিয়া দিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র এই কর্ম বন্টনের দিকেই ইংগিত করিতেছে। সন্তান প্রসব ও পালনের দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হওয়া একটি সিদ্ধান্তকর সত্য। ইহা মানবীয় তমদ্দুনে তাহার জন্য একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কোন কৃত্রিম ব্যবস্থাই এই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করিতে পারে না। একটি সৎ তমদ্দুন ইহাই হইতে পারে যে, এই সিদ্ধান্তকে হুবহু মানিয়া লইবে। অতপর নারীকে তাহার সঠিক স্থানে রাখিয়া তাহার সামাজিক সম্ভ্রম দান করিবে। তাহার ন্যায়সংগত তামাদ্দুনিক ও আর্থিক অধিকারসমূহ মানিয়া লইবে। শুধু গৃহের দায়িত্বই তাহার উপর ন্যস্ত করিবে এবং বহির্বাটির দায়িত্ব ও পরিবারের অভিভাবকত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করিবে। যে তমদ্দুন এই কর্মবন্টনকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে, সে সাময়িকভাবে বৈষয়িক উন্নতি ও জাঁকজমকের মহড়া প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে তমদ্দুনের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কারণ পুরুষের সমান আর্থিক ও তামাদ্দুনিক দায়িত্ব যখন নারীর উপর ন্যস্ত করা হইবে, তখন সে নিজের উপর ন্যস্ত প্রাকৃতিক দায়িত্বের বোঝা দূরে নিক্ষেপ করিবে। ফলে ইহা দ্বারা শুধু তমদ্দুনই ধ্বংস হইবে না,

মানবতাও ধ্বংস হইয়া যাইবে। নারী যদি তাহার স্বভাব ও প্রাকৃতিক গঠনের পরিপন্থী কোন চেষ্টা করে, তাহা হইলে কিছু না কিছু পরিমাণে তা পুরুষের কাজ সামলাইয়া লইবে, কিন্তু পুরুষ কিছুতেই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালনের যোগ্য হইতে পারিবে না।

প্রকৃতির এই কর্ম বন্টনকে সম্মুখে রখিয়া যে পরিবারিক ব্যবস্থা হইবে এবং নারী–পুরুষের যে ভাতা নির্দিষ্ট করা হইবে, তাহার অনিবার্য শর্তগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১. পরিবারের জন্য উপার্জন করা, উহার সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, তমদ্দুনে শ্রমজনিত কাজ করা পুরুষের কাজ হইবে। ইহার শিক্ষা–দীক্ষা এমন হইতে হইবে যেন তাহা এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিক পরিমাণে উপযোগী হয়।

২. সন্তান প্রতিপালন, গৃহাভ্যন্তরীণ কাজকর্ম, পারিবারিক জীবনকে স্বর্গীয় মধুর করিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজ নারীর হইবে। তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়া এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

৩. পারিবারিক শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এবং ইহাকে যত মাথা তত নেতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে আইনানুগ কর্তৃত্ব দান করিতে হইবে, যেন পরিবার একটি মস্তকবিহীন সেনাবাহিনীতে পরিণত না হয়। মনে রাখিতে হইবে, এমন ব্যক্তি একমাত্র পুরুষই হইতে পারে। কারণ বারংবার মাসিক ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় পরিবারের যে সদস্যটির মন–মস্তিষ্কের অবনতি ঘটে, সে কোন অবস্থাতেই এই ক্ষমতা ব্যবহারের যোগ্য হইতে পারে না।

তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় এই কর্ম বন্টন, শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে কোন নির্বোধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নির্বুদ্ধিতাবশত নারী–পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে এক করিয়া সেই সৎ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া না দেয়।

মানবীয় ত্রুটি–বিচ্যুতি

মানবীয় প্রকৃতির চাহিদা এবং তাহার মানবিক প্রবণতা ও শারীরিক গঠনের যাবতীয় নিদর্শনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটা সুষ্ঠ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে নর–নারী সম্পর্ক তথা যৌন সম্পর্কের দিক দিয়া তাহার মূলনীতি ও শর্তাবলী কি কি হওয়া বাঞ্ছনীয়, এতদসম্পর্কে ইতিপূর্বে নিরেট জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনায় যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে এবং ইহাতে কোনরূপ দ্বিরুক্তিরও অবকাশ নাই। আলোচিত বিষয়গুলি জ্ঞান–বিজ্ঞানের দিক দিয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সাধারণত সকল সুধীবৃন্দ এ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার চরম পরাকাষ্ঠা এই যে, যত প্রকার তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা মানুষ আপন প্রচেষ্টায় প্রণয়ন করিয়াছে, তাহা কোন একটিতেও প্রকৃতির এই সকল সুস্পষ্ট ও ন্যায়সংগত উপদেশ পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জসরূপে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। মানুষ যে তাহার প্রাকৃতিক চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞ নহে, ইহাও তো সুস্পষ্ট। স্বীয় মানসিক অবস্থা ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাহার অজানা নাই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, সে এ যাবত এমন কোন সুসমঞ্জস তাহাদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহার মুলনীতির মধ্যে এই সকল দাবি, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সুসমঞ্জসরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

নৈরাশ্যের প্রকৃত কারণ

নৈরাশ্যের একমাত্র কারণ উহাই, যাহার প্রতি এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইংগিত করা হইয়াছে। মানুষের ইহা একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, মানুষের দৃষ্টি কোন বিষয়ের সকল দিকে সামগ্রিকভাবে পতিত হয় না। সর্বদা যে কোন একটি দিক তাহাকে আকৃষ্ট করে। অতপর যখন সে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন অন্যদিকটি তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে অথবা সে ইচ্ছা করিয়াই

অপরদিকসমূহ উপেক্ষা করিয়া চলে; জীবনের ছোটখাট ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তো মানুষের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়।

তাহযীব ও তমদ্দুনের সমস্যা বহুবিধ ও ব্যাপকতর। এই সকল সমস্যার আবার অসংখ্য সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট দিক আছে। অতএব এই সকল সমস্যা মানুষের দুর্বলতার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে ইহা কি করিয়া সম্ভব?

মানুষকে তো অবশ্য জ্ঞান-বিবেক দান করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত জীবন সমস্যা সমাধানে শুধু বিবেক তাহার সহায়ক হয় না। অনুরাগ ও ঝোঁকপ্রবণতা তাহাকে একমুখো করিয়া দেয় এবং যখন সে বিশেষ একটি দিকে চলিতে থাকে, তখন সে তাহার সমর্থনে জ্ঞান-বিবেকের সাহায্য গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় তাহার জ্ঞান যদি তাহাকে অন্যদিকে চালিত করিতে চায় এবং বিবেক তাহার একমুখো মনোভাবের প্রতিবাদ করে, তবুও সে তাহার অপরাধ স্বীকার করে না, বরং আকাংক্ষা-অনুরাগের সপক্ষে যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করিতে সে তাহার জ্ঞান-বিবেককে বাধ্য করে।

কতিপয় সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত

বর্তমানকালে সমাজের যে সকল সমস্যা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, তাহার মধ্যে মানুষের এই একগুঁয়েমি, চরম বাড়াবাড়ি ও ন্যূনতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

একদল লোক নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া নারী-পুরুষের যৌন-সম্পর্ককে একেবারে একটি ঘৃণার্হ কাজ মনে করিল। এই অসামঞ্জস্য আমরা বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও হিন্দু ধর্মমতে দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারই প্রভাবে পৃথিবীর একটি বিরাট অংশে, পরিবারের গণ্ডির মধ্যে হউক অথবা গণ্ডিবহির্ভূত হউক-এই যৌন-সম্পর্ককে গর্হিত কাজ মনে করা হয়। ইহার পরিণাম কি হইয়াছে? সন্নাসবাদের অপ্রাকৃতিক ও তমদ্দুনবিরোধী জীবনকে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য মনে করা হইয়াছে। মানব জাতির মধ্যে নারী-পুরুষের অনেকেই প্রকৃতির বিপরীত পথে, তথা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তির অপচয় করিল। যাহারা প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী পরস্পর মিলিত হইল, তাহারা এই মন লইয়া মিলিত হইল, যেন তাহারা বাধ্য হইয়া একটা

ঘৃণিত আবশ্যক পূরণ করিল। প্রকাশ থাকে যে, এই ধরনের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন প্রেম-ভালবাসা অথবা কোন সাহায্য-সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারে না। ইহা দ্বারা কোন সৎ ও উন্নতিশীল তমদ্দুন কেবল জন্মলাভ করিতে পারে না ইহাই নহে, বরং তথাকথিত নৈতিক ধারণার ফলেই নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। সন্ন্যাসবাদের অন্ধ সমর্থকরা যৌন আকর্ষণকে একটা শয়তানী প্ররোচণা এবং নারীকে 'শয়তানের দালাল' নামে অভিহিত করিয়াছে। নারীকে তাহারা এইরূপ একটা অপবিত্র সত্তা ধরিয়া লইয়াছে এবং যে ব্যক্তি মনের পবিত্রতা কামনা করে তাহার পক্ষে উক্ত নারীকে ঘৃণা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। খৃষ্ট, বৌদ্ধ ও হিন্দু সাহিত্যে নারী সম্পর্কে এই প্রকার ধারণা দেওয়া হইয়াছে এবং এই ধারণা ও মতবাদের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে নারীর মর্যাদা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঠিক ইহার বিপরীত আর একদল আছে, যাহারা দৈহিক চাহিদার পক্ষপাতী এবং এ ব্যাপারে তাহারা এতদুর অগ্রসর হইয়াছে যে, মানব প্রকৃতি তো দূরের কথা, পশু প্রকৃতির চাহিদাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইহা এমনভাবে পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর গোপন রাখিবার উপায় নাই। তথাকার আইনে ব্যভিচার কোন অপরাধ নহে। বলপ্রয়োগ অথবা অপরের আইনানুগ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার যে কোন একটি অপরাধ না করিলে ব্যভিচার কোন শাস্তিমূলক অপরাধ তো হয়ই না, উপরন্তু ইহা কোন লজ্জাজনক অপরাধ বলিয়াও বিবেচিত হয় না। এতদুর পর্যন্ত তো তাহারা পশু প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যেই ছিল। কিন্তু পরে তাহারা অধিকতর অগ্রসর হইল। পশুদের যৌন-সম্পর্কের উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধিকেও তাহারা উপেক্ষা করিল। তাহারা যৌন-সম্পর্ককে নিছক দৈহিক আনন্দ সম্ভোগের মাধ্যম করিয়া লইল। যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করা হইল, সে এইখানে পৌছিয়া নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হইল। প্রথমত সে মানব প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পশুর ন্যায় এমন উচ্ছৃংখল যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে যাহার ভিত্তিতে কোন তমদ্দুন গাড়িয়া উঠিতে পারে না। অতপর সে পশুপ্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত হইয়া যায় এবং যৌন-সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণাম--সন্তানের জন্মলাভও বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার উদ্দেশ্য এই, যেন মানব জাতির অস্তিত্ব রাখিবার জন্য ভবিষ্যত বংশধর জন্মলাভ করিতে না পারে।

একটি দল পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিল বটে, কিন্তু এমন এক বিধি বন্ধনের ভিতর দিয়া তাহার ব্যবস্থাপনা করা হইল যে, ব্যক্তির গলায় শৃংখল পরান হইল এবং অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে কোন ভারসাম্য রক্ষিত হইল না। হিন্দুদের পারিবারিক ব্যবস্থাই ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে নারীর ইচ্ছা ও কর্মের কোন স্বাধীনতা নাই। তমদ্দুন ও জীবিকার্জনে তাহার কোন অধিকার নাই, সে কন্যা থাকাকালীন দাসী, স্ত্রী থাকাকালীন দাসী এবং মাতা থাকাকালীনও দাসী। বৈধব্যাবস্থায় তাহার জীবন দাসী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, সে জীবিতাবস্থায় মৃতের ন্যায়। তাহার ভাগ্যে শুধু কর্তব্য পালন রহিয়াছে, অধিকার বলিতে কিছুই নাই। এই সমাজ ব্যবস্থার অধীনে নারীকে প্রথম হইতেই একটি বাকহীন প্রাণী বানাইবার চেষ্টা করা হয়, যেন আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাহার কোন অনুভূতিরই সঞ্চার না হয়। এই পন্থায় পরিবারের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সন্দেহ নাই এবং উক্ত পরিবারে নারীর বিদ্রোহ করার কোন আশংকাই থাকে না। কিন্তু জাতির অর্ধাংশকে হেয়, অধপতিত করিয়া এই সমাজ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইহার গঠন পদ্ধতি এমন এক ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে যাহার পরিণাম ফল এখন হিন্দু সমাজ ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় দল নারীর মর্যাদা উন্নত করিবার চেষ্টা করিল এবং ইচ্ছা ও কর্মে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। এ ব্যাপারে এতটা সীমা লংঘন করা হইল যে, পারিবারিক শৃংখলা একেবারে বিনষ্ট হইল। সে স্ত্রী স্বাধীন, কন্যা স্বাধীন, পুত্র স্বাধীন! প্রকৃতপক্ষে পরিবারের মধ্যে মাথা-মুরব্বী বলিতে কেহ নাই। কাহারও কোন কর্তত্ব নাই। স্বামী স্ত্রীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না "তুমি রাত্রি কোথায় কাটাইলে?" পিতা তাহার কন্যাকে বলিতে পারে না, "তুমি কাহার সংগে মেলামেশা কর এবং কোথায় যাও? " স্বামী-স্ত্রী সমান সমান দুইজন বন্ধু মাত্র এবং তাহারা সমান শর্তে ঘর-সংসার করে। সন্তান এই 'পরিবার-সংঘের' অল্পবয়স্ক সদস্যস্বরূপ। মেজাজ ও প্রকৃতির সামান্য অনৈক্যের জন্য এই গড়া সংসার ধূলিসাত হইতে পারে। কারণ প্রতিটি শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যে আনুগত্যের উপকরণ অত্যাবশ্যক, এই দলের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। ইহাই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা। ইহা সেই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা, যাহার পতাকাবাহী দাবি করিয়া থাকে যে, তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থায় তাহারা বিপ্লব আনিয়াছে। তাহাদের বিপ্লবের সঠিক স্বরূপ দেখিতে হইলে ইউরোপ-আমেরিকার কোন বিবাহ-তালাক আদালতের অথবা

Juvenile Court'[১] –এর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখা দরকার। সম্প্রতি ইংলণ্ডের হোম অফিস হইতে অপরাধের যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অল্পবয়স্ক বালক–বালিকাদের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার প্রকৃত কারণও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, পারিবারিক শৃংখলা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।"[২]

মানব প্রকৃতি, বিশেষ করিয়া নারী প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা ও সম্ভ্রমশীলতার যে উপাদান রক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে এবং কার্যত পোশাক–পরিচ্ছদ ও সামাজিক পদ্ধতিতে উহার বাস্তবায়নে কোন মানবীয় তমদ্দুন সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই! লজ্জা–সম্ভ্রম মানুষের–বিশেষ করিয়া নারীর একটা পরম গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কোন যুক্তিসংগত উপায়ে ও অনুকূল রীতিনীতির ভিতর দিয়া পোশাক–পরিচ্ছদ ও সামাজিকতায় উক্ত গুণের বহিপ্রকাশ হয় নাই। 'সিত্রে আওরত–' এর সঠিক সীমা নির্ধারণে এবং তাহা সমানভাবে সংরক্ষণের কোন চেষ্টা কেহ করে নাই। নারী–পুরুষের পোশাক–পরিচ্ছদ ও চাল–চলনের মধ্যে লজ্জাশীতার রূপায়ণ কোন নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। পুরুষে–পুরুষে, নারীতে–নারীতে এবং নারী–পুরুষের মেলামেশা ও দেখা–সাক্ষাতে শরীরের কোন্ কোন্ অংশ আবৃত ও অনাবৃত থাকিবে, তাহার কোন সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত সীমা নির্ধারণই করা হয় নাই। সভ্যতা, ভদ্রতা ও সাধারণ নৈতিকতার দিক দিয়া ব্যাপারটির যতটা গুরুত্ব ছিল, ততটাই ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাকে কিছুটা দেশ প্রচলনের উপর ছাড়ি দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু প্রচলিত আচার ব্যবস্থা সামগ্রিক অবস্থার সংগে বদলাইয়া যায়। বিষয়টি ব্যক্তিবর্গের আপন আপন ইচ্ছা ও অভিরুচির উপরও কিয়দংশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে আবার সমস্ত মানুষ লজ্জাশীলতার দিক দিযয় এক নহে এবং প্রত্যেকের একই সুস্থ অভিরুচি ও নির্বাচন শক্তি নাই যে, আপন ইচ্ছামত কোন সঠিক পন্থা অবলম্বন করিবে। ইহারই পরিণামস্বরূপ বিভিন্ন দলের পোশাক–পরিচ্ছদে এবং সামাজিকতায় লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, 'পর্দা' নামক মূল গ্রন্থখানি প্রায় একষট্টি বৎসর পূর্বে লিখিত হয় এবং সহজেই অনুমান করা যায় যে, তথাকথিত প্রগতি বা আধুনিকতার উন্নতির সংগে অপরাধ প্রবণতাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

২. Blue Book of Crime Statistics for 1934 দ্র.

ইহার মধ্যে কোন যুক্তিসংগত পারস্পরিক সম্পর্ক, কোনরূপ ঐক্য, কোনরূপ আনুকূল্য অথবা নীতির বালাই দেখা যায় না। প্রাচ্যের দেশগুলিতে ইহা তো শুধু বিসদৃশ হইয়া রহিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগুলির পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিকতায় অশ্লীলতা এত দূর সীমা অতিক্রম করিয়া গেল যে, তাহারা লজ্জা-সম্ভ্রমের মূলোৎপাটনই করিয়া ফেলিল। তাহাদের নূতন দৃষ্টিভংগী এই হইল যে, লজ্জা ও শ্লীলতা কোন প্রাকৃতিক অনুভূতি নহে, বরং বস্ত্র পরিধানের অভ্যাসের দ্বারাই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। নৈতিকতা ও ভদ্রতার সংগে 'সতরে আওরত' ও লজ্জাশীলতার কোনই সম্পর্ক নাই, বরং মানবের যৌন আবেদন জাগ্রত করিবার ইহা একটি উপকরণ বিশেষ।[১] লজ্জাহীনতার এই দর্শনের বাস্তব রূপায়ণই হইতেছে অর্ধনগ্ন পোশাক, দৈহিন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, নগ্ন নৃত্য, নগ্নচিত্র, রংগমঞ্চে অশ্লীল অভিনয়, নগ্নতার (Nudsim) ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং সতীসাধ্বী, পূণ্যবতী নারীর পশুপ্রকৃতির দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন।

এই সমস্যার অপরদিকেও এই অমিতাচার দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নৈতিকতা ও পবিত্রতাকে গুরুত্ব দিয়াছে, তাহারা নারীর নিরাপত্তা বিধান করিয়াছে। তাহাকে একটি জীবন্ত বিবেকসম্পন্ন সত্তা মনে করিয়া নহে, বরং একটি প্রাণহীন অলংকার ও মূল্যবান রত্নের ন্যায় মনে করিয়া। তাহারা তাহার শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্নও এড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ তাহযীব-তমদ্দুনের কল্যাণের জন্য এই প্রশ্ন পুরুষের বেলায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, নারীর বেলায়ও তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যাহারা আবার নারীর শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল, তাহারা নৈতিকতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব উপেক্ষা করিয়া আর একদিক দিয়া তাহযীব-তমদ্দুন ধ্বংসের বীজ বপন করিল।

যাহারা প্রকৃতির কর্ম বন্টন (Division of Labour) ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিল, তাহারা তমদ্দুন ও সমাজ সেবায় শুধু গৃহের কাজকর্ম এবং সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নারীর উপর অর্পন করিল। জীবিকা অর্জনের ভার পুরুষের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু এই কর্ম বন্টনে তাহারা ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিল না। তাহারা নারীর সকল অর্থনৈতিক অধিকার কাড়িয়া লইল। উত্তরাধিকারে তাহাকে কোনই অধিকার দেওয়া হইল না। বিষয়-সম্পত্তির

---

[১] Wester Marck তাঁহার The History of Human Marriage গ্রন্থে অবিকল এই মত পোষণ করিয়াছেন।

মালিকানা ষোল আনা পুরুষকে দেওয়া হইল। এইভাবে নারীকে অর্থনৈতিক দিকদিয়া পংগু করিয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটা প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেওয়া হইল। ইহার প্রতিকারকল্পে অন্য একটি দলের আবির্ভাব হইল। তাহারা নারীকে অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক অধিকার দান করিতে চাইল। কিন্তু ইহারা আবার অন্য একটি ভ্রান্তি করিয়া বসিল। জড়বাদ তাহাদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এইজন্য তাহারা অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দাসত্ব হইতে নারীকে মুক্ত করার অর্থ ইহা বুঝিল যে, নারীকেও পুরুষের ন্যায় পরিবারের এক উপার্জনশীল ব্যক্তি হইতে হইবে। তমদ্দুনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিবার জন্য তাহাকেও পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল। কারণ ইহার দ্বারা শুধু পুরুষের গুরুভার লাঘব হইল না, বরং জীবিকার্জনে নারীর অংশ গ্রহণ করার ফলে প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিতাকারে অর্থ ও বিলাসিতার উপকরণাদি অর্জিত হইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ হস্ত ও মস্তিষ্ক জুটিয়া গেল। তাহার ফলে হঠাৎ তামাদ্দুনিক উন্নতি দ্রুততর হইতে লাগিল। বৈষয়িক ও অর্থনৈতি দিকে সীমাতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িবার পরিণাম এই হইল যে, তামাদ্দুনিক জীবনের অন্যান্য দিক অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হইল অথচ অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক দিক হইতে এই দিকগুলির গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল না। এইভাবে তাহারা প্রাকৃতিক বিধি-বিধান জানিবার পরেও তাহা স্বেচ্ছায় লংঘন করিয়া চলিল। তাহাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহারা নারীর প্রতি সুবিচারের দাবি করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে অবিচার করিল, ইহা তাহাদেরই পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হইল। তাহারা নারীকে সমান অধিকার দান করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্যই স্থাপন করিল। তাহাদের শিল্পবিজ্ঞানই ইহার প্রমাণ দিতেছে। তাহারা চাহিল তমদ্দুন-তাহযীবের সংস্কার করিতে, কিন্তু প্রকৃপক্ষে তাহারা ইহার ধ্বংসেরই মারাত্মক উপকরণাদি সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহার বিশদ বিবরণ আমরা জানিতে পারি তাহাদের বর্ণিত ঘটনাসমূহ ও সংখ্যাসমূহ হইতে। প্রকাশ থাকে যে, এই সকল তথ্য সম্পর্কে তাহারা অনবহিত নহে; কিন্তু যেমন পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা মানবীয় দুর্বলতা যে,

তাহার জীবনের আইন-কানুন প্রণয়নের ব্যাপারে সকল তত্ত্বের সমপরিমিতি ও অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাহার প্রকৃতি তাহাকে কোন এক প্রান্ত সীমার দিকে ধাবিত করে এবং যখন সে সেই দিকে ধাবিত হয় তখন বহু বিষয় তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে। আবার বহু তত্ত্ব তাহার গোচরীভূত হওয়া সত্ত্বেও সে তাহাদিগকে উপেক্ষা করে এবং দেখিয়াও চক্ষু বন্ধ করে। এইরূপ এক অন্ধের সাক্ষ্য এখানে বর্ণিত হইতেছে। বস্তুত ইচ্ছাকৃত অন্ধত্বের ইহাপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

রুশ বৈজ্ঞানিক Anton Nemilov একজন পাকা কমিউনিস্ট। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক অসাম্য প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার The Biological Tragedy of Woman[১] নামক গ্রন্থের প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন। তথাপি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার পর স্বয়ং লিখিতেছেনঃ

আজকাল যদি বলা হয় যে, তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় নারীকে সীমাবদ্ধ অধিকার দেওয়া হউক, তাহা হইলে অন্তত লোকে ইহা সমর্থন করিবে। আমরা কিন্তু এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। বাস্তব জীবনে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা কোন সহজ কাজ মনে করিয়া আমাদের আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়াও উচিত নয়। নারী ও পরুষকে সমান কবিরার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াতে যে পরিমাণ চেষ্টা-চরিত্র করা হইয়াছে, পৃথিবীর কুত্রাপিও সেই পরিমাণ করা হয় নাই। কোথাও এ বিসয়ে এত উদার ও অনুকম্পাশীল আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ব্যাপার এই যে, পরিবারের মধ্যে নারীর মর্যাদার সামান্যই পরিবর্তন হইয়াছে। -পৃ. ৭৬

শুধু পরিবারে কেন, সমাজেও কোন পরিবর্তন সুচিত হয় নাই। নারী ও পুরুষ যে সমান হইতে পারে না, এ সম্পর্কে একটা দৃঢ় ধারণা শুধু সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে নাই বরং সোভিয়েত রাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আজও দৃঢ়মূল হইয়া আছে। নারীদের মধ্যে এই ধারণা একটা দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, যদি তাহাদিগকে পুরুষের সমপাংক্তেয় মনে করা হয় তাহা

---

১ এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়।

হইলে তাহারা পুরুষকে স্বীয় মর্যাদা হইতে বিচ্যুত মনে করিবে। উপরন্তু তাহারা পুরুষের দুর্বলতা ও পুরুষত্বহীনতা বলিয়া অভিহিত করিবে। যদি আমরা এই ব্যাপারে কোন বিজ্ঞানী, গ্রন্থকার, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শতকরা এক শত জন কমিউনিস্টের ধারণা জানিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, তাহারা নারীকে নিজেদের সমান কখনই মনে করে না। যদি আমরা বর্তমানকালের কোন উপন্যাস পাঠ করি, আর তাহা যেমনই স্বাধীনচেতা গ্রন্থকারের হউক না কেন, তাহা হইলে উক্ত উপন্যাসের মধ্যে কোথাও না কোথাও এমন বিবরণ পাওয়া যাইবে, যাহা উপরিউক্ত ধারণাকে [নারী-পুরুষের সাম্য] মিথ্যা প্রমাণিত করিবে। —পৃ. ৯৫-১৯৪

ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এই যে, এখানে বিপ্লবী নীতির সহিত একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের সংঘর্ষ হয়। 'সেই তত্ত্বটি এই যে, শরীর বিজ্ঞানের দিক দিয়া নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা সম্ভব নহে এবং উভয়ের উপরে সমান দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই। —পৃ.৭৭

আরও একটি উদ্ধৃতির দ্বারা বিষয়টি অধিকতর পরিষ্কার হইবেঃ মোদ্দাকথা এই যে, সকল কর্মচারীর মধ্যে যৌন-উচ্ছৃংখলা পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সোশ্যালিস্ট ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে ইহার প্রতিরোধ করা দরকার। কারণ এই ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সুকঠিন। আমি শত সহস্র ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, যৌন-উচ্ছৃংখলতা শুধু অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই, বরং উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছে।

—পৃ. ২০২-৩

উপরের কথাগুলি কত সুস্পষ্ট ও প্রামাণিক। একদিকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যে, প্রকৃতি নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করে নাই। ব্যবহারিক জীবনে সমতা স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত এক ধরনের সমতা যে পরিমাণেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহার ফলে সেই পরিমাণেই

অশ্লীলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং সমাজের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অপরদিকে এই দাবি যে, সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা হইবে না এবং তাহা করা হইলে আমরা তাহার বিরোধিতা করিব। এ বিষয়ের প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে যে, মানুষ অজ্ঞ নহে; বরং জ্ঞানী ও সচেতন। অথচ সে প্রকৃতির কত বড় দাস? সে নিজের উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব ও সত্যকে মিথ্যা মনে করে, নিজের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ অস্বীকার করে। সকল দিক হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির পিছনে একমুখী হইয়া চলিয়া তাহার ভ্রান্ত সীমায় উপনীত হয়। এহেন চরম প্রান্তে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে তাহার নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক যতই অকাট্য ও বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করুক না কেন, সে নিরস্ত হয় না। তাহার কর্ণ যতই ঘটনা শ্রবণ করুক না কেন, তাহার চক্ষু যতই মন্দ ও বিষময় পরিণাম দর্শন করুক না কেন, সকলই বৃথা।

أَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ◆

তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব, কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

—সূরা জাছিয়া ঃ ২৩

ইসলামী আইনের ভারসাম্য নীতি

ভারসাম্যহীন চরম বাড়াবাড়ি ও ন্যূনতার এই জগতে একটিমাত্র তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা এমন আছে, যাহার মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে মানব প্রকৃতির এক একটি দিকের প্রতি, এমন কি অপ্রকাশ্য দিকের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। মানুষের দৈহিক গঠন, তন্মধ্যে পাশবিক বৃত্তি, মানসিক প্রকৃতি, মানসিক বৈশিষ্ট্য ও তার স্বাভাবিক

চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা কাজ লওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক একটি সৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য আছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে এমন পন্থায় পূর্ণ করা হইয়াছে যে, অন্য কোন উদ্দেশ্য-তাহা যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হউক না কেন-ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অবশেষে সকল উদ্দেশ্যের সমন্বয়ে এই বিরাট উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়। এই ন্যায়-নীতি, এই ভারসাম্য, এই সামঞ্জস্য বিধান এতই পূর্ণতাসম্পন্ন যে, কোন মানুষই স্বীয় জ্ঞান ও চেষ্টা-চরিত্রের দ্বারা তাহা তৈরী করিতে পারে না। মানুষের তৈরী আইন অথচ তাহার মধ্যে কোথাও একমুখীনতা দেখা যাইবে না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বয়ং আইন তৈরী তো দূরের কথা, আসল কথা এই যে, সাধারণ লোক তো এই ন্যায়নিষ্ঠ, ভারসাম্য ও চরম বিজ্ঞানসম্মত বিধানের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী না হয় এবং তৎসম্পর্কে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গবেষণা ও পরীক্ষা -নিরীক্ষা না করে। আমি এই আইনের এইজন্য প্রশংসা করিতেছি না যে, আমি ইসলামে বিশ্বাসী, বরং আমি ইসলামে এইজন্য বিশ্বাসী যে, আমি ইহার মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সংগে ইহার পরিপূর্ণ মিল দেখিতে পাই। এই সকল দেখিয়া আমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, এই সকল আইন কানুনের রচয়িতা অবশ্য অবশ্যই একমাত্র তিনি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী। সত্য কথা এই যে, বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত পথভ্রষ্ট আদম সন্তানকে ন্যায়নীতি ও মধ্যপন্থার সুষ্ঠু উপায় পদ্ধতি একমাত্র তিনিই বলিয়া দিতে পারেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٭

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

॥ এক ॥

মৌলিক দৃষ্টিভংগী

ইসলামের ইহা এক বৈশিষ্ট্য যে, সে তাহার আইন-কানুনের রহস্যাবলীর উপর নিজেই আলোকপাত করে। সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইসলামের যে বিধান পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ইসলামই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, সে বিধানের বুনিয়াদ কোন কোন জ্ঞানবিজ্ঞানের মূলনীতি ও কোন কোন প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত।

দাম্পত্য সম্পর্কের মূল মর্ম

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে রহস্যের উর্দঘাটন করা হইয়াছে, তাহা হইতেছেঃ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ -

প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। –সূরা যারিয়াতঃ ৪৯

এই আয়াতে দাম্পত্য বিধানের |Law of Sex|এক ব্যাপক অর্থের দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। বিশ্ব প্রকৃতির ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার স্বীয় ইঞ্জিনিয়ারী কলা-কৌশল এইভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন যে, তিনি এই বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় মেশিণ দাম্পত্য বিধান |Law of Sex| অনুযায়ী নির্মাণ করিয়াছেন অর্থাৎ এই মেশিনের সমুদয় অংশকে জোড়া জোড়া নির্মাণ করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি জগতে যতই কারিগরী দেখা যায়, তৎসমুদয়ই এই জোড়া জোড়া নিয়ম-বিধানেরই এক বিস্ময়কর পরিণাম ফল!

এখন দাম্পত্য বিধান |Law of Sex| বস্তুটি কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। দাম্পত্য বিধানের মূল কথা এই যে, ইহার একটিতে থাকিবে ক্রিয়া এবং অপরটিতে থাকিবে সে ক্রিয়া গ্রহণ করিবার প্রবণতা। একটিতে থাকিবে

প্রভাব, অপরটিতে প্রভাবের স্বীকৃতি। একটিতে থাকিবে যুক্ত বিজড়িত করিবার ক্ষমতা, অপরটিতে যুক্ত বিজড়িত হওয়ার প্রবণতা। এই যুক্ত বিজড়িতকরণ ও তাহার সুযোগ দান করা, এই ক্রিয়া ও তাহা গ্রহণ করিবার প্রবণতা, এই প্রভাব ও তাহার স্বীকৃতি এবং এই কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ- এই সকল বিষয়ের সম্পর্ক হইতেছে দুইটি বস্তুর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হইতেই সমুদয় নির্মাণকার্য সাধিত হয় এবং নির্মাণকার্য দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতের কারখানা চলে। সৃষ্টিজগতে যত কিছু আছে, তাহার সমুদয়ই আপন আপন শ্রেণীতে জোড়া জোড়া সৃজিত হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে মৌলিক দিক দিয়া দাম্পত্যের যে সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে এই যে, উহাদের একটি কর্তা এবং অপরটি তাহার ক্রিয়া গ্রহণকারী। অবশ্য সৃষ্টিজগতের এক এক শ্রেণীতে এই সম্পর্কের রূপ এক এক ধরনের, যথাঃ এক প্রকারের জোড়াবন্ধন পদার্থের মধ্যে, অন্য প্রকার বর্ধনশীল স্থূল পদার্থের মধ্যে দেখা যায়। আবার এক প্রকার জোড়া বন্ধন বা দম্পত্যবিধান প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। এই সমুদয় দাম্পত্যবিধান আপন আপন অবস্থা ও প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিভিন্ন ও পৃথক। কিন্তু এই সকলের মধ্যে দাম্পত্য বিধানের মুল কথা এক ও অভিন্ন, তাহা যে কোন প্রকার অথবা যে কোন শ্রেণীর হউক না কেন। প্রকৃতির আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ গঠনকার্য ও গঠনাকৃতি লাভের জন্য ইহা অপরিহার্য যে, জোড়ার মধ্যে একটিতে থাকিবে ক্রিয়ার শক্তি এবং অপরটিতে থাকিবে ক্রিয়া গ্রহণের শক্তি।

উপরে উল্লিখিত আয়াতের এই মর্ম অনুধাবন করিবার পর ইহা হইতে দাম্পত্য বিধানের তিনটি মুলনীতি প্রমাণিত হয়ঃ

১. আল্লাহ্ তায়ালা যে ফরমুলায় সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে পদ্ধতিকে স্বীয় কারখানা পরিচালনার কারণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা কখনও অপবিত্র ও হীন হইতে পারে না, বরং মুলের দিক দিয়া তাহা পবিত্র ও সম্মানজনক। সুতরাং তাহা হওয়াই বাঞ্চনীয়। কারখানার বিরোধীরা তাহাকে অপবিত্র ও ঘৃনার্হ মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কারখানার নির্মাতা ও মালিক কোনদিনই এই ইচ্ছা পোষণ করিবে না যে, তাঁহার কারখানা বন্ধ হইয়া যাউক। তিনিও এই ইচ্ছাই পোষণ করিবেন যে,

কারখানার মেশিনের অংগ-অংশগুলি চালু থাকুক এবং আপন আপন কাজ করিতে থাকুক।

২. ক্রিয়া ও ক্রিয়া গ্রহণ উভয়ই এই কারখানা পরিচালনার জন্য সমভাবে প্রয়োজন। কর্তা ও তাহার ক্রিয়া গ্রহণকারী উভয়ের অস্তিত্ব এই কারখানায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। না কর্তার ক্রিয়ার কোন বিশেষ সম্মান আছে, না অপরের ক্রিয়া গ্রহণে কোন অসম্মান আছ। কর্তার সিদ্ধি এই যে, তাহার মধ্যে কর্মশক্তি এবং কর্তার গুণ পাওয়া যায়, যাহাতে সে দাম্পত্যের ক্রিয়ার দিক সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারে। একটি সাধারণ মেশিনের অংশগুলি দ্বারা যদি কেহ উহাদের প্রকৃত কাজ না লইয়া এমন কাজে লাগায় যাহার জন্য উহাদিগকে তৈরি করা হয় নাই, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ বলা হইবে। প্রথমত, এই চেষ্টা নিষ্ফল হইবে এবং বলপূর্বক কাজ লইতে গেলে মেশিন নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সৃষ্টিজগতের বিরাট মেশিনেরও ঐ একই অবস্থা। যে নির্বোধ ও অনভিজ্ঞ, একমাত্র সেই কর্তাপক্ষকে তাহার ক্রিয়া গ্রহণকারীর স্থানে এবং ক্রিয়া গ্রহণকারীকে কর্তার স্থানে নিযুক্ত করিবার ধারণা করিতে পারে। অতপর সে এই চেষ্টা করিয়া এবং ইহাতে সাফল্যের আশা পোষণ করিয়া অধিকতর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু এই বিরাট মেসিনের সৃষ্টিকর্তা কখনও তাহা করিবেন না। তিনি কর্তাপক্ষকে ক্রিয়ার স্থানে রাখিয়া তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষাই দিবেন এবং ক্রিয়া গ্রহণকারী পক্ষকে ক্রিয়া গ্রহণের কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে ক্রিয়া গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টির ব্যবস্থাই করিবেন।

৩. ক্রিয়া গ্রহণের উপর ক্রিয়ার এক প্রকার মর্যাদা আছে। এই অর্থে মর্যাদা নহে যে, ক্রিয়ার মধ্যে সম্মান আছে এবং পক্ষান্তরে ক্রিয়া গ্রহণে অমর্যাদা আছে, বরং মর্যাদা এই অর্থে যে, ক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে থাকে শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও প্রভাব। কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করিলে তাহার কারণ এই যে, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও প্রভাবান্বিত করিবার শক্তি রাখে। যে বস্তুটি ক্রিয়া গ্রহণ করে এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহার ক্রিয়া গ্রহণ ও প্রভাবিত হওয়ার কারণ এই যে, সে পরাভূত, দুর্বল ও প্রভাবিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য যেমন কর্তা এবং ক্রিয়া গ্রহণকারী উভয়ের অস্তিত্ব সমান প্রয়োজন, তদ্রুপ কর্তার

মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব বিস্তারের শক্তি এবং ক্রিয়া গ্রহণকারীর মধ্যে প্রাধান্য স্বীকার ও প্রভাব গ্রহণের শক্তি থাকা প্রয়োজন। কারণ শক্তিতে উভয়ে যদি একরূপ হয় এবং কাহারও উপরে কাহারও প্রাধান্য না থাকে, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও প্রভাব স্বীকার করিবে না এবং ক্রিয়া একেবারেই সংঘটিত হইবে না। সূঁচের মধ্যে যে কাঠিন্য আছে, তাহা যদি কাপড়ের মধ্যেও হয়, তাহা হইলে সেলাই ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। কোদাল ও হালের প্রাধান্য স্বীকার করিবার জন্য মাটির মধ্যে যদি কোমলতা না থাকে, তাহা হইলে কৃষি ও নির্মাণকার্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে। মোট কথা, পৃথিবীতে যত কাজ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার একটিও হইবে না, যদি একটি কর্তার জন্য একটি ক্রিয়া গ্রহণকারী না। হয় এবং তাহার মধ্যে কর্তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যোগ্যতা না থাকে। অতএব দম্পতির মধ্যে যে কর্তা হয়, তাহার প্রকৃতির চাহিদাই এই যে, তাহার মধ্যে থাকিবে শ্রেষ্ঠত্ব, দৃঢ়তা ও কর্তৃত্ব শক্তি, যাহাকে বলে পুরুষত্ব। কারণ কার্যকরী অংশ হিসাবে নিজের কর্তব্য সমাধা করিবার জন্য তাহার এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে ক্রিয়া গ্রহণকারীর প্রকৃতির দাবি এই যে, তাহার মধ্যে থাকিবে কোমলতা ও প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা, যাহাকে বলা হয় নারীত্ব। কারণ দাম্পত্য ব্যবস্থার ক্রিয়া গ্রহণকার্যে এই গুণাবলীই তাহাকে সফলকাম করিতে পারে। যাহারা এই গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত নহে, তাহারা কর্তার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মান মর্যাদার অর্থে ব্যবহার করত ক্রিয়া গ্রহণকারিণীকে হেয়, অবমানিত মনে করে অথবা এই শ্রেষ্ঠত্ব একেবারেই অস্বীকার করত ক্রিয়া গ্রহণকারিণীর মধ্যে এই সকল গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, যে গুলি কর্তার মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু যে ইঞ্জিনিয়ার এই উভয় অংশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে মেশিনের মধ্যে এমনভাবে লাগাইয়া দেন যে, সম্মানের দিক দিয়া উভয়ে এক রকম এবং শিক্ষা-দীক্ষা, লালন পালন ও অনুগ্রহ লাভের দিক দিয়া উভয়ে সমান হয়। কিন্তু ক্রিয়া ও ক্রিয়া গ্রহণের প্রকৃতি যে প্রভুত্ব ও পরাধীনতা দাবি করে, উহাদের মধ্যে তাহাই সৃষ্টি করিতে হইবে যেন দাম্পত্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে উভয়েই যেন কঠিন পাথর হইয়া না পড়ে-যাহার ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষই হইতে পারে, কিন্তু পরস্পরে কোন সম্মিলিত কর্মপন্থা এবং কোন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে না।

ইহা ঐ সকল মূলনীতি, যাহা দাম্পত্য ব্যবস্থার প্রাথমিক অর্থ হইতেই পাওয়া যায়। নিছক একটি জড় অস্তিত্ব হিসাবে নারী–পুরুষের জোড়া জোড়া হওয়াই এই বিষয়ের দাবি করে যে, তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে এই মূলনীতি থাকিতে হইবে। সম্মুখে অগ্রসর হইলে জানিতে পারা যাইবে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যে সামাজিক বিধান তৈরী করিয়াছেন, তাহাতে উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

মানুষের পশু স্বাভাব ও তাহার আকাংক্ষা

এখন এক ধাপ সম্মুখে অগ্রসর হউন। নারী ও পুরুষের অস্তিত্ব শুধু একটি জড়–অস্তিত্ব নহে, বরং ইহা একটি পশু–অস্তিত্বও বটে। এই দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হওয়ার পিছনে কোন্ বস্তুর দাবি রহিয়াছে?

কুরআন বলে ঃ

جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الاَنعَامِ اَزْوَاجًا يَّذرَؤُكُم فِيهِ *

আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতেই জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন। পশুদের মধ্যেও জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দেন। –সূরা শুরা ঃ ১১

نِسَاؤُكُم حَرثٌ لَّكُم *

তোমাদের নারী তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ।

–সূরা বাকারা ঃ২২৩

প্রথম আয়াতে মানুষ ও পশুর জোড়া জোড়া সৃষ্টি হওয়ার কথা একই সংগে বলা হইয়াছে। তাহার মিলিত উদ্দেশ্য এই বলা হইয়াছে যে, তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করা হইবে।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে মানুষকে সাধারণ পশু শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পশু শ্রেণীর মধ্য হইতে এই বিশেষ ধরনের দাম্পত্যের মধ্যে শস্যক্ষেত্র ও কৃষকের সম্পর্ক আছে। ইহা একটি জীব – বিজ্ঞানসম্মত সত্য। জীব–বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের যে সুন্দর উপমা দেওয়া যাইতে পারে তাহা ইহাই।

এই দুইটি আয়াত হইতে আরও তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষের জোড়াও এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহাদের যৌনসম্পর্ক দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহা মানুষের পশু প্রকৃতির দাবি এবং তাহা পূরণের সুযোগ দিতে হইবে। খোদ মানুষকে এইজন্য পয়দা করেন নাই যে, তাহাদের কিছু লোক পৃথিবীতে শুধু নিজেদেরই প্রতিপালন করিবে এবং তারপর শেষ হইয়া যাইবে, বরং তাঁহার ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই মানব জাতিকে স্থায়ী রাখা এবং তিনি মানবের পশু-প্রকৃতিতে এমন এক যৌন-আকর্ষণ ঢালিয়া দিয়াছেন, যেন দম্পতি পরস্পর মিলিত হইতে পারে ও আল্লাহর পৃথিবীকে চালু রাখিবার জন্য নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। অতএব যে বিধান আল্লাহর পক্ষ হইতে হইবে, তাহা কখনও যৌন-আকর্ষণ দমিত করিতে ও মিটাইতে পারে না, বরং তাহার মধ্যে অবশ্য অবশ্য এমন বিষয়ের সুযোগ থাকিবে যাহাতে মানুষ তাহার সেই প্রাকৃতিক দাবী পূরণ করিতে পারে।

২. কৃষক ও শস্যক্ষেত্রের সংগে নারী ও পুরুষের উপমা দিবার পর বলা হইয়াছে যে, মানব দম্পতির সম্পর্ক অন্যান্য জীবের দাম্পত্য সম্পর্ক হইতে পৃথক। মানুষ হিসাবে বিচার করা ছাড়িয়া দিয়া পশু হিসাবে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এই দুইয়ের [নর-নারীর] শারীরিক গঠন এমনভাবে করা হইয়াছে যে, একটি কৃষক ও তাহার শস্যক্ষেত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তাহাদের মধ্যেও সেই দৃঢ় ও অটল সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা দরকার। কৃষকের কাজ শুধু তাহার ভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করাই নহে, উহাতে পানি সেচন করা, বীজ ও শস্যের তদারক করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনও তাহারই। ঠিক এইরূপ নারীও এমন একটি শস্যক্ষেত্র নহে যে, কোন এক জীব পথ চলিতে চলিতে তাহাতে কোন বীজ নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং তাহার পর তাহা হইতে আপনা-আপনি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া গেল, বরং ব্যাপার এই যে, যখন সেই নারী গর্ভ ধারণ করে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে কৃষকের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে, যাহাতে সে তাহার প্রতিপালন ও রক্ষণাক্ষেণ করে এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৩. মানব দম্পতির মধ্যে যে যৌন-আকর্ষণ আছে, জীব-বিজ্ঞান মতে তাহা ঠিক ঐরূপ, যাহা অন্য প্রাণীদের মধ্যেও আছে। এক শ্রেণীর প্রতিটি জীব তাহার বিপরীত লিংগের প্রতিটি জীবের প্রতি পাশবিক যৌন-আকর্ষণ রাখে এবং বংশ বৃদ্ধির যে বিরাট আকাঙ্খা তাহাদের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে তাহা উভয় শ্রেণীর ঐ সকলকে পরস্পরে আকৃষ্ট করে যাহাদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধির যোগ্যতা কার্যত বিদ্যমান থাকে। অতএব বিশ্বস্রষ্টার রচিত বিধান মানুষের পশু প্রকৃতির এই দুর্বল দিক উপেক্ষা করিতে পারে না। কেননা ইহার মধ্যে যৌন-শৃংখলতার [Sexual anarchy] প্রতি এমন এক বিরাট প্রবণতা লুক্কায়িত আছে যাহা সংরক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি ব্যতিরেকে সংযত করা যায় না। যদি একবার উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে।

لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم - ثم رددنه اسفل سفلين -
الا الذين امنوا وعملوا الصلحت ٭

আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি- কিন্তু তাহাদিগের জন্য নহে যাহারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ। –সূরা তীনঃ ৪–৬

মানব প্রকৃতি ও তাহার আকাঙ্খা

পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মানব সৃষ্টির ভূমি ও ভিত্তি হিসাবে রহিয়াছে পাশবিক প্রকৃতি। এই ভূমির উপরই মনুষ্যত্বের অট্টালিকা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখিবার জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে প্রত্যেকের আকাঙ্খা এবং প্রত্যেকের তাহা পূরণ করিবার যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা তাহার পাশবিক বিভাগেই রাখিয়া দিয়াছেন। এখন এই সকল আকাঙ্খার কোন একটি পূর্ণ হইতে না দেওয়া কিংবা ঐ সকল যোগ্যতার কোন একটি নষ্ট করিয়া দেওয়া মোটেই আল্লাহর ইচ্ছা নহে। কারণ এই সকল অবস্থাই প্রয়োজনীয় এবং ইহা ব্যতীত মানুষ ও মনুষ্য জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য প্রকৃতি চায় যে, মানুষ তাহার আকাঙ্খা পূরণে এবং এই সকল যোগ্যতার ব্যবহারে যেন নিছক পাশবিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে, বরং তাহার মানবিক বিভাগ যে

সকল বিষয়ের আকাঙ্খা রাখে এবং তাহার মধ্যে যে সকল অতিপাশবিক বিষয়ের চাহিদা আছে, সে সকল দিক দিয়া তাহার পদ্ধতি মানবসুলভ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা শরীআতের সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মানুষের কার্যাবলী একটা নিয়ম-শৃংখলার অধীন হয়। এতদ্‌সহ এইরূপ সাবধান বাণীও উচ্চারিত হইয়াছে যে, যদি সীমালংঘন অথবা ন্যূনতর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্য হইবে।

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه *

যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে।

–সূরা তালাকঃ ১

এখন লক্ষ্য করুন দাম্পত্য ব্যাপারে কুরআন মজিদে মানবীয় প্রকৃতির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য ও কোন্ কোন্ কামনা–বাসনার দিকে অংগুলী নির্দেশ করে।

১. উভয় শ্রেণীর [নর–নারী] ভিতর যে ধরনের সম্পর্ক মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

وَمِن ايته اَن خَلَقَ لَكُم مِّن اَنفُسِكُم اَزوَاجًا لِّتَسكُنُوا اِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَّرَحمَةً *

এই তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি [আল্লাহ্ তায়ালা] তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতেই জোড়া বানাইয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা শান্তি লাভ করিতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও করুণার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

–সূরা রূম ঃ ২১

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَاَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ *

তাহারা তোমাদের ভূষণস্বরূপ এবং তোমরা তাদের ভূষণস্বরূপ।

–সূরা বাকারা ঃ ১৮৭

ইহার পূর্বে যে আয়াতে মানুষ ও পশু উভয়ের জোড়া সৃষ্টি করার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে জোড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু বংশ রক্ষা বলা হইয়াছে।

এখানে পশু হইতে পৃথক করিয়া মানুষের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে যে, জোড়া সৃষ্টির একটা উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা এই যে, তাহাদের সম্পর্ক নিছক যৌনসুলভ নহে, বরং সে সম্পর্ক প্রেম ও ভালবাসার। তাহারা একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার। তাহাদের মধ্যে এমন সাহচর্য ও সংযোগ সংস্পর্শ হইবে- যেমন হয় শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে। উভয়ের মধ্যে এহেন সম্পর্ক মানবীয় তমদ্দুনের ভিত্তিপ্রস্তর-ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ইহার সহিত لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا শব্দদ্বয় দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে, নারীর মধ্যে পুরুষের জন্য শান্তি ও আনন্দ-সম্পদ আছে এবং নারীর প্রকৃতিগত সেবাই এই যে, সে এই সংগ্রামশীল ও কর্মময় দুনিয়ার শান্তি ও আনন্দকণার সঞ্চার করিবে-ইহাই মানুষের পারিবারিক জীবন। পাশ্চাত্যবাসী অবশ্য বস্তুগত ও বৈষয়িক সুখ-সুবিধার জন্য এই পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব উপেক্ষা করিয়াছে। বস্তুত অন্যান্য বিভাগের যে গুরুত্ব তামাদ্দুনিক ও সমাজ-ব্যবস্থার বিভাগগুলিতে আছে, তদ্রূপ গুরুত্ব এই পারিবারিক বিভাগেরও এবং তামাদ্দুনিক জীবনের জন্য ইহাও ততখানি আবশ্যক, যতখানি আবশ্যক অন্যান্য বিভাগগুলি।

২. এই যৌন-সম্পর্ক শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসাই কামনা করে না, সেই সাথে ইহাও কামনা করে যে, এই সম্পর্ক দ্বারা যে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিবে, তাহাদের সংগেও একটা গভীর আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হউক। ইহার জন্য বিশ্বস্রষ্টা মানুষের, বিশেষ করিয়া নারীর শারীরিক গঠন, গর্ভ ও স্তন্য দানের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার রক্ত-গোশ্‌ত ও অণু-পরমাণুতে সন্তানের স্নেহ-মমতা জড়িত হইয়া যায়। কুরআন মজিদ বলেঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ

তাহার মা তাহাকে বহু কষ্টসহকারে পেটে ধারণ করিয়াছে। অতপর দুই বৎসর পর সে স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে।

-সূরা লুকমান ঃ ১৪

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا –

তাহার মা তাহাকে বহু কষ্টে পেটে ধারণ করিয়াছে, বহু কষ্টে প্রসব করিয়াছে এবং গর্ভ ধারণ হইতে স্তন্য ত্যাগ পর্যন্ত ত্রিশ মাস অতিবাহিত করিয়াছে। –সূরা আহ্‌কাফ ঃ ১৫

এইরূপ অবস্থা পুরুষেরও –যদিও সন্তানের ভালবাসার দিক দিয়া সে নারী অপেক্ষা কিছু নিম্নে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ

আনন্দদায়ক জিনিসের ভালবাসা মানুষের সৌন্দর্য দানকারী; যথা; নারী, সন্তান–সন্ততি... –সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪

এই প্রাকৃতিক প্রেম–ভালবাসা মানুষের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। অতপর এই সম্পর্ক হইতে পরিবার, পরিবার হইতে গোত্র এবং গোত্র হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। তারপর এই সকল সম্পর্ক হইতে তমদ্দুন গঠিত হয়।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا *

এবং তিনি আল্লাহ্ তায়ালা যিনি পানি হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতপর তাহাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। –সূরা ফুরকানঃ ৫৪

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا *

হে মানব জাতি! আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অতপর তোমাদিগকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার।

–সূরা হুজুরাত

অতএব, ঔরসজাত, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে মানবীয় তমদ্দুনের প্রাথমিক ও প্রাকৃতিক ভিত্তিমূল। উক্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর

করে এমন অবস্থার উপরে যাহাতে সন্তান-সন্ততির পরিচিতি পিতা-মাতার হয় এবং তাহাদের বংশ নিরাপদ হয়।

৩. মানবীয় প্রাকৃতিক কামনা এই যে, যদি কেহ তাহার জীবনের শ্রমলব্ধ কিছু কাহারও জন্য ছাড়িয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে সে সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জনের জন্য ছাড়িয়া যাইবে, যাহাদের সংগে সে সারা জীবন রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।

وَاُولُو الاَرحَامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعضٍ فِى كِتَابِ اللهِ *

আল্লাহ্‌র কুরআনের বিধান অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেহ কাহারও উপর উত্তরাধিকারের দিক দিয়া বেশী হকদার।

—আনফাল

وَمَا جَعَلَ اَدعِيَاءَ كُم اَبنَاءَ كُم *

যাহাদিগকে তোমরা ধর্ম পুত্র করিয়াছ, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের পুত্র করিয়া লন নাই।

—সূরা আহযাব

অতএব, উত্তরাধিকার বন্টনের জন্যও বংশীয় রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।

৪. মানব-প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবণতা এক অতি স্বাভাবিক প্রবণতা। তাহার শরীরের কতক অংশ এমন যে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালা তাহার শারীরিক উপাদানের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই শারীরিক সাংগঠনিক ইচ্ছাই মানুষকে আদিকাল হইতে কোন না কোন প্রকারের বস্ত্র পরিধাণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই অধ্যায়ে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আধুনিক মতবাদের খন্ডন করিয়াছে। কুরআন বলে যে, মানব শরীরের যে সকল অংশে নারী-পুরুষের জন্য যৌন-আকর্ষণ আছে, তাহা প্রকাশে লজ্জাবোধ করা এবং আচ্ছাদিত রাখিবার চেষ্টা করা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক চাহিদা। অবশ্য শয়তানের ইচ্ছা যে, মানুষ এগুলিকে উন্মুক্ত রাখে।

فَوَسوَسَ لَهُمَا الشَّيطٰنُ لِيُبدِىَ لَهُمَا مَاوُرِىَ عَنهُمَا مِن سَوا تِهِمَا—

অতপর শয়তান আদম ও তদীয় পত্নীকে প্ররোচিত করিল যেন তাহাদের যে যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তাহা তাহারা উন্মুক্ত করে।

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ *

অতপর যখন তাহারা উভয়ে উক্ত বৃক্ষের ফল ভোগ করিল তখন তাহাদের শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উহা বেহেশতের পত্র-পল্লব দ্বারা আবৃত করিতে লাগিল।

–সূরা আরাফঃ ২২

পুনরায় কুরআন বলে যে, আল্লাহ্ তায়ালা এইজন্য বস্ত্রের প্রচলন করিয়া দিয়াছেন যে, উহার দ্বারা একদিকে যেমন লজ্জা নিবারণ হয়, অপরদিকে ইহা শোভা বর্ধন করে। শুধু লজ্জা নিবারণই যথেষ্ট নহে, তাহার সংগে অন্তকরণে আল্লাহর ভয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ–

তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছই সর্বোৎকৃষ্ট।

–সূরা আরাফ ঃ ২৬

ইহা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা। এই ধারণা অন্তরে পোষণ করার পর এই সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত রূপ অধ্যয়ন করুন, যাহা ধারণাকে ভিত্তি করিয়া রচিত করা হইয়াছে। ইহা অধ্যয়ন করিবার সময় আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে যাচাই করা উচিত যে, ইসলাম যে সকল মতবাদকে আপন আইন প্রণয়নের ভত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে কার্যকরী করিবার ব্যাপারে কতখানি নিষ্ঠা, উপযোগিতা, সংগতি ও যুক্তিযুক্ততা ঠিক রাখা হইয়াছে। মানব রচিত যত প্রকার বিধান আমরা দেখিয়াছি, তাহার সবগুলির এই স্পষ্ট দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহাদের মৌলিক

মতবাদ ও প্রত্যক্ষ খুটিনাটির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংগতি বজায় নাই। মূলনীতি ও তাহার শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। মূলনীতি যাহা বর্ণনা করা হয়, তাহার রূপ এক প্রকার হয় এবং বাস্তব রূপ দান করিবার জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নির্ধারণ করা হয়, তাহা অন্য একরূপ ধারণ করে। চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তির আকাশে আরোহণ করিয়া এক ধরনের মতবাদ পেশ করা হয়। কিন্তু উর্ধ্ব জগত হইতে অবতরণ করত বাস্তব কর্মক্ষেত্রে মানুষ যখন সমস্যাবলীর মধ্যে সে সব কিছু এমনভাবে হারাইয়া ফেলে যে, তাহার নিজের মতবাদ স্মরণ থাকে না। মানব-রচিত আইন-কানুনের একটিও এই ধরনের দুর্বলতামুক্ত দেখা যায় না। এখন আপনি লক্ষ্য করুন এবং চক্ষে দূরবীন লাগাইয়া বিশেষ সমালোচনার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করুন যে, যে বিধান আরব মরুর এক বালক দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছিলেন, যাহা প্রণয়ন করিবার জন্য কোন আইন প্রণয়নকারী পরিষদ অথবা কোন সিলেক্ট কমিটির পরামর্শ লওয়া হয় নাই, তাহার মধ্যে কোথাও কোন প্রকারের অসংগতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অবকাশ আছে কি না।

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা

॥ দুই ॥

মূলনীতি ও বাধ্যতামূলক ধারাগুলি

সমাজ সংগঠনের ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যেমন অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, যৌন প্রবণতাকে উচ্ছৃংখলতা হইতে রক্ষা করিয়া একটা নিয়ম-শৃংখলার অধীন করিয়া দেওয়া। কারণ ইহা ব্যতীত তমদ্দুনের শৃংখলা রক্ষিত হইতে পারে না। কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইলে মানুষকে ভয়ানক নৈতিক ও মানসিক অধপতন হইতে রক্ষা করিবার উপায় থাকে না। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক পৃথক সীমারেখার অধীন করিয়া এক কেন্দ্রের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে।

নিষিদ্ধ নারী-পুরুষ

সর্বপ্রথম ইসলামী বিধান ঐ সকল পুরুষ ও নারীকে একে অপরের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছে, যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া অথবা অতি নিকট সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বসবাস করিতে বাধ্য। যথাঃ মাতা ও পুত্র, পিতা ও কন্যা, ভাই ও ভগ্নি, ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী, খালা ও ভাগিনেয়, মামা ও ভাগিনেয়ী, সৎ পিতা ও কন্যা, সৎ মাতা ও পুত্র, শাশুড়ী ও জামাতা, শ্বশুর ও পুত্রবধূ, শ্যালিকা ও ভগ্নিপতি [দুই ভগ্নি একত্রে] ও স্তন্যদুগ্ধ সম্পর্কের নারী-পুরুষ। এই সকল নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করিয়া তাহাদিগকে যৌনবাসনা হইতে এত দূর পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই সকল সম্পর্কের নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি কোন প্রকার যৌন আকর্ষণের ধারণাই করিতে পারে না। [অবশ্য যদি এমন কোন পশু প্রবৃত্তির মানুষ হয় যাহারা কোন নৈতিক বন্ধনের অধীন নহে সে স্বতন্ত্র কথা]

ব্যভিচার নিষিদ্ধ করণ

এই সীমারেখা নির্ধারণের পর দ্বিতীয় বাধা-নিষেধ যাহা আরোপ করা হইয়াছে তাহা এই যে, অপরের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সকল নারী হারাম।

এই সকল ব্যতীত যে সব নারী অবশিষ্ট রহিল, তাহাদের সংগে অবৈধ যৌনসম্পর্ক হারাম করা হইয়াছে।

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلاً -

ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। কারণ উহা একদিকে যেমন অশ্লীলতা, অপরদিকে ইহা এক ভ্রান্ত পথ।

—সূরা বনি ইসরাঈলঃ ৩২

বিবাহ

এইভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বাধা–নিষেধ প্রয়োগের দ্বারা যৌন–উচ্ছৃংখলতার সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের পাশবিক বিভাগের চাহিদা–বাসনা এবং কুদরতের কারখানার নির্ধারিত নিয়ম–পদ্ধতি চালু রাখিবার জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,'এই চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ কর, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক দ্বারা নহে। লুকোচুরি করিয়াও নহে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার পথেও নহে, বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা যেন তোমার সমাজে এ কথা সকলের কাছে পরিজ্ঞাত ও প্রকাশিত হইয়া যায় যে, অমুক পুরুষ ও নারী একে অপরের হইয়া পড়িয়াছে।'

وَاُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَاءَ ذٰلِكُم اَن تَبتَغُوا بِاَموَالِكُم مُّحصِنِينَ غَيرَ مُسٰفِحِينَ .... فَانكِحُوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ .... مُحصَنٰتٍ غَيرَ مُسٰفِحٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذٰتِ اَخدَانٍ -

এইসব নারী ব্যতীত আর যাহারা আছে তাহাদিগকে তোমাদের জন্য হালাল করা হইল যাহাতে তোমরা নিজের মালের [মোহর] বিনিময়ে তাহাদের সংগে আইন–সংগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পার, স্বাধীন যৌন সম্পর্ক নহে। ....অতএব এই সকল নারীর অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে বিবাহ কর।... এমনভাবে তাহারা যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে প্রণয়িনী সাজিবার জন্য নহে।

—সূরা নিসাঃ ২৪–২৫

এইখানে ইসলামের ভারসাম্য লক্ষ্য করুন। যে যৌন-সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের বাহিরে হারাম ও ঘৃণার্হ ছিল, উহা বিবাহের গন্ডির মধ্যে আসিয়া শুধু জায়েযই হয় নাই, ইহা এক উৎকৃষ্ট পুণ্য কাজে পরিণত হইয়াছে। ইহা গ্রহণ করিবার আদেশ দেওয়া হইতেছে এবং ইহা হইতে বিরত থাকাকে অপসন্দ করা হইতেছে। স্বামী-স্ত্রীর এহেন সম্পর্ক এক ইবাদত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি স্ত্রী যদি স্বামীর সংগত ইচ্ছা পূরণ করা হইতে বাঁচিবার জন্য নফল রোযা রাখে অথবা নামায ও তিলাওয়াতে মগ্ন হয়, তাহা হইলে সে গুনাহগার হইবে। এই প্রসংগে নবী করীম (স)-এর কতিপয় মহান বাণী শ্রবণ করুনঃ

عليكُم بالباء ة فانـه اغض للبصر واحصن للفـرج فـمن لم يستطـع
منكم الباء ة فعلية بالصوم وان الصوم له وجاء -

তোমাদের বিবাহ করা উচিত। কারণ চক্ষুদ্বয়কে কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে এবং লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বিবাহ এক উৎকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বিবাহ করার ক্ষমতা নাই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা যৌন-বাসনা দমন করে। -তিরমিযী

والله انـى لا خشـاكـم لله واتـقاكـم لـه لكنى اصـوم وافـطـر واصلى
وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى۔

আল্লাহর কসম, আল্লাহকে ভয় করিবার এবং তাঁহার অসন্তোষ হইতে বাঁচিবার ব্যাপারে আমি তোমাদের সর্বাগ্রে। তথাপি আমি রোযা রাখি, ইফতার করি, নামায পড়ি, রাত্রিতে নিদ্রা যাই এবং বিবাহ করি। ইহা আমার সুন্নত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে বিরত থাকে তাহার সংগে আমার কোন সম্পর্ক নাই। -বুখারী

لا تصوم المراة وبعلها شاهد الاباذنه -

স্ত্রী যেন তাহার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে রোযা [নফল] না রাখে। -বুখারী

اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

যে নারী তাহার স্বামী হইতে পৃথক হইয়া রাত্রি যাপন করে, ফেরেশতাগণ তাহার উপর অভিসম্পাত করিতে তাকে যতক্ষণ না সে স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করে। –বুখারী

اذا رای احدکم امراة فاعجبته فليات اهله فان معها مثل الذی معها-

যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন নারীকে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট গমন করে। কারণ উক্ত নারীর নিকটে যাহা কিছু আছে, তাহা তাহার স্ত্রীর নিকটেও আছে। –তিরমিযী

এই সমুদয় নির্দেশের পশ্চাতে শরীআতের উদ্দেশ্য এই যে, যৌন অনাচারের সকল পথ বন্ধ করা হউক। যৌন–সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা হউক। এই গন্ডির বাহিরে যতদূর সম্ভব কোন প্রকার যৌন উত্তেজনা না হউক। প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী অথবা কোন ঘটনার দ্বারা যৌন–উত্তেজনা ঘটিলে তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হউক। সে কেন্দ্র হইতেছে স্বামীর জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী। এই সকল ব্যবস্থা এইজন্য করা হইয়াছে যাহাতে মানুষ তাহার যাবতীয় অপ্রাকৃতিক ও আপনসৃষ্ট উত্তেজনা ও বিশৃংখলা কার্যকলাপ হইতে নিজকে বাঁচাইয়া একনিষ্ঠ শক্তি দ্বারা তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই কারখানা পরিচালনার জন্য প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে যৌনপ্রেম ও আকর্ষণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার সবটুকুই যেন পরিবার গঠন ও তাহার স্থায়িত্বের জন্য ব্যয়িত হয়। বৈবাহিক সম্পর্ক সকল দিক দিয়াই পসন্দনীয়। কারণ ইহা মানব প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতির ইচ্ছা এবং আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূরণ করে। পক্ষান্তরে বিবাহ ব্যবস্থা পরিহার করা সকল দিক দিয়াই অপসন্দনীয়। কারণ ইহা দ্বারা দুইটি গর্হিত কার্যের যে কোন একটি অবশ্যই হইবেঃ হয় মানুষ প্রকৃতির বিধানের ইচ্ছা পূরণ করিবেই না এবং নিজ শক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই ব্যয় করিবে অথবা প্রকৃতির চাহিদায় বাধ্য হইয়া ভ্রান্ত ও অবৈধ পথে আপন কামনা চরিতার্থ করিবে।

পরিবার সংগঠন

যৌন–বাসনাকে পরিবার সৃষ্টি এবং তাহার স্থায়িত্ব বিধানের উপায় স্থির করিবার পর ইসলাম পরিবার সংগঠন করে। এখানেও সে পূর্ণ ভারসাম্যের সহিত প্রকৃতির বিধানের ঐ সকল দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে যাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নারী–পুরুষের অধিকার নির্ধারণে যে পরিমাণে সুবিচারের লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহা আমি হাকুয–যওজাইন [স্বামী–স্ত্রীর অধিকার] শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। উহা অধ্যয়ন করিলে আপনি জানিতে পারিবেন যে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে যে পরিমাণ সমতা কায়েম করা সম্ভব তাহা ইসলাম করিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী কোন সমতা ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষ হিসাবে যতখানি অধিকার পুরুষের আছে, ঠিক ততখানি নারীরও আছে।

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ

কিন্তু কর্তা হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত মর্যাদা, স্বামীর সম্মানের অর্থে নহে, বরং প্রভাব–প্রতিপত্তির অর্থে। ইহা সুবিচার সহকারে পুরুষকে দান করা হইয়াছে।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ–

এইভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে 'জ্ঞানী' ও 'জ্ঞান প্রদণ্ডে'র প্রাকৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইসলাম নিম্ন পদ্ধতিতে পারিবারিক সংগঠন করিয়াছেঃ

পুরুষের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব

পরিবারের মধ্যে পুরুষ কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা রাখে অর্থাৎ সে পরিবারের শাসক, রক্ষক, নৈতিক ও যাবতীয় বিষয়ের অভিভাবক। তাহার আনুগত্য তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য ফরয [অবশ্য যদি সে আল্লাহ ও রসূলের কোন নাফরমানীর আদেশ না করে]। পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জন করা এবং জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব।

اَلرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعضُهُم عَلٰى بَعضٍ وَّبِمَا اَنفَقُوا مِن اَموَالِهِم –

আল্লাহ্ তায়ালা এতদুভয়ের একজনকে যে অপরের উপরে মর্যাদাশীল করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে পুরুষ নারীর উপরে প্রভূত্বশীল। এ কারণেও যে, পুরুষ মোহর ও ভরণ- পোষণের জন্য তাহার অর্থ ব্যয় করে।

–সূরা নিসা ঃ ৩৪

الرجل راع على اهله وهو مسئول –

পুরুষ তাহার স্ত্রীপুত্র–পরিজনের শাসক এবং ইহার জন্য তাহাকে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। –বুখারী

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ –

পুণ্যবতী নারী স্বামীর অনুগত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাহার মর্যাদা রক্ষাকারিণী। –সূরা নিসা ঃ ৩৪

قال النبى صلعم اذا خرجت المراة من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك فى السماء وكل شىء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع–

নবী (স) বলিয়াছেন, যখন কোন নারী তাহার স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহ হইতে বাহির হয়, আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতা তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিতে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যে দিক দিয়া গমন করে, জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত সকলেই তাহাকে ধিকৃত করে।

وَالّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِى المَضَاجِعِ وَاضرِبُوهُنَّ فَاِن اَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلًا–

তোমাদের যে সকল স্ত্রী হইতে অবাধ্যতার আশংকা হয়, তাহাদিগকে উপদেশ দান কর। যদি ইহাতে তাহারা বিরত না হয় তবে শয্যা পৃথক

করিয়া দাও। ইহাতেও সংশোধন না হইলে প্রহার কর। অতপর যদি তোমার অনুগত হইয়া চলে, তবে বাড়াবাড়ি করিবার বাহানা খুঁজিও না।
–সূরা নিসা ঃ ৩৪

وقال النبى صلعم لا طاعة لمن لم يطع الله (رواه احمد) ولا طاعة فى معصية الله (احمد) انما الطاعة فى المعروف –

নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে না, তাহার আনুগত্য করা যাইবে না। [আহমদ] আল্লাহর না–ফরমানী করিয়া কাহারও আনুগত্য করা যাইবে না। [আহমদ] শুধু ভাল কাজেই আনুগত্য করা যাইবে।
–বুখারী

وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيهِ حُسنًا وَّاِن جَاهَدَاكَ لِتُشرِكَ بِى مَالَيسَ لَكَ بِهٖ عِلمٌ فَلَا تُطِعهُمَا –

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি যেন পিতামাতার সংগে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু যদি তাহারা তোমার উপরে পীড়াপীড়ি করে আমার সংগে এমন বিষয়ের শরীক করিতে, যে সম্পর্কে তোমার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহাদের অনুগত হইও না। –সূরা আনকাবূতঃ ৮

এইরূপ পরিবারের সংগঠন এমনভাবে করা হইয়াছে যে, ইহার একজন কর্তা ও শাসক হইবে। যে ব্যক্তি এই নিয়ম–শৃংখলা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে তাহাদের সম্পর্কে নবী (স) নিম্নের সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেনঃ

من افسد امراة على زوجها فليس منا –

যে ব্যক্তি স্বামী হইতে তাহার স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

নারীর কর্মক্ষেত্র

এই সংগঠনে নারীকে গৃহের রাণী করা হইয়াছে। জীবিকার্জনের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং অর্জিত অর্থের দ্বারা গৃহের ব্যবস্থাপনা করা নারীর কাজ।

المرأة راعية على بيت زوجها وهى مسئولة –

নারী স্বামীগৃহের পরিচালিকা এবং এই শাসন পরিচালনার জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। –বুখারী

গৃহের বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব হইতে তাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে, যথাঃ জুমআর নামায তার উপর ওয়াজিব করা হয় নাই। তাহার উপর জিহাদও ফরয নহে, প্রয়োজনবোধে অবশ্য মুজাহিদীনের খিদমতের জন্য সে যাইতে পারে। পরে ইহার সুষ্ঠু আলোচনা করা হইবে। জানাযায় অংশ গ্রহণ করা তাহার প্রয়োজন নাই, বরং ইহা হইতে তাহাকে বিরত রাখা হইয়াছে। –বুখারী

তাহার উপর জামায়াতে নামায পড়ার এবং মসজিদে হাযির হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণ সহকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহা পসন্দ করা হয় নাই।

তাহাকে মুহরেম পুরুষের সংগে ব্যতীত ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। –তিরমিযী

মোটকথা, সকল দিক দিয়া নারীর গৃহ হইতে বাহির হওয়া অপসন্দ করা হইয়াছে এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাহার জন্য পসন্দনীয় কাজ এই যে, সে গৃহে থাকিবে। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [১] আয়াতের স্পষ্ট মর্ম ইহাই।

---

১. ইহার অর্থঃ গৃহের অভ্যন্তরে বসবাস কর। অনেকে বলে যে, এই আদেশ নির্দিষ্ট করিয়া নবী (স)–এর পত্নিগণের জন্য করা হইয়াছিল, কারণ 'হে নবীপত্নিগণ'–বলিয়া আয়াত শুরু করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমগ্র আয়াতটিতে যে নির্দেশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটি নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট? বলা হইয়াছে, 'যদি তোমরা পরহেগার হও তাহা হইলে কাহারও সংগে প্রেমালাপের ভংগীতে কথা বলিও না। কারণ তাহা হইলে যাহার অন্তরে খারাপ ধারণা আছে, সে তোমাদের সম্পর্কে কোন [খারাপ] আশা পোষণ করিতে পারে। যে কথা বলিবে তাহা সরলভাবে বলিবে। নিজের গৃহের মধ্যে অবস্থান কর। জাহিলিয়তের যুগের নারীদের ন্যায় ঠাট–ঠমক ও সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইও না। নামায পড়, যাকাত দাও, আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ চান যে, তিনি তোমাদিগকে অপবিত্রতা হইতে দূরে রাখেন।'

এই নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা–বিবেচনা করুন। ইহার মধ্যে কোন্ নির্দেশটি এমন, যাহা সাধারণ নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়? সাধারণ নারী সমাজ কি পরহেযগার হইবে না? তাহারা কি পর–পুরুষের সংগে প্রেমালাপের ভংগীতে কথা বলিবে? তাহারা কি নামায, যাকাত ও আল্লাহ্–রসূলের আনুগত্য হইতে বিরত থাকিবে? আল্লাহ্ তায়ালা কি তাহাদিগকে অপবিত্রতার

কিন্তু এ বিষয়ে এত বেশী কড়াকড়ি করা হয় নাই এইজন্য যে, কোন কোন অবস্থায় নারীদের বাড়ীর বাহিরে যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হইতে পারে যে, কোন নারীর কোন অভিভাবক নাই। ইহাও হইতে পারে যে, পরিবারের কর্তার আর্থিক দৈন্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা অথবা এইরূপ আরও বহু কারণে নারীকে বাড়ীর বাহিরে কাজ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় আইনের মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে।

হাদীসে আছেঃ

قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن-

আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন যে, তোমরা প্রয়োজন অনুসারে বাড়ীর বাহিরে যাইতে পার। —বুখারী

মধ্যে রাখিতে চান? এই সকল নির্দেশ যদি সাধারণ নারী জাতির জন্য হয়, তাহা হইলে 'তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর'—এই কথাটিই কেন শুধু নবীপত্নীদের জন্য হইবে?

প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কে ভুল ধারণা এইজন্য হইয়াছে যে, আয়াতের প্রারম্ভে লোকে এই কথাগুলি দেখিতে পায়, 'হে নবীপত্নিগণ! তোমরা কিন্তু সাধারণ নারীদের মত নও।' কিন্তু বর্ণনাভংগী ঠিক এইরূপ, যেমন কোন সম্ভ্রান্ত সন্তানকে বলা হয়, 'তোমরা তো সাধারণ লোকের সন্তানের মত নও যে, বাজারের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, অপকর্ম করিবে? তোমাদের একটু সাবধান হইয়া চলাফেরা করা দরকার।' এই কথা বলার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য ছেলেমেয়ে হাটে-বাজারে বেয়াড়ার মত ঘুরিয়া বেড়ান পসন্দনীয় এবং ভাল হওয়া তাহাদের জন্য বাঞ্ছনীয় নহে, বরং এইরূপ বলার দ্বারা সচ্চরিত্রের একটা মান নির্ধারণ করাই উদ্দেশ্য, যাহাতে প্রত্যেকটি বালক-বালিকা সম্ভ্রান্ত সন্তানদের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিলে যেন এই ধরনের মান [Standard]-এ পৌঁছিতে চেষ্টা করিতে পারে। কুরআনে নারীদের জন্য এইরূপ উপদেশের পন্থা এইজন্য অবলম্বন করা হইয়াছে যে, আরব জাহিলিয়াতের যুগে নারীদের মধ্যে ঐরূপ স্বাধীনতা ছিল এখন যেমন ইউরোপে আছে। নবী পাক (স)-এর মাধ্যমে ক্রমশ তাহাদিগকে ইসলামী সভ্যতার অনুসারী করা হইতেছিল এবং তাহাদের জন্য নৈতিক সীমারেখা ও সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার বন্ধন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইতেছিল। এই অবস্থায় উম্মাহাতুল মুমিনীনের জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা অন্য নারীদের জন্য আদর্শ হইতে পারেন এবং সাধারণ মুসলমানের গৃহে তাঁহাদের জীবন পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। ঠিক সেইরূপ অভিমত আল্লামা আবু বকর হিসসাম তাঁহার 'আহকামুল কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'এই নির্দেশ যদিও নবী (স) ও তাঁহার পত্নিগণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি ইহার প্রয়োগ বিশ্বজনীন, নবী ও সাধারণ মুসলমানের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা নবীর অনুসরণের জন্য আদিষ্ট এবং যে সকল আদেশ নবীর উপর নাযিল হইয়াছে, তাহা আমাদের জন্যও। শুধু বিশেষ কয়েকটি আদেশ সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহা শুধু নবীরই জন্য নির্দিষ্ট।' —উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড

কিন্তু নারীর কর্মক্ষেত্র যে তাহার গৃহ, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার এই নিয়ম–পদ্ধতিতে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের খাতিরে এই ধরনের অনুমতি কোন সংশোধনী আনয়ন করিতেছে না। ইহা নিছক একটি অবস্থা বিশেষে অনুমতি এবং ইহাকে এই অবস্থায়ই রাখা উচিত।

প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধ

সাবালক নারীকে তাহার নিজস্ব ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একজন সাবালক পুরুষকে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, ততখানি তাহাকে দেওয়া হয় নাই। যথাঃ

পুরুষ আপন ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে। কিন্তু নারী– সে কুমারী হউক, বিবাহিতা হউক অথবা বিধবা হউক, সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োজন যে, ভ্রমণকালে তাহার সংগে একজন মুহরেম পুরুষ হইতে হইবে।

لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلثة ايام فصاعدا الاومعها ابوها او اخوها اوزوجها او ابنها اوذ ومحرم منها–

যে নারী আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহার জন্য ইহা জায়েয নহে যে, সে তিনদিন অথবা তাহার অধিক দিন ভ্রমণ করে অথচ তাহার সংগে তাহার পিতা অথবা ভ্রাতা, স্বামী অথবা পুত্র অথবা কোন মুহরেম পুরুষনাই।

وعن ابى هريرة عن النبى صلعم انه قال لاتسافر المراة مسيرة يوم وليلة الا و معها محرم – والعمل على هذا عند اهل العلم –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী (স) বলিয়াছেন, 'নারী যেন এক দিন–রাতের সফর না করে যতক্ষণ না তাহার সংগে কোন মুহরেম পুরুষ থাকে।' –তিরমিযী

وعن ابى هريرة ايضا ان النبى صلعم قال لايحل لامراة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الاومعها رجل ذ و حرمة منها –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে আরও বর্ণিত আছে, নবী (স) বলিয়াছেন, কোন মুসলমান নারীর জন্য হালাল নয় যে, সে কোন মুহরেম পুরুষ ব্যতীত এক রাত্রিও সফর করে। —আবু দাউদ

এই সকল বর্ণনায় সফরের সময়কাল লইয়া যে মতভেদ আছে, তাহাতে একদিন বা দুই দিন হওয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই যে, নারীকে একাকিনী ভ্রমণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কারণ ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এইজন্য নবী (স) সফরের সময়কাল নির্ধারণের ব্যাপারে তত গুরুত্ব দেন নাই। বিভিন্ন অবস্থা, সময় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়কালের উল্লেখ করিয়াছেন।

আপন বিবাহের ব্যাপারে পুরুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান অথবা আহলি কিতাব যে কোন নারীকে সে বিবাহ করিতে পারে এবং দাসীও রাখিতে পারে। কিন্তু নারী এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন নহে। সে কোন অমুসলমানকে বিবাহ করিতে পারে না।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ –

সে তাহাদের জন্য হালাল নহে এবং তাহারাও ইহার জন্য হালাল নহে।
—সূরা মুমতাহানা ঃ ১০

সে গোলামের সংগেও সহবাস করিতে পারে না। দাসীর সংগে পুরুষের যেমন সহবাসের অনুমতি কুরআনে দেওয়া হইয়াছে, তেমন নারীকে দেওয়া হয় নাই। হযরত ওমর (রা)–এর কালে এক নারী কুরআনের কদর্থ করিয়া তাহার গোলামের সংগে সহবাস করে। হযরত ওমর (রা) তাহা জানিতে পারিয়া বিষয়টি আলোচনার জন্য সাহাবাগণের মজলিশে শূরায় পেশ করেন। সেখানে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

قبحها الله تأولت كتاب الله غير تاويله –

সে আল্লাহ্‌র কিতাবের কদর্থ করিয়াছে।

অপর একজন নারী হযরত ওমরের (র) নিকট ঐ ধরনের কার্যের অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে গুরুতর শাস্তি দেন এবং বলেনঃ

لن تزال العرب بخير ما منعت نساؤها –

যতক্ষণ আরব নারিগণ গর্হিত কর্ম হইতে নিরাপদ থাকিবে ততক্ষণই তাহাদের জন্য মংগল।

নারী গোলাম ও কাফির ব্যতীত স্বাধীন মুসলমান পুরুষের মধ্য হইতে যে কোন ব্যক্তিকে স্বামী নির্বাচন করিতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাহার পিতা, দাদা, ভাই ও অন্যান্য অভিভাবকের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। অভিভাবকেরও এ অধিকার নাই যে, সে কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোথাও পাত্রস্থ করে। কেননা এ ব্যাপারে নবীর নির্দেশ আছেঃ

الايم احق بنفسها من وليها–

স্বামী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবক অপেক্ষা বালিকারই অধিকার বেশী।

لاتنكح البكر حتى تستاذن –

কুমারী বালিকার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন তাহাকে পাত্রস্থ করা না হয়।

কিন্তু নারীর পক্ষেও ইহা সমীচীন নহে যে, সে পরিবারের দায়িত্বশীল পুরুষদের মতের বিরুদ্ধে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করে। এইজন্য কুরআন মজিদে যেখানেই পুরুষের বিবাহের উল্লেখ আছে সেখানে নিজে বিবাহ করার কথা বলা হইয়াছে। যথাঃ

لَا تَنكِحُوا الْمُشرِكَات –

মুশরিক নারীকে বিবাহ করিও না।

فَانكِحُوا هُنَّ بِاذنِ اَهلِهِنَّ –

তাহাদিগকে তাহাদের পরিবারস্থ লোকজনের অনুমতি লইয়া বিবাহ কর।

কিন্তু যেখানে নারীদের বিবাহের উল্লেখ আছে, সেখানে তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। যথাঃ

وَاَنكِحُوا الاَيَامى مِنكُم –

বিধবা নারীদের বিবাহ দাও।

وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشرِكِينَ حَتّى يُؤمِنُوا –

মুশ্‌রিক পুরুষ ঈমান আনিবার পূর্বে তাহাদের সহিত তোমাদের নারীদের বিবাহ দিও না।

এই সবের অর্থ এই যে, বিবাহিতা নারী যেমন স্বামীর অধীন, ঠিক তেমনি অবিবাহিতা নারী পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির অধীন। কিন্তু এই অধিনতার অর্থ এই নয় যে, তাহার ইচ্ছা ও কাজের কোন স্বাধীনতা নাই অথবা 'তাহার নিজের ব্যাপারে তাহার কোনই স্বাধীনতা নাই', ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, সামাজিক ব্যবস্থাকে ফাটল ও বিশৃংখলা হইতে রক্ষা করা এবং পরিবারের চরিত্র ও কার্যকলাপকে ভিতর ও বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষের। এই শৃংখলা রক্ষার জন্যই নারীর অপরিহার্য কর্তব্য যে, এই শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যাহার, সে তাহার আনুগত্য করিবে, সে তাহার স্বামী হউক, পিতা অথবা ভাই হউক।

নারীর অধিকার

এইভাবে ইসলাম- بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ – ১.কে একটি প্রাকৃতিক সত্য হিসাবে স্বীকার করিবার সাথে সাথে لِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ২.কেও সঠিকভাবে নির্ধারিত করিয়াছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে জীব-বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যে পার্থক্য আছে, তাহাকেও সে সঠিকরূপে স্বীকার করে। যতখানি পার্থক্য আছে তাহাকে হুবহু প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং যেরূপ পার্থক্য আছে তদনুযায়ী তাহাদের মর্যাদা এবং ভাতা নির্ধারণ করে।

---

১. আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের কাহারও উপরে কাহাকেও মর্যাদা দান করিয়াছেন।

২. তাহাদের [নারীদের] উপর পুরুষের কিছু মর্যাদা আছে।

ইহার পর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাহা হইতেছে নারীর অধিকার সম্পর্কে। এই অধিকার নির্ধারণে ইসলাম তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ পুরুষকে যে নিছক পরিবারের শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সে যেন অন্যায় করিতে না পারে এবং এমনও যেন না হয় যে, শাসক ও আনুগতের সম্পর্ক প্রভু ও দাসীর সম্পর্কে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ নারীকে এমন সব সুযোগ দান করিতে হইবে, যাহা দ্বারা সে সমাজ ব্যবস্থার গন্ডির মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভার পরিস্ফুরণ করিতে পারে এবং তমদ্দুন গঠনে যথাসম্ভব ভালোভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ নারীর উন্নতি ও সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যেন সম্ভব হয়। কিন্তু তাহার উন্নতি ও সাফল্যে যাহা কিছুই হইবে তাহা নারী হিসাবেই হইবে। তাহার পুরুষ সাজিবার কোন অধিকার নাই এবং পুরুষোচিত জীবন যাপনের জন্য তাহাকে গড়িয়া তোলা-না তাহার জন্য, না তমদ্দুনের জন্য মংগলকর। আর পুরুষোচিত জীবন যাপনে সে সাফল্য লাভও করিতে পারে না।

উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ইসলাম নারীকে যেরূপ ব্যাপক তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়াছে, যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে, এই সকল অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য নৈতিক ও আইনগত নির্দেশাবলীর মধ্যে যে ধরনের চিরস্থায়ী গ্যারান্টি দান করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক কোন সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক অধিকার

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়, যাহা দ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাহার দ্বারা সে তাহার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে তাহা হইতেছে তাহার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল আইন-কানুন নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং সমাজে নারীর দাসত্বের প্রধান কারণই হইতেছে তাহার এই আর্থিক দুর্গতি। ইউরোপ এই অবস্থার অবসান চাহিল এবং তাহার জন্য নারীকে উপার্জনশীল

বানাইল। ফলে ইহা আর এক বিরাট অমংগল ডাকিয়া আনিল। ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিল। ইহা নারীকে উত্তরাধিকারের বিরাট অধিকার দান করিল। পিতা, স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের উত্তরাধিকার [১] সে লাভ করে। উপরন্তু স্বামীর নিকট হইতে সে মোহর লাভ করে। এই সকল উপায়ে যে ধন–সম্পত্তি সে লাভ করে, তাহার উপর তাহার পূর্ণ মালিকানা ও স্বত্ব কয়েম হয় এবং তাহা ব্যয় করিবার পূর্ণ অধিকার তাহার পিতা, স্বামী অথবা অন্য কাহারও নাই। উপরন্তু কোন ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করিলে অথবা নিজ শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিলে তাহারও সে মালিক হইবে। এতদসত্ত্বেও তাহার ভরণ–পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বামীর। স্ত্রী যতই ধনশালিনী হউক না কেন, তাহার ভরণ–পোষণের দায়িত্ব হইতে স্বামী মুক্ত হইতে পারে না। এইভাবে ইসলামে নারীর আর্থিক অবস্থাকে এত সুদৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অনেক সময় নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ভাল অবস্থায় থাকে।

তামাদ্দুনিক অধিকার

১. স্বামী নির্বাচনে পূর্ণ অধিকার নারীকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কেহ তাহাকে কোথাও বিবাহ দিতে পারে না। যদি সে নিজ ইচ্ছায় কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করে, ইহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। অবশ্য যদি সে এমন লোককে স্বামী নির্বাচন করে, যে তাহার বংশের তুলনায় নিকৃষ্ট,. এমতাবস্থায় তাহার অভিভাবকগণের ইহাতে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে।

২. একজন অমনোপূত, অত্যাচারী অথবা অকর্মণ্য স্বামী হইতে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার নারীকে দেওয়া হইয়াছে।

---

১. উত্তরাধিকার আইনে নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, নারী তাহার স্বামীর নিকট হইতে মোহর ও ভরণ–পোষণ পায়। পুরুষ এই সকল হইতে বঞ্চিত। নারীর ভরণ–পোষণ শুধু স্বামীর উপরে ওয়াজিব নহে, বরং স্বামী না থাকিলে পিতা, ভাই, সন্তান অথবা অন্যান্য আত্মীয়–মুরব্বী তাহার ভরণ–পোষণ করিতে বাধ্য। অতএব পুরুষের উপর যে গুরু দায়িত্ব আছে তাহা যখন নারীকে দেওয়া হয় নাই, তখন উত্তরাধিকারে যে অংশ পুরুষকে দেওয়া হইয়াছে তাহা নারীকে দেওয়া হয় নাই।

৩. স্ত্রীর উপরে স্বামীকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সদাচরণ ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের সহিত তাহা প্রয়োগ করিতে ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে। কুরআন বলেঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

–নারীদের সংগে সদ্ব্যবহার কর।

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ –

পারস্পরিক সম্পর্ককে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল করিতে ভুলিও না।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

خيركم خيركم لنسائه والطفهم باهله –

তোমাদের মধ্যে তাহারাই উৎকৃষ্ট ব্যক্তি, যাহারা তাহাদের স্ত্রীর নিকটে উৎকৃষ্ট এবং যাহারা আপন পরিবার-পরিজনের সহিত স্নেহশীল ব্যবহার করে।

ইহা শুধু নৈতিক উপদেশ নয়। যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর অধিকার প্রয়োগে অন্যায়-অত্যাচার করা হয়, তাহা হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার স্ত্রীর থাকিবে।

৪. বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী অথবা ঐ সকল নারী, যাহাদের বিবাহ আইন অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, অথবা স্বামী হইতে যাহাদিগকে পৃথক করা হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে, পূর্ব স্বামী অথবা তাহার কোন আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রকার অধিকার ঐ সকল নারীর উপরে নাই। এইরূপ অধিকার ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলিতে নারীকে দেওয়া হয় নাই।

৫. দেওয়ানী ও ফৌদারী আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য কায়েম করা হইয়াছে। ধন-প্রাণ ও মান-সম্মানের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য রাখা হয় নাই।

নারী শিক্ষা

দীনী ও পার্থিব শিক্ষা লাভ কবিার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয় নাই; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রুপ প্রয়োজন মনে করা হইয়াছে। নবী করীম (স) হইতে পুরুষগণ যেমন দীনী ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করিত, নারীগণও তদ্রুপ করিত। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হইত এবং সেই সময়ে তাহারা নবী (স)-এর নিকট হইতে শিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হইত। নবীর সহধর্মিনিগণ, বিশেষ করিয়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁহার নিকট হইতে হাদীস, তফসীর ও ফিকাহ শিক্ষা করিতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নাই, দাসীদিগকে পর্যন্ত শিক্ষা দান করিবার জন্য নবী করীম (স) আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ

ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها
فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران -

যাহার নিকট কোন দাসী আছে এবং সে তাহাকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অতপর তাহাকে স্বাধীন করিয়া বিবাহ করে, তাহার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রহিয়াছে। —বুখারী

অতএব মূল শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, ইহা দ্বারা তাহাকে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মাতা ও উৎকৃষ্ট গৃহিনীরূপে গড়িয়া তোলা হইবে। যেহেতু তাহার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাহাকে এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাহা এইক্ষেত্রে তাহাকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে। উপরন্তু তাহার জন্য ঐ সকল জ্ঞান-বিদ্যারও প্রয়োজন, যাহা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে, তাহার চরিত্র গঠন করিতে ও দৃষ্টিভংগী প্রশস্ত করিতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। অতপর যদি কোন নারী অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এই সকল শিক্ষা-দীক্ষার পরও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চায়,

তাহা হইলে ইসলাম তাহার পথে প্রতিবন্ধক হইবে না। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন শরীআত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।

নারীর প্রকৃত মুক্তি [Emancipation]

এইসব শুধু অধিকারের কথা। কিন্তু ইসলাম নারীর উপর যে বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছে, এই সব দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না। মানবীয় তমদ্দুনের গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে নারী লাঞ্ছনা, লজ্জা ও পাপের প্রতিমূর্তি হিসাবে বিবেচিত হইত। পিতার জন্য কন্যার জন্মগ্রহণ বিরাট অপরাধ ও লজ্জার বিষয় ছিল। শ্বশুর–শাশুড়ীর সম্পর্ক লাঞ্ছণাজনক মনে করা হইত। এমন কি শ্বশুর ও শ্যালক শব্দগুলি জাহিলী ধারণা অনুযায়ী এখনও গালি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অনেক জাতির মধ্যে এই লাঞ্ছনা হইতে বাঁচিবার জন্য কন্যা হত্যা করিবার প্রচলন হইয়াছিল।[১]

অজ্ঞ অশিক্ষিত দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজ ও ধর্মীয় নেতাগণও বহুদিন যাবত এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন ছিলেন যে, নারী প্রকৃতই মানুষ কিনা, আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে কোন আত্মা দিয়াছেন কি–না ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মমতে বেদ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। বৌদ্ধমতে নারীর সংগে সম্পর্ক স্থাপনকারীর জন্য নির্বানের কোন পন্থা নাই। খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্মমতে একমাত্র নারীই মানবীয় পাপের জন্য দায়ী। গ্রীসে গৃহিনীদের শিক্ষা–দীক্ষা, সভ্যতা–সংস্কৃতি ও তামাদ্দুনিক অধিকার ছিল না। রোম, ইরান, মিসর, চীন ও অন্যান্য সভ্যতার কেন্দ্রে নারীর অবস্থা প্রায়ও অনুরূপ ছিল। শতাব্দীর দাসত্ব, অধীনতা ও

---

১. কুরআন এই জাহিলী যুগের মানসিকতা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিতেছেঃ

وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالْاُنثٰى ظَلَّ وَجهُهٗ مُسوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَومِ مِن سُوْءِ مَابُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمسِكُهٗ عَلٰى هُونٍ اَم يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ

যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা প্রসব হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইত, তখন তাহার মুখমন্ডল মলিন হইয়া যাইত, যেন সে হলাহল পান করিল। এই সংবাদে সে এমন লজ্জিত হইত যে, তাহার জন্য মুখ দেখাইতে পারিত না। সে এইরূপ চিন্তা করিত, 'লাঞ্ছনা সহকারে কন্যাকে গ্রহণ করিব, না তাহাকে মাটিতে প্রোথিত করিব?'

–সূরা নাহলঃ ৫৮–৫৯

বিশ্বজনীন ঘৃণা–লাঞ্ছনার ফলে নারীর মন হইতে আত্মসম্মানের অনুভূতি মিটিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীতে সে কোন অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার জন্য কোন সম্মানের স্থান আছে, এ কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। পুরুষ তাহার উপর অন্যায়–অত্যাচার করাকে নিজের অধিকার মনে করিত এবং নারী এইসব উৎপীড়ন সহ্য করাকে তাহার কর্তব্য মনে করিত। তাহার মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এমনভাবে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সে নিজের স্বামীর দাসী বলিতে গর্ব অনুভব করিত এবং পতি আরাধনা তাহার ধর্ম ছিল।

এইরূপ অবস্থায় শুধু আইনের দিক দিয়া নহে, বরং মানসিক দিক দিয়াও এক বিরাট বিপ্লব যে আনয়ন করিয়াছে, সে হইতেছে ইসলাম। একমাত্র ইসলামই নারী–পুরুষে উপরিউক্ত মানসিকতার পরিবর্তন আনিয়াছে। আজকাল নারী অধিকার, নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের যে শ্লোগান আপনি শুনিতেছেন তাহা ঐ বিপ্লবী বাণীরই প্রতিধ্বনি, যাহা হযরত মুহাম্মদ (স)–এর মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। তিনি মানবীয় চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন এবং একমাত্র তিনিই বিশ্ববাসীকে এই কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন যে, নারী ঠিক এইরূপই একটি মানুষ, যেমন পুরুষ।

خَلَقَكُم مِّن نَّفسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا –

তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ তায়ালা একটি মানুষ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী–পুরুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। –সূরা নিসা ঃ ১

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسَبنَ .

পুরুষ যেমন কার্য কারবে তেমন ফল পাইবে এবং নারী যেমন কার্য করিবে ঠিক তেমন তাহার ফল লাভ করিবে। –সূরা নিসা ঃ ৩২

ঈমান ও ভাল আমলের সংগে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেরূপ মর্যাদা পুরুষ লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ মর্যাদার পথ নারীর জন্যও উন্মুক্ত আছে। পুরুষ যদি ইব্রাহীম বিন–আদম হইতে পারে, তবে নারীর রাবেয়া বসরী হওয়ার পথে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

فَاستَجَابَ لَهُم رَبُّهُم اَنِّى لاَ اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِن ذَكَرٍ اَو اُنثٰى بَعضُكُم مِن بَعضٍ -

তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করিব না– সে আমলকারী পুরুষ হউক বা নারী হউক, তোমরা একজন অন্যজন হইতে হইয়াছ।

–আলে ইমরান ঃ ১৯৫

وَمَن يَّعمَل مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِن ذَكَرٍ اَو اُنثٰى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظلَمُونَ نَقِيرًا -

এবং যে কেহই উৎকৃষ্ট আমল করিবে–সে স্ত্রীলোক হউক অথবা পুরুষ হউক–কিন্তু যদি সে ঈমানদার হয়, তাহা হইলে এই ধরনের লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি তিল পরিমাণ অন্যায় করা হইবেনা। –নিসা ঃ ১২৪

আবার মুহাম্মদ (স)–ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পুরুষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তদ্রূপ পুরুষের উপরও নারীর অধিকার আছে।

لَهُنَّ مِثلُ الَّذِى عَلَيهِنَّ -

নারীর যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তেমনই তাহার অধিকারও আছে।

উপরন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) নারীকে লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত করত মান–মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। তিনি পিতাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কন্যা তাহার জন্য লজ্জাকর নয়, বরং তাহার প্রতিপালন ও হক আদায় করার দ্বারা তাহার বেহেশত লাভ হইতে পারে।

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيمة انا وهو وضم اصابعه-

যদি কোন ব্যক্তি তাহার দুইটি কন্যাকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ও আমি কিয়ামতে এমনভাবে একত্রে আগমন করিব যেমন আমার দুইটি অংগুলি একত্র আছে। –মুসলিম

من ابتلى من البنات بشىء فاحسن اليهن كن له سترامن النار-

যদি কাহারও কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাহাদের প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা তাহার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হইবে।

–নাসায়ী

নবী করীম (স)–ই স্বামীকে বলিয়া দিয়াছেন যে, উত্তম স্ত্রী তাহার জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

خير متاع الدنيا المراة الصالحة -

দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত ভাল স্ত্রী। –নাসায়ী

حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى الصلوة

পৃথিবীতে বস্তুসমূহের মধ্যে নারী ও সুগন্ধি আমার নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং নামায আমার চক্ষু শীতলকারী। –নাসায়ী।

ليس من متاع الدنيا شىء افضل من المراة الصالحة -

পৃথিবীর নিয়ামতসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্ত্রী হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই। –ইবনে মাজাহ

একমাত্র ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স)–ই এই কথা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের পরে সবচেয়ে অধিক সম্মান, মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাইবার যোগ্য মাতা।

سأل رجل يارسول الله من احق بحسن صحابتى قال امك قال

ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك -

এক ব্যক্তি বলিল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইবার সবচাইতে বেশী অধিকার কাহার?" রসূল বলিলেন, "তোমার মাতার।" সে বলিল, "তাহার পর কাহার? তিনি বলিলেন, "তোমার মাতার।" সে বলিল, "অতপর কাহার?" তিনি বলিলেন, "তোমার মাতার।" সে বলিলঃ "তাহার পর কাহার?" তিনি বলিলেন, "তোমার পিতার।"

–বুখারী।

اللّٰه حرم عليكم عقوق الامهات –

মাতার অবাধ্যতা ও অধিকার হরণ আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। –বুখারী

নবী করীম (স) মানুষকে এই মর্মকথাটিও বলিয়া দিয়াছেন যে, ভাবপ্রবণতার আধিক্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির কমনীয়তা এবং চরম পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়া নারীর স্বভাব। এই স্বভাবের উপর আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা নারীত্বের জন্য দূষণীয় নহে, বরং ইহাই তাহার সৌন্দর্য। মানুষ ইহা হইতে যতটুকুই সুবিধা ভোগ করিতে পারে, তাহা পারে তাহাকে উক্ত স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই। তাহাকে পুরুষের ন্যায় সোজা ও কঠিন বানাইবার চেষ্টা করিলে সে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

এইরূপ নবী করীম (স)–ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি নারী সম্পর্কে শুধু পুরুষের নয়, নারীরও মনোবৃত্তি পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন এবং জাহিলী যুগের মনোবৃত্তির পরিবর্তে এক সঠিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ভিত্তি ভাবপ্রবণতার উপর নহে, বরং জ্ঞানবুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতপর তিনি শুধু আধ্যাত্মিক সংস্কার–সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আইনের সাহায্যে নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষের অন্যায়–অত্যাচার প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি নারীদের মধ্যে এতখানি চেতনার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাহারা নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার বুঝিতে পারে এবং তাহা সংরক্ষণের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

নারীদের জন্য নবী (স)–এর মধ্যে এতখানি দয়া ও স্নেহ–মমতা ছিল এবং তিনি তাহাদের এত বড় রক্ষক ছিলেন যে, তাহাদের প্রতি কণামাত্র অনায়–অবিচার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা নবীর নিকটে নালিশ করিত। পুরুষেরাও ভীত–সন্ত্রস্ত থাকিত এই ভাবিয়া যে, হয়ত কখন বা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে নবীর নিকট নালিশ করিয়া বসে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলিয়াছেনঃ

যতদিন নবী (স) জীবিত ছিলেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে বড় সাবধান হইয়া চলিতাম, যেন আমাদের জন্য হঠাৎ কোন শাস্তিমূলক

আদেশ অবতীর্ণ না হয়। নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর আমরা তাহাদের সংগে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। -বুখারী

ইবনে মাজাহ্‌র বর্ণনায় জানা যায় যে, নবী (স) স্ত্রীর উপর হাত উঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন। একবার হযরত ওমর (রা) অভিযোগ করিলেন যে, নারীরা বড় উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে অনুগত করিবার জন্য প্রহার করিবার অনুমতি থাকা উচিত। নবী (স) অনুমতি দিলেন। মানুষ যেন কতদিন হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। অনুমতি পাইবার পর সেইদিনই সত্তরজন স্ত্রীলোক স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হইল। পরদিন নবীগৃহে অভিযোগকারিণীদের ভীড় জমিল। নবী (স) লোকদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেনঃ

لقد طاف لليلة بال محمد سبعون امراة كل امراة تشتكى زوجها
فلا تجدون اولئك خياركم -

আজ সত্তর জন নারী নবী মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিল। যাহারা এ ধরনের কাজ করিয়াছে, তাহারা তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নহে।

এইরূপ নৈতিক ও আইনগত সংস্কারের ফল এই যে, ইসলামী সমাজে নারীকে এত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একজন মুসলমান নারী পার্থিব জীবনে ও দীনের ব্যাপারে বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ও ভাল বুদ্ধির দিক দিয়া সম্মান ও উন্নতির এমন উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে পারে, যেখানে পুরুষই কেবল আরোহণ করিতে পারে। তাহার নারী জীবন কোন দিক দিয়াই এ পথে প্রতিবন্ধক নয়। আজিকার এই বিংশতি শতাব্দীতে পৃথিবী ইসলাম হইতে বহু পশ্চাতে। ইসলাম যে চিন্তাধারার শিখরে উপনীত হইয়াছে, মানবীয় চিন্তাধারার উন্নতি তথায় উপনীত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দেশগুলি নারীকে যাহা কিছু দান করিয়অছে, তাহা নারী হিসাবে করে নাই, বরং নারীকে পুরুষ বানাইয়া তাহা করিয়াছে। নারী প্রকৃতপক্ষে আজও তাহাদের দৃষ্টিতে হেয়, যেরূপ জাহিলী যুগে ছিল। গৃহের রাণী, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মাতা; মোটকথা, একটি প্রকৃত নারীর জন্য এখনও কোন মর্যাদা নাই। সম্মান-মর্যাদা যদি থাকে তবে ঐ 'স্ত্রীলিংগ-পুরুষের' অথবা পুরুষরূপী স্ত্রীলোকের- যে দৈহিক দিক দিয়া

নারী কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়া পুরুষ এবং তমদ্দুন ও সমাজে পুরুষের ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ ইহা নারীত্বের মর্যাদা নহে, পুরুষত্বেরই মর্যাদা। অতপর হীনমন্যতার [Inferiority Complex], মানসিক বৈকল্যের স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, পাশ্চাত্য নারী গর্ব সহকারে পুরুষের পোশাক পরিধান করে অথচ কোন পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করত জনসাধারণ্যে বাহির হইবার ধারণাও করিতে পারে না। স্ত্রী হওয়া পাশ্চাত্য নারীদের নিকটে অবমাননাকর। অথচ স্বামী হওয়া কোন পুরুষের নিকটে অবমাননাকর নহে। পুরুষোচিত কাজ করিতে নারী সম্মানবোধ করে। অথচ গৃহিনীপণা ও সন্তান প্রতিপালনের ন্যায় নারীর কাজে কোন পুরুষ সম্মান বোধ করে না। অতএব প্রতিবাদের ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য নারী জাতিকে নারী হিসাবে কোন সম্মান দান করে নাই। এইকাজ একমাত্র ইসলামই করিয়াছে যে, নারীকে তাহার স্বাভাবিক স্থানে রাখিয়া তমদ্দুন ও সমাজে তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীত্বের মর্যাদা সমুন্নত করিয়াছে। ইসলামী তমদ্দুন নারীকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ রাখিয়া উভয়ের নিকট হইতে পৃথক পৃথক ভাবে ঐ সকল কাজ লইয়া থাকে, যাহার জন্য প্রকৃতি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে। অতপর প্রত্যেককে তাহার নিজের স্থানে রাখিয়া সম্মান, উন্নতি ও সাফল্যের সমান সুযোগ দিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে নারীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই মানবতার প্রয়োজনীয় অংশ। তমদ্দুন গঠনে উভয়ের গুরুত্ব সমান। উভয়ে নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে থাকিয়া যে সেবাকার্য করে, তাহা সমান মংগলকর ও সমান মর্যাদার অধিকারী। না পুরুষত্বে কোন আভিজাত্য আছে, না নারীত্বে কোন অপমান। পুরুষ থাকিয়া পুরুষোচিত কাজ করিলে পুরুষের যেমন সম্মান, উন্নতি ও সাফল্য লাভ হয়, ঠিক তেমনি নারী নারী থাকিয়া নারীসুলভ কাজ করিলে তাহাতেই তাহার সম্মান, উন্নতি ও সাফল্য লাভ হইবে। একটি সৎ তমদ্দুনের কাজ এই যে, সে নারীকে তাহার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে রাখিয়া পরিপূর্ণ মানবীয় অধিকার দান করিবে, সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভূষিত করিবে, শিক্ষা–দীক্ষার দ্বারা তাহার প্রছন্ন প্রতিভার বিকাশ করিবে এবং ঐ কর্মক্ষেত্র ও গন্ডির মধ্যেই তাহার উন্নতি ও সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

।। তিন ।।

সংরক্ষণ

এই ছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ কাঠামো। এখন সম্মুখে অগ্রসর হইবার পূর্বে এই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি আর একবার দেখিয়া লউন।

১. এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সমষ্টিগত পরিবেশকে যথাসম্ভব যৌন উত্তেজনা ও যৌন আন্দোলন হইতে পবিত্র রাখা, যাহাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি একটা পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে স্ফুরিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং নিজের সংরক্ষিত ও সমবেত শক্তি দ্বারা তমদ্দুন গঠনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

২. যৌন সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে বৈবাহিক গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং এই গন্ডির বাহিরে শুধু কর্ম-বিশৃংখলাই রোধ করা হইবে না, বরং চিন্তা-বিশৃংখলারও সকল পথ যথাসম্ভব রোধ করা হইবে।

৩. নারীর কর্মক্ষেত্র পুরুষের কর্মক্ষেত্র হইত পৃথক হইবে। উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি এবং মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তমদ্দুনের পৃথক পৃথক কার্যভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হইবে। তাহাদের সম্পর্ক সংগঠন এমনভাবে করা হইবে যে, বৈধ সীমারেখার ভিতরে একে অপরের সাহায্যকারী হইবে। কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম করিয়া কেহ কাহারও কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

৪. পরিবারের নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে পুরুষ পরিচালকের মর্যাদা লাভ করিবে এবং গৃহের সকলেই গৃহস্বামীর অনুগত থাকিবে।

৫. নারী-পুরুষ উভয়ের মানবিক অধিকার থাকিবে এবং উভয়কে উন্নতির সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু সমাজে তাহাদের জন্য যে সীমারেখা নির্ধারিত আছে, তাহারা তাহা লংঘন করিতে পারিবে না।

এই চিত্রের উপরে যে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে তাহার জন্য এমন কিছু সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন, যাহা দ্বারা উহার শৃংখলা যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। ইসলামের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা তিন প্রকারেরঃ

ক) আধ্যাত্মিক সংস্কার,
খ) শাস্তি বিধায়ক আইন-কানুন,
গ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই তিন প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ইহা সম্মিলিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে।

আধ্যাত্মিক সংস্কারের দ্বারা মানুষকে এমনভাবে দীক্ষা দেওয়া হয় যে, সে আপনা-আপনি এই সামাজিক ব্যবস্থার আনুগত্যের জন্য অগ্রসর হয়, বাহিরে এই আনুগত্যের জন্য তাহাকে বাধ্য করিবার কোন শক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক।

শাস্তিমূলক আইনের দ্বারা এই ব্যবস্থায় ধ্বংসকারী সকল প্রকার অপরাধের পথ রুদ্ধ করা হয়।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক জীবনে এমন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে যাহা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও কৃত্রিম গতিবিধি হইতে সমাজের পরিবেশকে পবিত্র করিয়া দেয় এবং যৌন-উচ্ছৃংখলতার আশংকা একেবারে কমাইয়া দেয়। নৈতিক শিক্ষা দ্বারা যাহাদের আধ্যাত্মিক সংস্কার হয় নাই এবং শাস্তিমূলক আইনেরও ভয় যাহারা করে না, এই পদ্ধতি তাহাদের পথে এমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যে, যৌন-উচ্ছৃংখলতার প্রতি তাহাদের আগ্রহ-বাসনা থাকা সত্ত্বেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাহাদের জন্য কঠিন হইয়া পড়ে। উপরন্তু ইহা এমন পদ্ধতি যে, ইহা নারী-পুরুষের ক্ষেত্র পৃথক করিয়া দেয়, পরিবারের শৃংখলা সত্যিকার ইসলামী পন্থায় কায়েম করে এবং ঐ সকল সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণ করে যাহা নারী-পুরুষের জীবনে পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ইসলাম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

আধ্যাত্মিক সংস্কার

ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি পরিপূর্ণরূপে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁহার কিতাব ও রসূলের উপর ঈমান রাখে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ তাহারই জন্য। আদেশ মানিবার জন্য এবং নিষেধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহার এতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ অমুক বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন এবং অমুক বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব যখন কোন মু'মিন আল্লাহর কিতাব হইতে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্ অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহার ঈমান দাবী করে যে, সে উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকুক এবং নিজের মনকেও ঐ সকল কাজে আকৃষ্ট করা হইতে বিরত রাখুক। এমনিভাবে একজন নারী যখন জানিতে পারে যে, আল্লাহ ও তদীয় রসূল সমাজের মধ্যে তাহার কি স্থান রাখিয়াছেন, তখন তাহার ঈমানের দাবিই এই হয় যে, সে নারী যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ও আগ্রহ সহকারে সেই স্থান মানিয়া লয় ও নিজের সীমা লংঘন না করে। এইভাবে জীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় নৈতিকতা ও সামাজিকতার গন্ডিতেও ইসলামের সঠিক ও পরিপূর্ণ আনুগত্য নির্ভর করে ঈমানের উপরে। এই কারণেই নৈতিকতা এবং সামাজিকতা সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিবার পূর্বে ইসলামে সর্বপ্রথম ঈমানের দিকে আহ্বান জানান হইয়াছে এবং উহা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইহা আধ্যাত্মিক সংস্কারের এমন মৌলিক উপায়, যাহার সম্পর্ক শুধু নৈতিকতার সংগেই নহে, বরং পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থার সংগে রহিয়াছে। অতপর বিশেষ করিয়া চরিত্রের গন্ডিতে ইসলাম শিক্ষা-দীক্ষার এমন এক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, যাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইলঃ

লজ্জা

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার পশু-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়া ব্যভিচার, চুরি, মিথ্যা ও অন্যান্য অপরাধ করিয়া থাকে। এই সমুদয়ই মানব-প্রকৃতির পরিপন্থী। এই কার্যগুলিকে কুরআনের ভাষায় 'মুন্‌কার' বলা হইয়াছে। 'মুন্‌কার' শব্দের অর্থ 'অজ্ঞ' বা 'অপরিচিত'। এই সকল কার্যকে 'মুন্‌কার' বলার অর্থ ইহা এমন কাজ যে, মানব-প্রকৃতি যখন

এসব কার্যের সহিত পরিচিত নহে এবং তাহার পশু-প্রকৃতি তাহাকে এই সকল কার্য করিতে বাধ্য করে, যাহা এই সকল 'মুনকার' বা অপরিচিত কার্য ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। বিজ্ঞ শরীআত প্রণেতা এই বস্তু বা উপাদানের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেছে 'লজ্জা'।

'মুনকার' কার্যগুলির প্রতি আকৃষ্ট মানুষ স্বীয় প্রকৃতির নিকটে এবং আল্লাহর নিকটে যে লজ্জা অনুভব করে, তাহাকেই ইসলামী পরিষাভায় 'হায়া' বলা হইয়াছে। হায়া অর্থ লজ্জা। এই লজ্জা এমন এক শক্তি, যাহা মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যান্য মুনকার বা গর্হিত কার্য হইতে বিরত রাখে। যদি কখনও সে পশু-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়া কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই বস্তুই [লজ্জা] তাহার অন্তকরণকে দংশন করে। ইসলামী নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই যে, সে লজ্জার এই প্রচ্ছন্ন উপাদানকে মানব-প্রকৃতির তলদেশ হইতে বাহির করিয়া জ্ঞান, বোধশক্তি ও চেতনার পথ দ্বারা প্রতিপালিত করে এবং একটি সুদৃঢ় নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করত তাহাকে মানুষের মনের মধ্যে এক প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত করে। ইহা নিম্নোক্ত হাদীসেরই ব্যাখ্যাঃ

لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء -

প্রতিটি দীনের একটি চরিত্র আছে এবং ইসলামের চরিত্র লজ্জা।

অপর একটি হাদীসও ইহার উপর আলোকপাত করেঃ

اذا لم تستح فاصنع ماشئت -

তোমার যদি লজ্জাই না থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

কারণ যখন লজ্জাই থাকিল না, তখন পশু-প্রকৃতির সূচনা প্রবৃত্তি মানুষের উপর জয়ী হয় এবং তখন তাহার নিকটে 'মুনকার' আর 'মুনকার' থাকে না।

মানবের প্রকৃতিগত লজ্জা একটা আকৃতিবিহীন উপাদানের ন্যায়, যাহা কোন আকৃতি অবলম্বন করে না। সমুদয় গর্হিত কার্যের প্রতি তাহার একটা স্বভাবসুলভ ঘৃণা থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন বোধজ্ঞান থাকে না। এই কারণে কোন বিশেষ কাজে তাহার ঘৃণা কেন, তাহা সে জানে না-এই

অজ্ঞতা ক্রমশ তাহার ঘৃণার অনুভূতিকে দুর্বল করিয়া ফেলে। অতপর পাশবিক প্রবৃত্তির চাপে মানুষ গর্হিত কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং পুন পুন ইহা করিবার পর অবশেষে লজ্জার অনুভূতি নষ্ট হইয়া যায়। ইসলামী নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এই অজ্ঞতা দূর করা। ইহা তাহাকে শুধু প্রকাশ্য 'মুনকার' কার্যগুলি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করে না, বরং অন্তরের গোপন কোণে যে সকল ইচ্ছা ও বাসনা লুকাইয়া থাকে, সেগুলিকেও তাহার নিকটে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরে। এক একটি গর্হিত কাজের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তাহাকে সাবধান করিয়া দেয় যেন সে অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তাহাকে ঘৃণা করে। অতপর নৈতিক শিক্ষা এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লজ্জাকে এত দূর অনুভূতিশীল করিয়া তোলে যে, গর্হিত কাজের প্রতি সামান্যতম প্রবণতাও তাহার নিকটে গোপন থাকে না এবং ইচ্ছা-বাসনার সামান্য ত্রুটি সম্পর্কেও সে সাবধানবাণী উচ্চারণ না করিয়া ছাড়ে না।

ইসলামী নৈতিকতার মধ্যে লজ্জার পরিসীমা এত ব্যাপক যে, জীবনের কোন বিভাগ ইহার বহির্ভূত নহে। যেমন, তমদ্দুন ও সমাজের যে বিভাগটি মানবের যৌনজীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট, ইসলাম তাহার মধ্যেও নৈতিক সংস্কারের জন্য ইহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। ইহা যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে মানব মনের মৃদু মধুর গোপন কথাটি ধরাইয়া দিয়া লজ্জাকে সে সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মনের চোর

আইনের দৃষ্টিতে দৈহিক সংযোগ-সংমিলনে ব্যভিচার সংঘটিত হয়। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে দাম্পত্য-গন্ডির বাহিরে বিপরীত লিংগের প্রতি আসক্তি ইচ্ছা ও বাসনার দিক দিয়া ব্যভিচার। অপরিচিতের সৌন্দর্যে চক্ষু জুড়ানো, তাহার কন্ঠ স্বরে কর্ণকুহরে আনন্দ উপভোগ, কথোপকথনে কমনীয় বাক-ভংগী, তাহার বাসস্থানের দিকে পুনপুনঃ পদক্ষেপ-এই সকলই ব্যভিচারের ভূমিকা এবং অর্থের দিক দিয়া ব্যভিচার। আইন এহেন ব্যভিচার ধরিতে পারে না। ইহা মনের চোর এবং একমাত্র মনের পুলিশই ইহাকে গ্রেফতার করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে হাদীসে এইভাবে সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছেঃ

العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشيء وزنا اللسان النطق و النفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذالك كله ويكذبه –

চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে, দৃষ্টি তাহাদের ব্যভিচার; হস্তদ্বয় ব্যভিচার করে, স্পর্শ তাহাদের ব্যভিচার; পদদ্বয় ব্যভিচার করে, এই পথে চলা তাহাদের ব্যভিচার; কথোপথন জিহ্বার ব্যভিচার; কামনা–বাসনা মনের ব্যভিচার; অবশেষে যৌনাংগ এই সকলের সত্যতা অথবা অসত্যতা প্রমাণ করে।

দৃষ্টির অনিষ্ট

মনের বড় চোর দৃষ্টি। এইজন্য কুরআন পাক ও হাদীস শরীফ সর্বপ্রথম ইহা ধরাইয়া দেয়। কুরআন বলেঃ

قُل لِّلمُؤ منِينَ يَغُضُّوا مِن اَبصَارِهِم وَيَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذٰلِكَ اَزكٰى لَهُم اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعُونَ – وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن اَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ –

হে নবী! মু'মিন পুরুষদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন অপর স্ত্রীলোক হইতে আপন দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইহা তাহাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তাহারা যাহা করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এবং হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন অপর পুরুষ হইতে তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে এবং লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। –সূরা নূরঃ ৩০–৩১

হাদীসে আছেঃ

ابن آدم لك اول نظرة واياك والثانية –

হে মানব–সন্তান! তোমার প্রথম দৃষ্টি তো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সাবধান দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ না কর। –জাস্সাস

হযরত আলী (রাঃ)–কে বলা হইয়াছিলঃ

ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة

হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। প্রথমটি ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়।

হযরত জাবের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ যদি দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে কি করিব?" নবী (সঃ) বলিলেন, "তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও।" –আবু দাউদ

সৌন্দর্য প্রদর্শনীর প্রবণতা

নারীহৃদয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসনাও দৃষ্টির কুফলের একটি হেতু। বাসনা সকল সময়ে সুস্পষ্টও হয় না। মনের যবনিকার আড়ালে কোথাও না কোথাও সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসনা লুক্কায়িত থাকে এবং তাহাই বেশভূষার সৌন্দর্যে, চুলের পরিপাটিতে, মিহি ও সৌখিন বস্ত্র নির্বাচনে এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যাপারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কুরআন এই সকলের জন্য 'তাবার–রুজে জাহিলিয়াত' নামে এক সার্বিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছে। স্বামী ব্যতীত অপরের চক্ষু জুড়াইবার উদ্দেশ্যে যে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেশভূষা করা হয় তাহাকেই বলে 'তাবার–রুজে জাহেলিয়াত'। এই উদ্দেশ্যে যদি কোন সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের বোরকা ব্যবহার করা হয় যাহা দেখিলে চোখের আনন্দ হয় তাহাও 'তাবার–রুজে জাহেলিয়াতে' পরিগণিত হইবে। ইহার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা যায় না। ইহা নারীর বিবেকের উপর নির্ভরশীল। নিজের মনের হিসাব তাহাকে নিজেই লইতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, তথায় কোন অপবিত্র বাসনা লুকাইয়া আছে কিনা। যদি থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য আল্লাহর এই নির্দেশঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى -

জাহিলিয়াতের যুগে যে ধরনের সাজ–সজ্জা ও ঠাট ঠমক করিয়া বেড়াইতে, এখন তাহা করিও না। –আহ্‌যাব ঃ ৩৩

যে সাজ-সজ্জার পশ্চাতে কোন অপবিত্র ইচ্ছা-বাসনা নাই, তাহা ইসলামী সাজ-সজ্জা। যাহার মধ্যে তিলমাত্র খারাপ বাসনা আছে, তাহাই জাহিলিয়াতের সাজ-সজ্জা।

জিহ্বার অনিষ্ট

মন-শয়তানের আর এক দালাল জিহ্বা। জিহ্বার দ্বারা অহরহ কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে এবং বিস্তার লাভ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী-পুরুষ কথোপকথন করিতেছে। কোন মন্দ বাসনা সুস্পষ্ট প্রকাশিত নহে কিন্তু মনের গোপন চোর কণ্ঠে মিষ্টতা, কথা বলার ভংগীতে একটা আকর্ষণ এবং কথাবার্তার একটা মোহাবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কুরআন এই মনচোরকে ধরিয়া দিতেছেঃ

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -

যদি তোমাদের মনে আল্লাহর ভয় থাকে, তাহা হইলে [অপরের সংগে] কমনীয় ভংগীতে কথা বলিও না। নতুবা যাহার মনে [খারাপ বাসনার] রোগ আছে, সে তোমাদের সম্পর্কে এক আশা পোষণ করিয়া বসিবে। কথা বলিতে হইলে সহজ সরলভাবে বল [যেমন একজন আর একজনের সংগে সাধারণভাবে বলিয়া থাকে]। -আহ্যাব ঃ ৩২

মনের এই চোরই অপরের বৈধ অথবা অবৈধ যৌন-সম্পর্কের অবস্থা বর্ণনা করিতে এবং শুনিতে আনন্দ উপভোগ করে। এই আনন্দরস উপভোগ করিবার জন্য প্রেমপূর্ণ গান গাওয়া হয়, সত্য-মিথ্যা প্রেমের গল্প বলা হয় এবং সমাজে এ সবের প্রচার এমনভাবে হয় যেন মৃদু মৃদু আগুনের আঁচ।

কুরআন বলেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

যাহারা ইচ্ছা করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নিলর্জ্জতার প্রচার হউক, তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখেরাতেও।

–নূর ঃ ১৯

জিহ্বার অনিষ্টকারিতার আরও অনেক বিভাগ আছে এবং প্রতিটি বিভাগে মনের একটি চোর নিযুক্ত আছে। ইসলাম এইসবের অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছে। কোন স্ত্রীলোককে অনুমতি দেওয়া হয় নাই যে, সে তাহার স্বামীর নিকটে অন্য কোন স্ত্রীলোকের অবস্থা বর্ণনা করে। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

لاتباشر المراة حتى تصفها لزوجها كانه ينظر اليها –

নারী–পুরুষকে নিষেধ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কিত গোপন অবস্থা অপরের নিকটে বর্ণনা না করে। কারণ ইহাতেও অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনের মধ্যে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হয়।

–আবু দাউদ

জামায়াতের সহিত নামাযে ইমাম যদি ভুল করেন কিংবা কোন ব্যাপারে তাঁহাকে সাবধান করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পুরুষদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, 'সুবহানাল্লাহ' বলিয়া সাবধান করিবে। কিন্তু নারীদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা মুখে কিছু না বলিয়া হাতের উপর হাতের আঘাত করিবে। –আবু দাউদ, বুখারী।

শব্দের অনিষ্ট

অনেক সময়ে জিহ্বা নীরব থাকে। কিন্তু অন্যান্য গতিবিধির দ্বারা শ্রবণশক্তি আকৃষ্ট করা হয়। ইহাও খারাপ নিয়্যতের সংগে সংশ্লিষ্ট এবং ইসলাম এই সম্পর্কে নিষেধবাণী উচ্চারণ করিয়াছেঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ –

তাহারা যেন পায়ের দ্বারা মাটিতে আঘাত করিয়া না চলে। নতুবা যে সৌন্দর্য [অলংকারাদি] তাহারা গোপন রাখিয়াছে তাহার অবস্থা জানিতে পারিবে। –সূরা নূরঃ ৩১

সুগন্ধের অনিষ্ট

একটি দুষ্ট মন হইতে অপর দুষ্ট মনে সংবাদ পৌছাইবার জন্য যত সংবাদবাহক আছে, তাহার মধ্যে সুগন্ধি একটি। ইহা সংবাদ পরিবহনের এক অতি সূক্ষ্ম উপায়, যাহাকে লোকে সূক্ষ্মই মনে করে। কিন্তু ইসলামী লজ্জা এতই অনুভূতিশীল যে, তাহার নমনীয় প্রকৃতির কাছে এই সূক্ষ্ম আন্দোলনও কঠিন। সুবাস-স্নাত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পথ চলিতে অথবা সভাস্থলে গমন করিতে ইসলামী লজ্জা কোন মুসলিম নারীকে অনুমতি দেয় না। কেননা তাহার সৌন্দর্য ও ভূষণ অপ্রকাশ থাকিলেই বা লাভ কি? কারণ তাহার সুঘ্রাণ বাতাসে ছড়াইয়া উত্তেজনার সঞ্চার করিবে।

قَالَ النبى صلعم المراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا يعنى زانية–

নবী (স) বলিয়াছেন, যে নারী আতর বা সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করত লোকের মধ্যে গমন করে সে একটি ভ্রষ্টা নারী।

اذا شهدت احداكن المسجد فلاتمسن طيبا–

তোমাদের মধ্যে কোন নারী মসজিদে গমন করিলে যেন দ্রব্যদি ব্যবহার না করে।

طيب الرجال ماظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخفى ريحه –

পুরুষের জন্য বর্ণহীন খোশবুদার আতর এবং নারীদের জন্য উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধহীন আতর উপযোগী।

নগ্নতার অনিষ্ট

সতরের[১] অধ্যায়ে ইসলাম মানবীয় লজ্জা-সম্ভ্রমের যে সঠিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর কোন সভ্যতা খন্ডন করিতে পারে নাই। আজকাল

১. ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নারী-পুরুষের শরীরের যে যে অংশ আবৃত রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে তাহাকে সতর বলে। –অনুবাদক

পৃথিবীর সুসভ্য জাতিগুলোরও এই অবস্থা যে, শরীরের যে কোন অংশ অনাবৃত রাখিতে তাহাদের নারী-পুরুষের বাধে না। তাহাদের নিকটে বেশ ভূষা সৌন্দর্যের জন্য, সতরের জন্য নহে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য হইতে সতরের গুরুত্ব অধিক; ইসলাম নারী-পুরুষকে তাহাদের দেহের ঐ সকল অংশ আবৃত রাখিতে আদেশ করে যাহার মধ্যে একে অপরের জন্য যৌন-আকর্ষণ পাওয়া যায়। নগ্নতা এমন এক অশ্লীলতা, যাহা ইসলামী লজ্জা-সম্ভ্রম কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। পর পুরুষের তো কথাই নাই, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের সম্মুখে উলংগ হওয়াকেও ইসলাম পসন্দ করে না।

-ইবনে মাজাহ্

اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين -

তোমাদের মধ্যে কেহ স্ত্রীর নিকটে গমন করিলে তাহার উচিত সতরের প্রতি লক্ষ্য রাখা। গর্দভের ন্যায় উভয়ে যেন উলংগ হইয়া না পড়ে।

-ইবনে মাজাহ্

قالت عائشة مانظرت الى فرج رسول الله صلعم -

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন দিন উলংগ অবস্থায় দেখেন নাই।

অধিকতর লজ্জা-সম্ভ্রম এই যে, একাকী উলংগ থাকাও ইসলাম পসন্দ করে না। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে বেশী লজ্জা করা উচিত।

اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين
يفضى الرجل الى اهله فاستحيو هم واكرموهم -

সাবধান! কভু উলংগ থাকিও না। কারণ তোমাদের সংগে আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ থাকেন, তাঁহারা তোমা হইতে পৃথক হন না, শুধু ঐ সময় ব্যতীত, যখন তোমরা মলত্যাগ করিতে যাও কিংবা স্ত্রীর নিকটে গমন কর। অতএব তাঁহাদের জন্য লজ্জা করিও এবং তাঁহাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

যে পোশাক-পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া শরীরের অংগ-অংশ দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ হইয়া যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা কোন পোশাকই নহে।

قال رسول الله صلعم نساء كاسيات عاريات حميلات مائلات
رؤسهن كالبخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها -

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যে সকল নারী কাপড় পরিধান করিয়াও উলংগ থাকে, অপরকে তুষ্ট করে এবং অপরের দ্বারা নিজে তুষ্ট হয়, বুখ্‌তি উটের ন্যায় গ্রীবা বক্র করত ঠাট-ঠমকে চলে, তাহারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, এমন কি বেহেশতের ঘ্রাণও পাইবে না।

এখানে কতিপয় দৃষ্টান্ত এইজন্য দেওয়া হইল যে, ইহা হইতে ইসলামী চরিত্রের মান এবং তাহার চারিত্রিক প্রাণশক্তি (Spirit) অনুমান করা যাইবে। ইসলাম সামাজিক পরিবেশ ও তাহার আবহাওয়াকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলীর সকল প্ররোচক বিষয় হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখিতে চায়। এই সকল প্ররোচনার উৎস মানুষের অন্তর প্রদেশে। অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলীর জীবাণূ ঐ স্থানেই প্রতিপালিত হয় এবং সেখান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন বা প্ররোচণার সূচনা হয় যাহা পরবর্তীকালে উদ্বেগ ও ঝঞ্জাটের কারণ হইয়া পড়ে। অজ্ঞ লোক ইহাকে তুচ্ছ মনে করিয়া উপেক্ষা করে; কিন্তু বিজ্ঞের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে উহাই চরিত্র, তমদ্দুন ও সমাজ ধ্বংসকারী মারাত্মক ব্যাধির মূল। অতএব ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অন্তর প্রদেশেই লজ্জার এমন এক বিরাট অনুভূতি সৃষ্টি করিতে চায়, যেন মানুষ নিজের হিসাব নিজেই লইতে থাকে এবং মন্দ কাজের প্রতি সামান্যতম প্রবণতা দেখা দিলে, তাহা অনুভব করত স্বীয় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাহা অংকুরে বিনষ্ট করিতে পারে।

শাস্তি বিধায়ক আইন

ইসলামের শাস্তি বিধায়ক আইনের মূলের মূল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার মত কোন অপরাধ না করিয়া ফেলে, ততক্ষণ তাহাকে রাজনীতির অক্টোপাশে আবদ্ধ করা হইবে না। কিন্তু একবার উক্ত অপরাধ করিয়া বসিলে মৃদু শাস্তি দিয়া পাপ করিবার এবং শাস্তি ভোগ করিবার জন্য অভ্যস্ত করিয়া তোলা উচিত হইবে না। অপরাধ প্রমাণ

করিবার শর্ত কঠিন রাখিতে হইবে।[১] যতদূর সম্ভব আইনের আওতায় আসা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে।[২] কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আইনের আওতায় আসিবে, তখন তাহাকে এমন গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবে যেন সে কেবল পাপের পুনরাবৃত্তি হইতে দূরে থাকে না, বরং এই পাপের প্রতি অনুরক্ত অন্যান্য শত সহস্র লোক উক্ত গুরুতর শাস্তি দেখিয়া ভীত-শংকিত হইয়া পড়ে। কারণ আইনের উদ্দেশ্য সমাজকে অপরাধমুক্ত করা। ইহা নহে যে, মানুষ বারবার অপরাধ করুক এবং বারবার শাস্তি ভোগ করুক।

সামাজিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইসলামী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যে সকল কার্যকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে স্থির করিয়াছে তাহা দুইটি। একটি ব্যভিচার, দ্বিতীয়টি ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ।

ব্যভিচারের শাস্তি

ব্যভিচার সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নৈতিকতার দিক দিয়া এই কার্য মানুষের চরম অধপতনের ফল।

যে ব্যক্তির দ্বারা এই কাজ হয়, সে প্রকৃতপক্ষে এই কথার প্রমাণ দেয় যে, তাহার মনুষ্যত্ব পশুত্বের নিকট হার মানিয়াছে। ইহার পর সে মানব সমাজের একজন সৎ সদস্য হইয়া থাকিতে পারে না। যে সকল অপরাধ মানবীয় তমদ্দুনের মূলে কুঠারাঘাত করে, সমাজের দৃষ্টিতে ইহা সেই সকল বিরাট অপরাধের একটি। এই সকল কারণে ইসলাম ইহাকে একটি দন্ডনীয় পাপ

---

১. ইসলামী সাক্ষ্য-আইনে অপরাধ প্রমাণ করিবার শর্ত সাধারণত বড় কঠিন করা হইয়াছে। ব্যভিচার প্রমাণ করিবার শর্ত সবচাইতে বেশী কঠিন করা হইয়াছে। সাধারণভাবে সমগ্র ব্যাপারে ইসলামী আইন দুইজন সাক্ষী যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু ব্যভিচার প্রমাণের ব্যাপারে অন্তত চারিজন সাক্ষী নির্ধারিত করা হইয়াছে।

২. নবী (সঃ) বলেনঃ

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعم فان كان له مخرج فخلوا سبيلهم فان الامام يخطئ فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبة

মুসলমানদিগকে যথাসম্ভব শাস্তি হইতে রক্ষা কর। অপরাধীর জন্য পরিত্রাণের কোন উপায় থাকিলে ছাড়িয়া দাও। কারণ ইমামের পক্ষে শাস্তি দিতে ভুল করা হইতে মুক্তি দিতে ভুল করা শ্রেয়। -তিরমিযী

বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইহার সহিত অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হউক আর নাই হউক। যথাঃ বলপূর্বক হউক অথবা অন্যের অধিকার হরণ হউক আর নাই হউক।

কুরআনের নির্দেশ এইঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ *

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে এক শত করিয়া বেত্রাঘাত কর এবং আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তাহাদের প্রতি কখনও অনুকম্পাশীল হওয়া চলিবে না, যদি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকে এবং যখন তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইবে, তখন মুসলমানদের একটি দল তাহাদের শাস্তি দেখিবার জন্য যেন উপস্থিত থাকে।

–সূরা নূরঃ ২

এই অধ্যায়ে ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য আইনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে শুধু ব্যভিচার কোন অপরাধ নহে। তাহাদের চক্ষে ব্যভিচার একমাত্র তখনই অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হইবে, যখন উহা বলপূর্বক করা হইবে অথবা এমন কোন নারীর সহিত–যাহার স্বামী রহিয়াছে। অন্য কথায় তাহাদের আইনে ব্যভিচার কোন অপরাধ নহে, বরং অপরাধ হইতেছে বল প্রয়োগ করা কিংবা অপরের অধিকার হরণ করা। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে ব্যভিচারই একটি অপরাধ এবং বলপ্রয়োগ ও অপরের অধিকার হরণ অতিরিক্ত অপরাধ। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে শাস্তির বেলায়ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। পাশ্চাত্য আইন বলপূর্বক ব্যভিচারের জন্য কারাদন্ডই যথেষ্ট মনে করে এবং বিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করিলে তাহার স্বামীকে ক্ষতি পূরণের অধিকার দেওয়া হয়। এই দন্ড অপরাধ প্রতিরোধ করে না; বরং লোককে আরও নির্ভীক করিয়া দেয়। এইজন্য ঐ সমস্ত দেশে, যেখানে আইন প্রচলিত আছে, ব্যভিচারের মাত্রা বাড়িয়া

চলিয়াছে। ইহার বিপরীত ইসলামী আইন ব্যভিচারের জন্য এই ধরনের অপরাধ ও অপরাধী হইতে মুক্ত রাখে। যে সকল দেশে ব্যভিচারের জন্য এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়, তথায় এই অপরাধ কখনও সার্বজনীন হয় না। একবার শরীআতের বিধান মত শাস্তি হইলে দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে এমন এক আতংকের সৃষ্টি হয় যে, কয়েক বৎসর পর্যন্ত এই ধরনের অপরাধ করিতে কাহারও সাহস হয় না। এই ধরনের অপরাধপ্রবণ লোকের মনে ইহা এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন, যাহা দ্বারা তাহার মনে আপনা-আপনি সংস্কার হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য মন এক শত বেত্রাঘাত ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইহার কারণ ইহা নহে যে, সে মানুষের দৈহিক শাস্তি পসন্দ করে না; বরং তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, তাহার নৈতিক অনুভূতির পরিস্ফুরণ এখনও হয় নাই। সে প্রথমত ব্যভিচারকে একটা দোষ মনে করিত। এখন উহাকে একটা নিছক ক্রীড়া, একটা চিত্তবিনোদ মনে করে, যাহার দ্বারা দুইটি মানব-মানবী কিছুক্ষণের জন্য মনোরঞ্জন করিতে পারে। এইজন্য সে চায় যে, আইন এই কাজে উদারতা প্রদর্শন করুক এবং যে পর্যন্ত ব্যভিচারী অপরের স্বাধীনতা বা আইনগত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, সে পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হউক। অতপর অপরের স্বাধীনতা বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলে ইহাকে এমন অপরাধ মনে করা হয়, যাহা দ্বারা এক ব্যক্তির অধিকারই ক্ষুণ্ন হয়। এইজন্য সে সাধারণ দন্ড অথবা ক্ষতি পূরণ এই অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি মনে করে।

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি ব্যভিচার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা রাখে, সে এই কাজের এক শত বেত্রাঘাতকে উৎপীড়নমূলক শাস্তিই মনে করিবে। কিন্তু যখন তাহার নৈতিক ও সামাজিক অনুভূতির উন্নতি হইবে এবং সে জানিতে পারিবে যে, ব্যভিচার স্বেচ্ছায় হউক অথবা বলপূর্বক হউক, সকল অবস্থায়ই ইহা একটি সামাজিক অপরাধ এবং সমগ্র সমাজই ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন শাস্তি সম্পর্কেও তাহার দৃষ্টিভংগীর আপনা-আপনি পরিবর্তন হইবে। তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অনিষ্ট হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে এবং যেহেতু ব্যভিচারে প্ররোচিত করিবার উপাদান মানুষের পাশবিক প্রকৃতিতে বদ্ধমূল থাকে ও ইহার মূলোচ্ছেদ নিছক কারাদন্ড ও

ক্ষতি পূরণের দ্বারা সম্ভব নহে, সেইজন্য ইহার সকল পথ রুদ্ধ করিতে হইলে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় নাই। অপরাধীকে শাস্তির কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিয়া গোটা জাতিকে এবং তাহার ভবিষ্যত নিরপরাধ বংশধরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা অপেক্ষা এক বা দুই ব্যক্তিকে কঠিন দৈহিক শাস্তি দান করত লক্ষ লক্ষ মানবকে অসংখ্য নৈতিক ও সামাজিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা অধিকতর শ্রেয়।

এক শত বেত্রাঘাতকে অত্যাচারমূলক মনে করার অপর একটি কারণ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূল সম্পর্কে চিন্তা করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ংগম করা যায়। পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, এই সভ্যতার সূচনাই হইয়াছে সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টিকে সমর্থন করার প্রবণতা হইতে এবং এই সভ্যতার গোটা ভিত্তিই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অধিকারের একটি অতিরিক্ত ধারণা হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইজন্য ব্যক্তি সমষ্টির উপরে যতই অন্যায় করুক না কেন, পাশ্চাত্যবাসীর নিকট ইহা তেমন অসহনীয় হয় না, বরং অধিক ক্ষেত্রে তাহারা ইহাকে আনন্দ সহকারে বরণ করিয়া লয়। অবশ্য সমষ্টির অধিকার সংরক্ষণের জন্য যখন ব্যক্তির উপর হাত দেওয়া হয়, তখন তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তাহাদের সমস্ত সহানুভূতি সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির জন্য হইয়া থাকে। উপরন্তু সমগ্র জাহিলী যুগের অধিবাসীদের ন্যায় পাশ্চাত্য জাহিলিয়তের উক্ত অনুরক্তদেরও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যুক্তির পরিবর্তে ভাবপ্রবণতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। একটি ব্যক্তির যে অনিষ্ট হয়, সেইজন্য উহা যেহেতু সীমিত আকারে অনুভূত হয়, সেইজন্য উহাকে তাহারা এক বিরাট বিষ মনে করে। পক্ষান্তরে গোটা সমাজ ও তাহার ভবিষ্যত বংশধরের যে ব্যাপক অনিষ্ট হয়, তাহারা তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে না।

ব্যভিচারের ভিত্তিহীন অভিযোগের শরীআতী বিধান

ব্যভিচারে যে অনিষ্ট হয়, প্রায় অনুরূপ অনিষ্ট ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগেও হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করাতে শুধু তাহার একার কলংক হয় না, বরং ইহাতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে শত্রুতা বাড়িয়া যায়, বংশাবলী সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে, দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায় এবং এক ব্যক্তি মাত্র একবার কিছু বাক্য উচ্চারণ

করিয়া বহু লোককে বহু বৎসর যাবত শাস্তি দিতে থাকে। কুরআনে এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কুরআন বলেঃ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمٰنِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ *

যাহারা পূণ্যপূত মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করিবে, অতপর তাহার সপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিবে না তাহাদিগকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না। এই ধরনের লোক নিজেরাই দুষ্কর্মকারী। —সূরা নূর ঃ ৪

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

এইভাবে ইসলামের ফৌজদারী আইন আপন রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা একদিকে অন্যায় কাজ বলপূর্বক রহিত করে এবং অপরদিকে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে দুরভিসন্ধিকারী মানুষের অপবাদ হইতেও রক্ষা করে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানুষকে ভিতর হইতে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করিয়া দেয় যে, তাহার মধ্যে মন্দ কাজ করিবার বাসনাই অবশিষ্ট থাকে না। আবার ইসলামের শাস্তি বিধায়ক আইন মানুষকে বাহির হইতে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করিয়া দেয় যে, নৈতিক শিক্ষা ত্রুটিযুক্ত থাকিবার কারণে মনের মধ্যে খারাপ বাসনা সৃষ্টি হইলে এবং তাহা জোরপূর্বক কার্যে পরিণত করিলে তাহাকে আইনবলে রোধ করা হয়। এই উভয় পদ্ধতির মাঝখানে অতিরিক্ত পদ্ধতি এই কারণে অবলম্বন করা হইয়াছে যে, তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কারে নৈতিক শিক্ষার সহায়ক হইবে। এই সকল পদ্ধতির দ্বারা সমাজ ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংশোধিত করা হইয়াছে যে, নৈতিক শিক্ষার ত্রুটির কারণে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা রহিয়া যায়, তাহা যেন বাড়িয়া না যায় এবং কার্যকরী না হয়; সমাজের মধ্যে যেন এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে খারাপ বাসনা পরিস্ফুরণের সুযোগ না থাকে এবং তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা নষ্ট করিবার সম্ভাব্য সকল প্রকার পথ রুদ্ধ হয়।

এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনার জন্য ঐ সকল পদ্ধতির এক একটি বর্ণনা করিতেছি।

পোশাক ও সতরের আদেশ

সামাজিক নির্দেশাবলীর ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কাজ এই যে, সে নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে এবং নারী–পুরুষের জন্য সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে আরব জাহিলিয়াতের যে অবস্থা ছিল, তাহা হইতে ভিন্ন নহে। তাহারা একে অপরের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় উলংগ হইয়া পড়িত।[১] গোসল ও মলত্যাগের সময় পর্দা করা তাহারা নিষ্প্রয়োজন মনে করিত। সম্পূর্ণ উলংগ হইয়া কা'বাঘরের তাওয়াফ করা হইত এবং ইহাকে উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করা হইত।[২] নারীরাও তাওয়াফের সময় উলংগ হইয়া পড়িত।[৩] তাহাদের স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হইত যে, বুকের কিয়দংশ অনাবৃত থাকিত এবং বাহু, কোমর ও হাঁটুর নীচে কিয়দংশ অনাবৃত থাকিত। অবিকল এই অবস্থা বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে দেখা যায়। শরীরের কোন কোন অংশ অনাবৃত ও কোন কোন অংশ আবৃত থাকিবে ইহা নির্ধারণকারী কোন সমাজ ব্যবস্থা প্রাচ্যের দেশগুলির কোথাও নাই।

ইসলাম এই ব্যাপারে মানুষকে সভ্যতার প্রথম পাঠ শিক্ষা দিয়াছে।

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا–

হে মানব সন্তান। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের শরীর আবৃত করিবার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইহা তোমাদের শোভাবর্ধক।

–সূরা আরাফঃ ২৬

---

১. হাদীসে আছেঃ হযরত মিস্ওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) একটি প্রস্তর বহন করিয়া আনিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার তহবন্দ খুলিয়া গেল এবং তিনি এই অবস্থায় প্রস্তর বহন করিয়া আনিতেছিলেন। নবী (সঃ) দেখিয়া বলিলেন, 'আপন শরীর আবৃত কর এবং উলংগ অবস্থায় চলিও না।' –মুসলিম

২. ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), তাউস (রঃ) ও যুহরী (রঃ) একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, কা'বা ঘরের তাওয়াফ উলংগ অবস্থায় করা হইত।

৩. মুসলিম, কিতাবুত তফসীরে আরবের এই প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একনজ নারী উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করিত এবং সমবেত লোকদিগকে বলিত, 'কে আমাকে একটি বস্ত্র দান করিবে যাহা দ্বারা আমি আমার শরীর আবৃত করিব?' এইভাবে উক্ত নগ্ন নারীকে বস্ত্র দান করা বিরাট পূণ্য কাজ মনে করা হইত।

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী শরীর আবৃত করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য ফরয করা হইয়াছে। নবী (সঃ) কড়া নির্দেশ দান করিয়াছেন যেন কেহ কাহারও সম্মুখে উলংগ না হয়।

ملعون من نظر الى سواة اخيه -

যে আপন ভাইয়ের সতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত।
-জাসসাসঃ আহকামুল কুরআন

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المراة الى عورة المرأة .

কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলংগ অবস্থায় না দেখে। -মুসলিম

لان اخر من السماء فانقطع نصفين احب الى من انظر الى عورة احد او ينظر الى عورتى -

আল্লাহর কসম, আমার আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দ্বিখন্ডিত হইয়া যাওয়া অধিকতর শ্রেয় এমন অবস্থা হইতে যে, আমি কাহারও গুপ্তাংগ দেখি অথবা কেহ আমার গুপ্তাংগ দেখে। -মাবসূত

اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله -

সাবধান, কখনও উলংগ হইবে না। কারণ তোমাদের সংগে যাহারা আছে, তাহারা কখনও তোমাদের সংগ ত্যাগ করে না, মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত। -তিরমিযী

اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين -

যখন তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার স্ত্রীর নিকটে গমন করে তখনও সে যেন তাহার সতর আবৃত রাখে এবং একেবারে গর্দভের ন্যায় উলংগ হইয়া নাপড়ে। -ইবনে মাজাহ

একবার নবী (সঃ) যাকাতের উটের চারণভূমিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উষ্ট্র-রাখাল উলংগ হইয়া শুইয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারিত করিলেন এবং বলিলেনঃ

لا يعمل لنا من لا حياء له - ،

যে নির্লজ্জ সে আমাদের কোন কাজের নয়।

পুরুষের জন্য সতরের সীমারেখা

এই সকল নির্দেশের সংগে নারী-পুরুষের শরীর ঢাকিবার সীমারেখাও পৃথক পৃথক নির্ধারিত করা হইয়াছে। শরীরের যে অংশ আবৃত রাখা ফরয করা হইয়াছে শরীআতের পরিভাষায় তাহাকে সতর বলে। পুরুষের জন্য নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকে সতর বলা হইয়াছে এবং আদেশ করা হইয়াছে যে, উহা যেন অপরের সম্মুখে অনাবৃত করা না হয় এবং অপরেও যেন উহা না দেখে।

عن ابى ايوب الانصارى عن النبى صلعم مافوق الركبتين من العورة واسفل من سرة من العورة -

আবু আইয়ুব আনসারী হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলেন, 'হাঁটুর উপরে ও নাভীর নীচে যাহা আছে তাহা ঢাকিবার অংশ।' -দারু কুতনী

عورة الرجل مابين سرته الى ركبتيه-

পুরুষের জন্য নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিবার অংশ। -মাবসূত

عن على بن ابى طالب عن النبى صلعم لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حى ولا ميت -

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুর (স) এরশাদ করেন, নিজের উরু কাহাকেও দেখাইও না এবং কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। -তাফসীরে কবীর

ইহা সার্বজনীন নির্দেশ। একমাত্র স্ত্রী ব্যতীত কেহ ইহার ব্যতিক্রম নহে।

احفظ عورتك الامن زوجتك او ماملكت يمينك –

তোমাদের স্ত্রীর ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্যের নিকট হইতে তোমাদের সতর রক্ষা কর। –আহকামুল কুরআন

নারীর জন্য সতরের সীমারেখা

নারীদের জন্য সতরের সীমারেখা অধিকতর প্রশস্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে, নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত রাখিতে হইবে। পিতা, ভ্রাতা ও সমস্ত নিকট আত্মীয়গণ এই আদেশের শামিল এবং স্বামী ব্যতীত কোন পুরুষের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

لا يحل لا مراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تخرج يديها الا الى ههنا وقبض نصف الذراع –

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তাহার জন্য ইহার বেশী হাত খুলিয়া রাখা জায়েয নহে।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের কব্জীর মধ্যস্থলে হাত রাখিলেন। –ইবনে জরীর

الجارية اذاحاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها ويدها الى المفصل –

যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয়, তখন তাহার শরীরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধু মুখমন্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় দেখা যাইতে পারে। –আবূ দাউদ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি একবার বেশভূষা করিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন তোফায়েলের সম্মুখে আসিলে নবী (সঃ) ইহা অপসন্দ করিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! সে তো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।' নবী (সঃ) তখন বলিলেনঃ

اذا عرقت المرأة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا مادون هذا
وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضته
اخرى -

যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় তখন মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত শরীরের কোন অংশ প্রকাশ করা তাহার জন্য জায়েয নয়।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার কব্জীর উপরে এমনভাবে হাত রাখিলেন যে, কব্জীর মধ্যস্থল এবং তাঁহার হাত রাখিবার স্থানের মধ্যে মাত্র একমুষ্ঠি পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল। –ইবনে জরীর

নবী করীম (সঃ)–এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) একবার মিহি কাপড় পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়া তাঁহার শরীরের অংগ–প্রত্যংগ দেখা যাইতেছিল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া নবী (সঃ) বলিলেনঃ

يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى
منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفه -

'হে আসমা! সাবালিকা হওয়ার পর ইহা ও উহা ব্যতীত শরীরের কোন অংশ অপরকে দেখান কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েয হইবে না।'–এই বলিয়া নবী (সঃ) তাঁহার মুখমন্ডল ও হাতের কব্জীর দিকে ইংগিত করিলেন। –ফাতহুল কাদীর

হাফ্সা বিনতে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরিধান করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর গৃহে হাযির হইলেন। তখন তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একটা মোটা চাদর দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া দিলেন।
–ইমাম মালিকঃ মুয়াত্তা

নবী (সঃ) বলিয়াছেনঃ

لعن الله الكاسيات العاريات -

আল্লাহ্র অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর, যাহারা কাপড় পরিধান করিয়াও উলংগ থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেনঃ

নারীদিগকে এমন আঁট-সাঁট কাপড় পরিধান করিতে দিও না যাহাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

এই সকল বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মুখমন্ডল ও হাতের কব্জী ব্যতীত নারীর সমস্ত শরীর সতরের মধ্যে শামিল। বাড়ীর অতি আপন লোকের নিকটেও এই সতর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে এই সতর খুলিতে পারা যাইবে না, সে পিতা, ভ্রাতা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র যেই হউক না কেন। যে সকল বস্ত্রের ভিতর দিয়া শরীরের অংগ-প্রত্যংগ দেখা যায়, তাহাও পরিধান করা যাইবে না।

এই অধ্যায়ে যত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলই যুবতী নারীর জন্য। সতর ঢাকিবার নির্দেশাবলী ঐ সময় প্রযোজ্য হয়, যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত তাহার মধ্যে যৌন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে ততদিন পর্যন্ত ইহা বলবৎ থাকে। এই বয়স অতিক্রান্ত হইলে কিছুটা শিথিল করা হইয়াছে।

কুরআন পাক বলেঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ -

যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পুনরায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তাহারা যদি দোপাট্টা খুলিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। তবে শর্ত এই যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাহাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাহাদের জন্য মংগলকর।

-সূরা নূর ঃ ৬০

এখানে কড়াকড়ি হ্রাস করার কারণ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। 'বিবাহের আশা পোষণ করে না'- কথার মর্ম এই যে, যৌনস্পৃহা ও যৌন-আকর্ষণ না থাকা। উপরন্তু সাবধানতার জন্য এই শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন উদ্দেশ্য না হয় অর্থাৎ যৌনস্পৃহার কণামাত্র স্ফুলিংগ যদি বুকের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে দোপাট্টা খুলিয়া রাখা

জায়েয হইবে না। কেবল ঐ সকল বৃদ্ধাদের জন্য এই নিয়ম শিথিল করা হইয়াছে, যাহারা বার্ধক্যে উপনীত হইবার কারণে পোশাক সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং যাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ব্যতীত কোন কুদৃষ্টি পতিত হইবার আশংকা নাই। এই ধরনের স্ত্রীলোক দোপাট্টা অথবা চাদর ব্যতীত গৃহে অবস্থান করিতে পারে।

অনুমতি গ্রহণ

ইহার পরে দ্বিতীয় বাধা যাহা আরোপ করা হইয়াছে তাহা এই যে, গৃহের অধিবাসীদের বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাতে গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে কেহ এমন অবস্থায় দেখিতে না পায়, যে অবস্থায় তাহাদিগকে দেখা পুরুষের উচিত নহে।

وَاذَا بَلَغَ الاَطفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَاذِنُوا كَمَا استَاذَنَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم

যখন তোমাদের পুত্রগণ সাবালক হইবে, তখন অনুমতি সহকারে গৃহে প্রবেশ করা তাহাদের উচিত, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তিগণ অনুমতি সহকারে গৃহে প্রবেশ করিত। —সূরা নূর ঃ ৫৯

এখানেও কারণ পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। অনুমতি গ্রহণের আদেশ শুধু তাহাদের জন্যই প্রযোজ্য, যাহাদের মধ্যে যৌন-অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছে। এই অনুভূতির সঞ্চার হইবার পূর্বে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক নহে।

এতদ্‌সহ অপর লোকদিগকেও আদেশ করা হইয়াছে, যেন তাহারা বিনা অনুমতিতে কাহারও গৃহে প্রবেশ না করে।

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لاَ تَدخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُم حَتّٰى تَستَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلٰى اَهلِهَا -

হে ঈমানদারগণ! গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাহারও গৃহে প্রবেশ করিও না এবং যখন প্রবেশ করিবে তখন গৃহের অধিবাসীদেরকে সালাম বলিবে। —সূরা নূর ঃ ২৭

গৃহের ভিতরে ও বাহিরের মধ্যে একটা বাধা-নিষেধ স্থাপন করাই এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য, যেন পারিবারিক জীবনে নারী পর-পুরুষের দৃষ্টি হইতে নিরাপদ

থাকিতে পারে। আরববাসিগণ প্রথমে এই সকল নির্দেশের কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। এইজন্য অনেক সময়ে তাহারা ঘরের বাহির হইতে ভিতরে উঁকি মারিত। স্বয়ং নবী করিম (সঃ)–এর সংগে একবার এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদা তিনি তাঁহার হুজরায় অবস্থান করিতে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জানালা দিয়া উঁকি মারিল। তিনি বলিলেন ঃ

যদি আমি জানিতাম যে, তুমি উঁকি মারিবে, তাহা হইলে তোমার চোখে কিছু প্রবিষ্ট করাইতাম। অনুমতি গ্রহণের আদেশ তো দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। –বুখারী।

ইহার পর তিনি ঘোষণা করিলেনঃ

যদি কেহ অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের গৃহের ভিতরে তাকাইয়া দেখে তাহা হইলে তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিবার অধিকার গৃহের অধিবাসীদের থাকিবে। –মুসলিম

অতপর অপরিচিত লোককে আদেশ করা হইয়াছে যে, যদি অপরের গৃহ হইতে কিছু চাহিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গৃহে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ–

তোমরা নারীদের নিক হইতে যখন কিছু চাহিবে, তখন পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। ইহাতে তোমাদের এবং উহাদের মনের জন্য অধিকতর পবিত্রতা রহিয়াছে। –সূরা আহ্যাব ঃ ৫৩

এখানেও বাধা–নিষেধের উদ্দেশ্যের উপর পূর্ণ আলোকপাত করা হইয়াছে। নারী–পুরুষকে যৌনস্পৃহা ও উত্তেজনা হইতে রক্ষা করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এই নির্দেশের দ্বারা নারী–পুরুষের স্বাধীন মেলামেশা বন্ধ করা হইয়াছে।

এই নির্দেশাবলী শুধু অপরিচিতের জন্য নহে, বরং গৃহের চাকরদের জন্যও বটে। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত বিলাল (রাঃ) অথবা হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)–এর নিকট হইতে তাঁহার কোন এক সন্তান লইতে চাহিলেন। তখন তিনি পর্দার অন্তরাল হইতে সেই সন্তানকে দিলেন। –ফতহুল কাদির

অথচ উভয়েই নবী–পাক (সঃ)–এর বিশেষ ভৃত্য এবং আপন জনের মত ছিলেন।

নিভৃতে সাক্ষাত ও শরীর স্পর্শ

তৃতীয় বাধা–নিষেধ এই যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কেহ কোন নারীর সংগে নিভৃতে থাকিতে এবং তাহার শরীর স্পর্শ করিতে পারিবে না, সে যতই নিকটতম বন্ধু বা আত্মীয়ই হউক না কেন।

عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلعم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يارسول الله افرأيت الحمو قال الحموالموت–

উকবা বিন–আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, 'সাবধান, নিভৃতে নারীদের নিকটে যাইও না।' জনৈক আনসার বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' নবী (সঃ) বলিলেন, 'সে তো মৃত্যুর ন্যায়!' –বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم–

স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যাইও না। কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হইবে।

–তিরমিযী

عن عمرو ابن عاص قال نهانا رسول الله صلعم ان ندخل على النساء بغير اذن ازواجهن–

আমর বিন আস্ বলেন, 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যাইতে নবী (সঃ) আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।' –তিরমিযী

لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبته الامعه رجل او اثنان –

আজ হইতে যেন কেহ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে না যায়, যতক্ষণ তাহার নিকটে একজন অথবা দুইজন লোক না থাকে।

–মুসলিম

স্পর্শ করার বিরুদ্ধেও এইরূপ নির্দেশ আছেঃ

قال النبى صلعم من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيمة –

নবী (সঃ) বলেন, 'যদি কেহ এমন কোন নারীর হস্ত স্পর্শ করে, যাহার সহিত তাহার কোন বৈধ সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে পরকালে তাহার হাতের উপরে জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হইবে।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) নারীদের নিকট হইতে শুধু মৌখিক বায়'আত গ্রহণ করিতেন। তাহাদের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইতেন না। বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত তিনি কোন নারীর হস্ত স্পর্শ করেন নাই। –বুখারী

উসায়মা বিন্‌তে রুকায়কা বলেন, 'আমি কয়েকজন মহিলাকে সংগে লইয়া নবী (সঃ)–এর নিকটে বায়আত গ্রহন করিতে গেলাম। শিরক, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যাপবাদ ও নবীর নাফরমানী হইতে বিরত থাকার শপথ তিনি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন।' শপথ গ্রহণ শেষ হইলে আমরা বলিলাম, 'আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত করি।' নবী বলিলেন, 'আমি নারীদের হস্ত স্পর্শ করি না, শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করি।' –নাসায়ী ও ইব্‌নে মাজাহ

এই নির্দেশগুলিও শুধু বয়স্ক নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। বৃদ্ধা নারীর নিকটে নিভৃতে বসা এবং তাহার শরীর স্পর্শ করা জায়েয। হযরত আবু বকর (রাঃ) এক গোত্রের মধ্যে যাতায়াত করিতেন– যেখানে তিনি দুধ পান করিয়াছিলেন। ঐ গোত্রের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের তিনি করমর্দন [মুসাফেহা] করিতেন। কথিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর এক বৃদ্ধার দ্বারা হাত পা দাবাইয়া লইতেন।

যুবতী ও বৃদ্ধা নারীর মধ্যে এই যে পার্থক্য রাখা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিতে হইবে। কারণ ইহা অনিষ্টের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে।

মুহরেম ও গায়েব মুহরেমের মধ্যে পার্থক্য

স্বামী ব্যতীত মুহরেম ও গায়ের মুহ্রেম নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষ উপরের নির্দেশাবলীর অধীন। ইহাদের মধ্যে কাহারও সম্মুখে নারী তাহার সতর অর্থাৎ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত শরীরের কোন অংশ খোলা রাখিতে পারে না, যেমন কোন পুরুষ কোন পুরুষের সম্মুখে তাহার সতর [নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী কোন অংশ] খুলিতে পারে না।

সমস্ত পুরুষকে অনুমতি সহকারে গৃহে প্রবেশ করা উচিত এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও নির্জনে কোন নারীর নিকটে উপবেশন করা অথবা তাহার শরীর স্পর্শ করা জায়েয নহে।[১]

১. শরীর স্পর্শ করা বা শরীরে হাত লাগান সম্পর্কে মুহ্রেম ও গায়ের মুহরেম পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভ্রাতা ভগ্নির হাত ধরিয়া কোন যানবাহনে উঠাইয়া দিতে অথবা তথা হইতে নামাইয়া লইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ইহা কোন গায়ের মুহরেমের জন্য জায়েয নহে। নবী করীম (সঃ) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে কাছে টানিয়া মস্তক চুম্বন করিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মস্তক চুম্বন করিতেন।

পর্দার নির্দেশাবলী

কুরআন পাকের যে সকল আয়াতে পর্দার আদেশ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

قُل لِّلمُؤ مِنِينَ يَغُضُّوا مِن اَبصَارِهِم وَيَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذٰلِكَ اَزكى لَهُم اِنَّ اللّٰه خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعُونَ - وَقُل لِّلمُؤمِنٰت يَغضُضنَ مِن اَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَلَيَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ اَو اٰبَاءِ هِنَّ اَو اٰبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَو اَبنَاءِ هِنَّ اَو اَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَو اِخوَانِهِنَّ اَو بَنِى اِخوَانِهِنَّ اَو بَنِى اَخَوٰتِهِنَّ اَو نِسَاءِ هِنَّ اَو مَامَلَكَت اَيمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِينَ غَيرَ اُولِى الاِربَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفلِ الَّذِينَ لَم يَظهَرُوا عَلى عَورَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضرِبنَ بِاَرجُلِهِنَّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ -

[হে নবী!] মু'মিন পুরুষগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে। ইহাই তাহাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তাহারা যাহা কিছুই করে, আল্লাহ তৎসম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এবং মু'মিন নারিগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে এবং স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত যাহা স্বতই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এবং যেন তাহারা স্বীয় বক্ষের উপরে উড়িবার চাদর টানিয়া দেয় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে [অন্য কাহারও নিকটে] এই সকল লোক ব্যতীত, যথাঃ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, তৎপুত্র,

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং ঐ সকল বালক, যাহারা নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় নাই। [উপরন্তু তাহাদিগকে আদেশ করুন যে] তাহারা যেন পথ চলিবার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যাহাতে তাহাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

–সূরা নূর ঃ ৩০-৩১

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا – وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى –

হে নবীর বিবিগণ। তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নহ। যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিনাইয়া বিনাইয়া [দ্ব্যর্থবোধক] কথা বলিও না। কারণ ইহার ফলে যাহাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে, তাহারা তোমাদের উপরে এক ধরনের আশা পোষণ করিয়া বসিবে। সহজ-সরলভাবে কথা বলিও। আপন ঘরে থাকিও এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করিয়া বেড়াইও না।

–সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৩

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ – ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ –

হে নবী! আপন বিবি, কন্যা ও মু'মিন মহিলাদের বলিয়া দিন, তাহারা যেন তাহাদের শরীর ও মুখমন্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে।

–সূরা আহ্যাব ঃ ৫৯

এই সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখুন। পুরুষকে তো শুধু এতটুকু তাকীদ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত করিয়া রাখে এবং যৌন অশ্লীলতা হইতে আপন চরিত্রকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু নারীদিগের প্রতি উপরিউক্ত দুইটি আদেশ তো করা হইয়াছেই, উপরন্তু সামাজিকতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কেও অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিষ্কার

অর্থ এই যে, তাহাদের চরিত্র সংরক্ষণের জন্য শুধু দৃষ্টি সংযত করা এবং গুপ্তাংগের রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নহে বরং আরও কতকগুলি রীতিনীতির প্রয়োজন। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এই নির্দেশগুলিকে কিভাবে ইসলামী সমাজে রূপায়িত করিয়াছিলেন। এই সকল নির্দেশের প্রকৃত মর্ম কি এবং কিভাবে এইগুলি কার্যকরী করা যায়, তাঁহাদের কথা ও কাজ এই সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে কি-না, তাহাও আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

দৃষ্টি সংযম

সর্বপ্রথম নারী ও পুরুষকে আদেশ করা হইয়াছে, 'দৃষ্টি অবনমিত কর।' অর্থাৎ কাহারও মুখমন্ডলের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা নিম্নমুখী করিতে হইবে। ইহাই কুরআনের 'গদ্দে-বাসার' শব্দের শাব্দিক অর্থ। কিন্তু ইহার দ্বারা পূর্ণ মর্ম পরিষ্কার হয় না। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মানুষ সকল সময় নীচের দিকে দেখিবে এবং উপরের দিকে কখনও তাকাইবে না, বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ঐ বস্তু হইতে নিজেকে রক্ষা করুক যাহাকে হাদীসের পরিভাষায় চক্ষুর ব্যভিচার বলা হইয়াছে। অপরিচিত নারীর রূপ ও সৌন্দর্য-শোভা দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করা পুরুষের জন্য যেমন অনাচার সৃষ্টিকারী, তেমনই অপরিচিত পুরুষের প্রতি তাকাইয়া দেখাও নারীর জন্য অনাচার সৃষ্টিকারী। অনাচার বিপর্যয়ের সূচনা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে এইখান হইতেই হয়। এইজন্য সর্বপ্রথম এই পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দৃষ্টিসংযম বা দৃষ্টি অবনমিত করণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই।

ইহা সত্য যে, চক্ষু খুলিয়া দুনিয়ায় বাস করিতে গেলে সব কিছুর উপরেই দৃষ্টি পতিত হইবে। ইহা তো সম্ভব নহে যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে এবং কোন নারী কোন পুরুষকে কখনও দেখিবে না। এইজন্য শরীআতের ব্যবস্থা দানকারীর নির্দেশ এই যে, হঠাৎ কাহারও উপর দৃষ্টি পড়িলে এবং তাহার সৌন্দর্যের প্রতি কিছু আকর্ষণ অনুভূত হইলে দ্বিতীয়বার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

عن جرير قال سألت رسول الله صلعم عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك-

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হঠাৎ যদি কাহারও উপরে নজর পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কি করিব?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'দৃষ্টি ফিরাইয়া লও।' —আবু দাউদ

عن بريدة قال رسول الله صلعم لعلى ياعلى لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة -

হযরত বারিদাহ (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, 'হে আলী। প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাইও না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হইবে; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকাইলে তাহা ক্ষমা কবা হইবে না। —আবু দাউদ

عن النبى صلعم قال من نظر الى محاسن امراة اجنبية عن شهوة صب فى عينيه الانك يوم القيمة -

নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়মতের দিনে তাহার চক্ষে উত্তপ্ত গলিত লৌহ ঢালিয়া দেওয়া হইবে। —ফাতহুল কাদীর

কিন্তু এমন অনেক অবস্থার সমুখীন হইতে হয়, যখন অপরিচিত নারীকে দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যথাঃ কোন নারী কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছে কিংবা নারী কোন মোকদ্দমায় বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী অথবা বাদী-বিবাদী হিসাবে উপস্থিত হইয়াছে। কোন নারী অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে অথবা পানিতে ডুবিয়া যাইতেছে কিংবা কোন নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম বিপন্ন হইয়াছে- এমতাবস্থায় তাহার মুখমন্ডল দর্শন করা কেন, প্রয়োজন হইলে সতরও দেখা যাইতে পারে। তাহার শরীরও স্পর্শ করা যাইতে পারে, বরং অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে বা পানিতে নিমগ্ন হইতেছে, এমন নারীকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসা শুধু জায়েযই নহে, ফরয হইয়া পড়ে। শরীআত প্রণেতার নির্দেশ এই যে, এইরূপ অবস্থায় যথাসম্ভব নিয়্যত পবিত্র রাখিতে হইবে। কিন্তু মানবসুলভ চাহিদার কারণে যদি কণামাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না। কারণ এইরূপ দৃষ্টি

প্রয়োজনের তাকিদেই করা হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক চহিদা দমিত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

অনুরূপভাবে অপরিচিত নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে দেখা এবং ভালভাবে দেখা শুধু জায়েযই নহে, বরং হাদীসে এই সম্পর্কে নির্দেশ আছে। স্বয়ং নবী করীম (সঃ) ও এই উদ্দেশ্যে নারী দর্শন করিয়াছেন।

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امراة فقال النبى صلعم انظر اليها فانه امرى ان يودم بينكما –

মুগীরা বিন শো'বাহ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি একটি নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, 'তাহাকে দেখিয়া লও। কারণ ইহা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করিতে অধিকতর উপযোগী হইবে।' –তিরমিযী

عن سهل بن سعد ان امراة جاء ت الى رسول اللّٰهِ صلعم فقالت يارسول اللّٰه جئت لا هب لك نفسى فنظر اليها رسول اللّٰه صلعم فصعد النظر اليها –

সহর বিন সা'দ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক নারী নবী করীম (সঃ)–এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল। আপনার সহিত বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য আমি আমার নিজকে পেশ করিতেছি।' ইহাতে নবী (সঃ) তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লইলেন। –বুখারী

عن ابى هريرة قال كنت عند النبى صلعم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراة من الانصار فقال له رسول اللّٰه صلعم انظرت اليها؟ قال لا– قال فاذهب فانظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا –

হযরত আবূ হুরায়রা বলেন, 'আমি নবী (সঃ)–এর নিকটে বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, 'আমি একজন আনসার নারীকে বিবাহ করার মনস্থ করিয়াছি।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'তুমি কি তাহাকে

দেখিয়াছ?' সে ব্যক্তি বলিল 'না।' হুযুর (সঃ) বলিলেন, 'তাহাকে দেখিয়া লও। কারণ সাধারণত আনসারদের চক্ষে কিছু না কিছু দোষ থাকে।'

–মুসলিম

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلعم اذا خطب احدكم المراة قال استطاع ان ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل –

জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কোন নারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দেয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব তাহাকে দেখা উচিত যে, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, যাহা উক্ত পুরুষকে বিবাহের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। –আবু দাউদ

এই সকল ব্যতিক্রম সম্পর্কে চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নহে বরং প্রকৃতপক্ষে ফিতনা বা অনাচারের পথ বন্ধ করাই তাহার উদ্দেশ্য। যে দেখার কোন প্রয়োজন নাই, যাহা দ্বারা কোন তামাদ্দুনিক উপকারও নাই এবং যাহা দ্বারা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হইবার কারণ থাকে, এইরূপ দর্শন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সকল নির্দেশ যেমন পুরুষের জন্য করা হইয়াছে, ঠিক তেমনি নারীদের জন্যও করা হইয়াছে।

হাদীসে হযরত উম্মে সালমা হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি ও হযরত মায়মুনা হযরত নবী (সঃ)–এর নিকটে বসিয়াছিলেন। এমন সময় অন্ধ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আসিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, 'তাহার জন্য পর্দা কর।' হযরত উম্মে সাল্মা বলিলেন, 'ইনি কি অন্ধ নহেন? তিনি তো আমাদিগকে দেখিতেও পারিবেন না এবং চিনিতেও পারিবেন না।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'তোমরাও কি অন্ধ যে তাহাকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?'

কিন্তু পুরুষের চোখে নারীকে দেখা এবং নারীর চোখে পুরুষকে দেখার মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সামান্য পার্থক্য আছে। পুরুষের প্রকৃতিতে অগ্রবর্তী

হইয়া কাজ করার প্রবণতা আছে। সে কোন কিছু মনপূত হইবার পর তাহা অর্জন করিবার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়। কিন্তু নারীপ্রকৃতিতে আছে বাধা প্রদান প্রবণতা ও পলায়নপরতা। যে পর্যন্ত তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত না হইয়াছে, সে পর্যন্ত সে এতখানি নির্ভীক ও দুঃসাহসী হইতে পারে না যে, কেহ তাহার মনপূত হইবার পর তাহার দিকে ধাবিত হইবে। শরীআত প্রনেতা এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নারীর জন্য পুরুষকে দেখার ব্যাপারে ততখানি কঠোরতা ঘোষনা করেন নাই, যতখানি করিয়াছেন পুরুষের পক্ষে নারীকে দেখার ব্যাপারে। যেহেতু হাদীস গ্রন্থগুলিতে হযরত আয়েশার (রা) এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ যে, 'হযরত নবী (স) তাঁহাকে ঈদ উপলক্ষে হাবশীদের খেলা দেখাইয়াছিলেন।'[১] ইহা হইতে জানা যায় যে, নারীদের পক্ষে পুরুষকে দেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু একই সমাবেশে উভয়ের মিলিত হইয়া বসা এবং অপলক-নেত্রে দেখা নিষিদ্ধ। এমন দৃষ্টিও জায়েয নহে, যাহা দ্বারা কোন অনাচার অমংগল হইতে পারে। যে অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম হইতে পর্দা করিবার জন্য নবী (স) উম্মে সালমাকে আদেশ করিয়াছিলেন সেই সাহাবীর গৃহেই আবার ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) কে ইদ্দত পালন করিবার জন্য নবী (স) আদেশ করিয়াছিলেন। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁহার আহকামুল কুরআনে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত করিয়াছেনঃ

তিনি বলেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়েস উম্মে শরীকের গৃহে ইদ্দত পালন কারিতে চাহিয়াছিলেন। নবী (স) বলিলেনঃ এই বাড়ীতে লোক যাতায়াত করে। তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়ীতে থাক। কারণ সে একজন অন্ধ এবং সেখানে তুমি বেপর্দাও থাকিতে পার।

---

১. এই বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতিতে বিভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই ঘটনা সম্ভবত ঐ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল যখন হযরত আয়েশা (রা) নাবালিকা ছিলেন এবং যখন পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু ইবনে হব্বানে বিস্তারিত আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ইহা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন আবিসিনিয়া হইতে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আসিয়াছিল। ইতিহাস হইতে প্রমাণিত আছে যে, উক্ত প্রতিনিধি দল ৭ম হিজরীতে মদীনায় আসিয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হযরত আয়েশা (রা)এর বয়স তখন পনর-ষোল বৎসর ছিল। উপরন্তু বুখারীর বর্ণনাতে বলা হইয়াছে যে, নবী (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পর্দার নির্দেশাবলীও তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ইহা হইতে জানা যায় যে, আসল উদ্দেশ্য অনাচার-অমংগলের আশংকা লাঘব করা। যেখানে অনাচারের আশংকা অধিক ছিল, সেখানে থাকিতে নিষেধ করা হইল এবং যেখানে আশংকা কম ছিল, সেখানেই থাকিতে বলা হইল। কারণ সে নারীকে কোথাও না কোথাও অবশ্যই থাকিতে হইত এবং যেখানে থাকার কোন আবশ্যকতা ছিল না, সেখানে নারীদিগকে একজন বেগানা পুরুষের সংগে একই স্থানে সমবেত হইতে এবং সামনাসামনি তাহার সংগে দেখা-সাক্ষাত করিতে নিষেধ করা হইল।

এই সকল মর্যাদা বিচার-বুদ্ধিসম্মত ও শরীআতের মর্ম অনুধাবন করিবার যোগ্যতা যাঁহার আছে, তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, দৃষ্টি সংযমের নির্দেশাবলীর যুক্তিসংগত কারণগুলি কি এবং এই দিক দিয়া এই সকল নির্দেশের কঠোরতা বৃদ্ধি ও লাঘবের কারণ কি? শরীআত প্রণেতার প্রকৃত উদ্দেশ্য দৃষ্টির খেলা বন্ধ করা। নতুবা কাহারও চক্ষুর সংগে তাঁহার কোন শত্রুতা নাই। চক্ষুদ্বয় প্রথমে নির্দোষ দৃষ্টি দিয়া দেখে। মনের শয়তান তাহার সপক্ষে বড় বড় প্রতারণামূলক যুক্তি পেশ করে। সে বলে, 'ইহা তো সৌন্দর্য আস্বাদন এবং তাহা প্রকৃতিপ্রদত্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যান্য দৃশ্য ও ঝলক যখন তুমি দেখ, তখন তাহা হইতে এক নির্দোষ পবিত্র আনন্দ উপভোগ কর।' অতএব মানবীয় সৌন্দর্য একবার অবলোকন কর এবং তাহা হইতে এক আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ কর।' কিন্তু ভিতরে ভিতরে শয়তান আনন্দ-সম্ভোগ-স্বাদ বাড়াইয়া চলে। অবশেষে সৌন্দর্য স্বাদ মিলনাকাঙ্ক্ষা উন্নীত হয়। জগতে এই পর্যন্ত যত পাপাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, এই চক্ষুর দৃষ্টিই যে তাহার প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও আছে কি? কোন্ ব্যক্তি এ দাবি করিতে পারে যে, এতটি পুষ্প দর্শন করিয়া মনের যে অবস্থা হয়, কোন সুন্দর যুবক আর যুবতী দর্শনে ঠিক সেই অবস্থা হয়? যদি উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং একটির তুলনায় অপর অবস্থাটি যৌন-আবেদনমূলক হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যায় যে, একটি সৌন্দর্য আস্বাদনে যে স্বাধীনতা থাকিবে, অপরটির বেলায়ও তাহাই থাকিবে? শরীআত প্রণেতা কাহারও সৌন্দর্য-স্বাদ বন্ধ করিতে চাহেন না। তিনি তো বলেনঃ তুমি তোমার ইচ্ছামত জোড়া নির্বাচন করিয়া লও এবং উহাকেই কেন্দ্র করিয়া তোমার মধ্যে সৌন্দর্য-স্বাদের

যতখানি বাসনা আছে তাহা মিটাইয়া লও। এই কেন্দ্র হইতে সরিয়া যদি অপরের রূপ- যৌবন দেখিয়া বেড়াও, তাহা হইলে অনাচার-অশ্লীলতায় লিপ্ত হইবে। আত্মসংযম ও অন্যান্য বাধা নিষেধের কারণে কার্যত লাম্পট্যে লিপ্ত না হইলেও, চিন্তারাজ্যের লাম্পট্য হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার অনেক শক্তি অপচয়িত হইবে চক্ষুর উত্তেজনায়। অনেক অকৃত পাপাকাঙক্ষায় তোমার মন কলুষিত হইবে। পুন পুন প্রেম-প্রতারণায় জর্জরিত হইবে এবং বহু রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়া কাটাইবে। অনেক সুন্দর নাগ-নাগিনী তোমাকে দংশন করিবে। হৃৎপিন্ডের কম্পন ও রক্তের উত্তেজনায় তোমার জীবনী শক্তি ক্ষয়িত হইবে-এটা কি কম ক্ষতি? এইগুলি আপন দর্শনকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইবারই পরিণাম ফল। অতএব আপন চক্ষুকে আয়ত্তে রাখ। বিনা কারণে দেখা এবং এমন দেখা, যাহার ফলে অনাচার-অমংগল সংঘটিত হইতে পারে-তাহা হইতে বিরত থাকা উচিত। যদি দেখার কোন প্রকৃত আবশ্যকতা এবং তাহার দ্বারা যদি কোন তামাদ্দুনিক মংগল হয়, তাহা হইলে তাহা ন্যায়সংগত হইবে।

সৌন্দর্য প্রকাশে বাধা-নিষেধ ও তাহার সীমারেখা

দৃষ্টি-সংযমের আদেশাবলী নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আবার কতক আদেশ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট। তাহার মধ্যে প্রথম আদেশ এই যে, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করা চলিবে না।

এই আদেশের উদ্দেশ্য ও বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা করিবার পূর্বে একবার ঐ সকল নির্দেশ স্মরণ করা দরকার, যাহা ইতিপূর্বে পোশাক ও সতরের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত নারীর সমগ্র দেহ (সতর) যাহা পিতা, চাচা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিকটেও উমুক্ত জায়েয নহে। এমন কি কোন নারীর সতর অপর নারীর সম্মুখে উমুক্ত করাও মাকরূহ।[১] এই সত্যকে সম্মুখে রাখিবার পর সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা আলোচনা করা দরকার।

---

১. কোন নারীর নাভী হইতে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংগগুলি অন্য নারীর জন্য দেখা ঠিক ঐরূপ হারাম, যেমন কোন পুরুষের এই অংগগুলি অন্য পুরুষের জন্য দেখা হারাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অংগগুলি দেখা মাকরূহ, হারাম নহে।

১. নারীকে তাহার সৌন্দর্য স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, সৎ পুত্র, ভ্রাতা, ভাইপো ও ভাগিনেয়র সম্মুখে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

২. তাহাকে আপন গোলামের সম্মুখে (অন্য কাহারও গোলামের সম্মুখে নহে) সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে।

৩. সে এমন লোকের সম্মুখেও সৌন্দর্য শোভা সহকারে আসিতে পারে, যে তাহার অনুগত ও অধীন এবং নারীদের প্রতি যাহার কোন আগ্রহ বা আকাঙক্ষা নাই।[১]

---

১. এই নির্দেশের তফসীর করিতে গিয়া হাফেয ইবনে কাসীর বলেন ঃ

او التابعين غير اولى الاربة من الرجال -

ইহা দ্বারা ঐ সকল মজুর, চাকর ও অনুগত লোক বুঝায় যাহারা চালাকচতুর নহে, অত্যন্ত সরলচিত্ত এবং নারীদের প্রতি যাহাদের কোন যৌনবাসনা নাই। দুইটি অবস্থায় যৌনবাসনা না থাকিতে পারে। প্রথমত, তাহাদের মধ্যে মোটেই কোন যৌনবাসনা নাইঃ যথাঃ বৃদ্ধ, অবোধ অথবা জন্মগত নপুংসক। দ্বিতীয়ত, পুরুষোচিত শক্তি এবং নারীর প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহাকাঙক্ষা আছে বটে, কিন্তু যে বাড়ীর অধীনে সে একজন অনুগত চাকর, অথবা যে বাড়ীতে সে একজন ভিখারী হিসাবে সাহায্য গ্রহন করিতে যায়, সে বাড়ীর নারীদের প্রতি সে কোন যৌনবাসনা পোষণ করিতে পারে না। কুরআনের উপরিউক্ত শব্দগুলি দ্বারা এই দুই শ্রেণীর লোককেই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরনের যে সকল পুরুষের সামনে নারীদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই দুইটি গুণ থাকিতে হইবে। প্রথমত, যে বাড়ীর মেয়েরা তাহাদের সম্মুখে আসে, তাহাদিগকে সে বাড়ীর অধীন ভৃত্য হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন প্রকার যৌনবাসনা রাখিবার চিন্তাও তাহারা করিবে না। অতপর প্রতিটি বাড়ীর মালিকের এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার যে, যে সকল পুরুষ ভৃত্যকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, প্রথমে তাহাদের প্রতি যে ধারণা করা হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কিনা। অনুমতি দেওয়ার পর যদি তাহাদের প্রতি কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে উহাদের বাড়ীর ভিতরে আসা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই ব্যাপারে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঐ নপুংসক ব্যক্তি, যাহাকে হযরত নবী (স) বাড়ীর মধ্যে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

ঘটনাটি এই যে, মদীনাতে একজন নপুংসক ছিল। সে নবীর বিবিগণের সামনে যাতায়াত করিত। একদা সে হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর নিকটে বসিয়া তাঁহার ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর সহিত আলাপ করিতেছিল। এমন সময় নবী (স) তথায় আগমন করিলেন এবং বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় উক্ত নপুংসককে হযরত আবদুল্লাহর কাছে এই কথাগুলি বলিতে শুনিলেনঃ

আগামী কল্য যদি তায়েফ বিজিত হয়, তাহা হইলে বাদিয়া বিনতে গায়লান সাকফীকে তোমাকে দেখাইব। তাহার অবস্থা এই যে, যখন সে সম্মুখ দিক হইতে আসে, তখন তাহার পেটে চারিটি ভাঁজ দেখা যায় এবং পশ্চাৎ ফিরিলে আটটি ভাঁজ।

৪. যে সকল বালকের মধ্যে এখনও যৌন অনুভূতির সঞ্চার হয় নাই, তাহাদের সম্মুখেও সে সৌন্দর্য প্রদর্শন করিতে পারে। কুরআন পাকে আছে ঃ

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ –

এমন বালক বা নারীদের গোপন কথা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয় নাই।

৫. সকল সময় মেলামেশা করা হয় এইরূপ মেয়েদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য-শোভা প্রদর্শন করা জায়েয আছে। কুরআন পাকে 'সাধারণ নারিগণ' শব্দের পরিবর্তে 'আপন নারিগণ' ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা 'সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ' অথবা 'আপন মহিলা আত্মীয়-স্বজন' অথবা 'আপন শ্রেণীর মহিলাগণকেই' বুঝান হইয়াছে। অজ্ঞ মুর্খ নারী, এমন নারী যাহাদের চালচলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাহাদের চরিত্রে কলংক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে, এই ধরনের সকল নারীর সম্মুখে আলোচ্য নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনের অনুমতি নাই। কেননা ইহারাও অনাচার-অমংগলের কারণ হইতে পারে। শামদেশে মুসলমানগণ যাওয়ার পর মুসলমান মহিলাগণ ইহুদী-খৃস্টান মহিলাদের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিলে হযরত ওমর (রা) শামের শাসনকর্তা হযরত আবু ওবায়দাহ বিন জাবরাহ (রা) কে লিখিয়া জানাইলেন, যেন মুসলমান মহিলাগণকে আহলে-কিতাব মহিলাদের সহিত হাম্মামে (স্নানাগার) প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। –তাফসীরে ইবনে জারীর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মুসলমান মহিলাগণ কাফির ও যিম্মী নারীদের সামনে ততটুকুই প্রকাশ করিতে পারে, যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করিতে পারে। –তাফসীর কবীর

অতপর সে অশ্লীল ভাষায় তাহার গোপনীয় অংগের প্রশংসা করিল। নবী (স) ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেনঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুমি তো তাহাকে খুব নিবিড়ভাবে দেখিয়াছ। অতপর তিনি তাঁহার সহধর্মিনিগণকে বলিলেনঃ আমি দেখিতেছি যে, এই ব্যক্তি নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অতএব সে যেন তোমাদের নিকটে না আসিতে পারে।

নবী (সঃ) ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাহাকে মদীনা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। কারণ সে বিনতে গায়লানের গোপনীয় অংগের যে চিত্র অংকন করিল তাহাতে নবী (স) মনে করিলেন যে, তাহার মেয়েলী ধরন ও হাবভাব দেখিয়া মেয়েরা তাহার সংগে এমনভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেলামেশা করে, যেমন করে আপন নারী জাতির সংগে। এই সুযোগে ঐ ব্যক্তি মেয়েদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইয়া পুরুষের নিকটে তাহাদের প্রশংসা করে। ইহার ফলে বিরাট অনিষ্ট-অনাচার হইতে পারে।

কোন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এ সবের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং যে সকল নারীর স্বভাব-চরিত্র ও তাহযীব-তমদ্দুন জানা ছিল না, অথবা জানা থাকিলে তাহা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক ছিল-এই ধরনের নারীর প্রভাব হইতে মুসলমান নারীদিগকে রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এখন অমুসলমান নারীদের মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীলা, তাহারা কুরআনের (نسائهن) 'আপন নারীগণের' মধ্যেই শামিল।

এই সকল সীমারেখা সম্পর্কে চিন্তা করিলে দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায় ঃ

১. যে সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি এই সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে তাহা 'সতরে-আওরাতের আওতাবহির্ভূত অংগাদির অর্থাৎ অলংকারাদি পরিধান করা, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হওয়া, সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, কেশ বিন্যাস করা এবং অন্যান্য বেশভূষা, যাহা নারিগণ নারীসুলভ চাহিদা অনুযায়ী আপন গৃহে পরিধান করিতে অভ্যস্ত হয়।

২. এই ধরনের বেশভূষা ঐ সকল পুরুষের সম্মুখে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যাহাদিগকে নারীদের জন্য চিরতরে হারাম করা হইয়াছে অথবা ঐ সকল পুরুষের সম্মুখে, যাহাদের মধ্যে কোন যৌন-বাসনা নাই অথবা ঐ সকল লোকের সম্মুখে যাহারা কোন অনাচার-অমংগলের কারণ হইবে না। নারীদের বেলায় 'আপন নারিগণ' শর্ত আরোপ করা হইয়াছে, অধীনদের জন্য 'যৌনবাসনাহীন' এবং বালকদের জন্য 'নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত' শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা গেল যে, শরীআত-প্রণেতার উদ্দেশ্য হইতেছে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন এমন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, যাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য ও বেশভূষার দ্বারা কোন প্রকার অবৈধ উত্তেজনা সৃষ্টি এবং যৌন উচ্ছৃংখলতার আশংকা হইতে না পারে।

এই গণ্ডির বাহিরে যত পুরুষ আছে তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহাদের সম্মুখে সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রদর্শন করা চলিবে না, উপরন্তু পথ চলিবার সময় এমনভাবে পদক্ষেপ করা চলিবে না, যাহাতে গোপন সৌন্দর্য ও বেশভূষা পদধ্বনির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফলে পুরুষের দৃষ্টি উক্ত নারীর প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই আদেশ দ্বারা যে সৌন্দর্য পরপুরুষ হইতে গোপন করিতে বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক উহাই, যাহা উপরে উল্লিখিত

সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট। মহিলারা যদি বেশভূষা করিয়া এমন লোকের সম্মুখে আসে, যাহারা যৌন-লালসা রাখে এবং মুহ্‌রেম না হওয়ার কারণে যাহাদের মনের যৌন-লালসা পবিত্র-নিষ্পাপ ভাবধারায় পরিবর্তিত হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইহার প্রতিক্রিয়া মানবিক চাহিদা অনুসারেই হইবে। ইহা কেহই বলে না যে, এই রূপ সৌন্দর্য প্রকাশের ফলে প্রত্যেক নারী চরিত্রহীনা হইবে এবং প্রত্যেক পুরুষ কার্যত পাপাচারী হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না যে, সুন্দর বেশভূষা সহকারে নারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরা এবং জনসমাবেশে অংশ গ্রহণ করার ফলে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গোপন, মানসিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হইতেছে। আজকাল ইউরোপ-আমেরিকার নারী সমাজ নিজেদের ও স্বামীর উপার্জিত অধিকাংশ বেশভূষায় ব্যয় করিতেছে। তাহাদের এই ব্যয়ভার দৈনন্দিন এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে, ইহা বহন করিবার আর্থিক সংগতি তাহাদের নাই।[১] যে সকল যৌন-লোলুপ দৃষ্টি বাজারে, অফিসাদিতে এবং জনসমাবেশে যোগদানকারী নারীদিগকে স্বাগতম জানায়, তাহাই কি এই উন্মাদনা সৃষ্টি করে নাই? পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখুন, নারীদের মধ্যে সাজ-সজ্জার এত বড় প্রবল আকাঙ্খা সৃষ্টি হওয়ার এবং তাহা দ্রুতবেগে বর্ধিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ ইহাই কি নহে যে, তাহারা পুরুষের প্রশংসা লাভ করিতে এবং তাহাদের চক্ষে মানানসই সাজিতে ইচ্ছা করে?[২] ইহা কিসের জন্য? ইহা কি একেবারে

---

১. সম্প্রতি কেমিক্যাল দ্রব্য নির্মাতাদের একটি প্রদর্শনী হইল। ইহাতে বিশেষজ্ঞদের বর্ণনায় জানা গেল যে, ইংলণ্ডের নারিগণ বৎসরে দুই কোটি পাউন্ড এবং আমেরিকার নারীমহল বৎসরে সাড়ে বারকোটি পাউন্ড ব্যয় করে। প্রায় শতকরা নব্বইজন নারী কোন না-কোন প্রকারের 'মেক-আপ' করতে অভিলাষী।

[বি. দ্র.-ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা-যেমন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। বর্তমানে নারীদের বিলাসিতা উহা হইতে যে বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। -অনুবাদক]

২. সুন্দরী সাজিবার উন্মাদনা মহিলাদের মধ্যে এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে ইহার জন্য তাহারা জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেছে। তাহাদের চরম প্রচেষ্টা এই হয় যে, তাহারা পাতলা ছিপছিপে হইয়া থাকিবে এবং শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক পাউন্ড গোশ্‌ত যেন না থাকে। সৌন্দর্যের জন্য বিশেষজ্ঞগণ পায়ের গোছা, উরু ও বক্ষের যে মাপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেকটি বালিকা নিজের দেহকে সেই পরিমাপের মধ্যে রাখিতে চায় যেন অপরের চোখে আনন্দদায়িনী সাজা ব্যতীত এই সকল হতভাগীদের জীবনের দ্বিতীয় কোন লক্ষ্যই নাই। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য হতভাগীরা অনাহারে কাটায়, শরীর পুষ্টিকারী খাদ্য দ্রব্যাদি হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে, লেবুর রস, তিক্ত কফি এবং এই ধরনের মৃদু পানাহারে দিন যাপন করে। চিকিৎসকের বিনা

নিষ্পাপ আকাঙ্খা? ইহার অভ্যন্তরে কি যৌন-বাসনা লুক্কায়িত নাই, যাহা স্বীয় স্বাভাবিক গন্ডির বাহিরে বিস্তার লাভ করিতে চায় এবং যাহার দাবি পূরণ করিবার জন্য অপর প্রান্তেও অনুরূপ বাসনা রহিয়াছে? যদি আপনি ইহা অস্বীকার করেন তাহা হইলে হয়ত আগামীকাল আপনি এই দাবি করিতে দ্বিধা করিবেন না যে, আগ্নেয়গিরিতে যে ধূম্ররাশি দেখা যাইতেছে, তাহার অভ্যন্তর হইতে কোন লাভা বহির্ভূত হইতে উন্মুখ নহে।

আপনি আপনার কাজ করার স্বাধীনতা রাখেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা করুন। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিবেন না। এ সত্য এখন আর গোপনও নাই। দিবালোকের ন্যায় ইহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ফলাফল আপনি জ্ঞাতসারে গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যে স্থান হইতে উহার প্রকাশ সূচিত হয়, ইসলাম ঐ স্থানেই উহাকে বন্ধ করিয়া দিতে চায়। কারণ তাহার দৃষ্টি সৌন্দর্য প্রকাশের বাহ্যত আপাত নিষ্পাপ সূচনার উপরে নিবদ্ধ নহে, বরং যে

পরামর্শে, বরং পরামর্শের বিপরীত, এমন সব ঔষধাদি ব্যবহার করে, যাহা তাহাদিগকে ক্ষীণ ও দুর্বল করিয়া ফেলে। এই উন্মাদনার বশে অনেক নারী জীবন বিসর্জন দিয়াছে এবং দিতেছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বুদাপেস্টের বিখ্যাত অভিনেত্রী 'জুসিলাবাস' হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মারা যায়। পরে তদন্তে জানা গেল যে, বিগত কয়েক বৎসর যাবত সে অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাটাইতেছিল এবং শরীরের ওজন কমাইবার জন্য পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার করিতেছিল। অতপর হঠাৎ একদিন তাহার জীবনীশক্তি জবাব দিয়া ফেলিল। উহার পর শুধু বুদাপেস্টেই পর পর আরও তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়। হাঙ্গেরীর অতি প্রসিদ্ধ সুন্দরী 'মাগদা বরসিলি' হাল্কা সাজিবার জন্য জীবন দেয়। অতপর গায়িকা 'লুইসা জাবু' এক রাত্রিতে মঞ্চের উপরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করে। তাহার দুঃখ এই ছিল যে, তাহার দেহ আধুনকি যুগের সৌন্দর্যের মাপকাঠি অনুযায়ী ছিল না। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য বেচারী কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং দুই মাসে ষাট পাউন্ড শরীরের ওজন কমাইল। ফল এই হইল যে, হৃৎপিন্ড অতিমাত্রায় দুর্বল হইয়া পড়িল এবং একদিন সৌন্দর্যের গ্রাহকদের জন্য জীবন বিসর্জন করিল।

ইহার পর 'ইমুলা' নাম্মী একজন অভিনেত্রীর পালা আসিল। সে কৃত্রিম উপায়ে তাহার শরীর এত হাল্কা করিয়াছিল যে, অবশেষে এক স্থায়ী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। অতপর রংগমঞ্চের পরিবর্তে তাহাকে পাগলা গারদে যাইতে হয়। এই ধরনের খ্যাতনাম্নী লোকদের ঘটনা তো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কে জানে এই সৌন্দর্য এবং প্রেমিক সাজিবার উম্মাদনা, যাহা গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিন তাহা কত স্বাস্থ্য এবং কত জীবন ধ্বংস করিতেছে? কেহ কি বলিবে, ইহা নারী স্বাধীনতা, না নারীর দাসত্ব? এই তথাকথিত স্বাধীনতা তো তাহাদের উপর পুরুষের কামপ্রবৃত্তির প্রভুত্ব অধিকতর চাপাইয়া দিয়াছে। উহা তাহাদিগকে এমন দাস বানাইয়া দিয়াছে যে, পানাহার ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারেও স্বাধীনতা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। এই হতভাগিনীদের জীবন-মরণ এখন শুধু পুরুষদের জন্যই রহিয়া গিয়োছে।

ভয়ানক পরিণাম কিয়ামতের অন্ধকারের ন্যায় সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে।

হাদীসঃ

مثل الرافلة فى الزينة فى غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيمة لا نور لها-

পর পুরুষের সম্মুখে সাজ-সজ্জা সহকারে বিচরণকারী নারী আলোক-বিহীন কিয়ামতের অন্ধকারের ন্যায়। – তিরমিযী

কুরআনে যে অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেখানে একটি ব্যতিক্রমও আছে। যথাঃ الا ما ظهر منها। ইহার অর্থ এই যে, যে সৌন্দর্য বা বেশভূষা আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতে কোন দোষ নাই। লোকে এই ব্যতিক্রম হইতে কিছু সুবিধা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বিপদ এই যে, এই শব্দগুলি হইতে বেশী সুবিধা লাভের কোন অবকাশ নাই। শরীআত প্রণেতা এই কথা বলেন যে, স্বেচ্ছায় অপরের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না। কিন্তু যে বেশভূষা আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে অথবা প্রকাশ হইতে বাধ্য, তাহার জন্য কেহ দায়ী হইবে না- ইহার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। তোমার নিয়্যত যেন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশের না হয়। তোমার মধ্যে এই প্রেরণা, এই ইচ্ছা কিছুতেই হওয়া উচিত নহে যে, নিজের সাজ-সজ্জা অপরকে দেখাইবে কিংবা কিছু না হইলেও অন্তত অলংকারাদির লুপ্ত ঝংকার শুনাইয়া তোমার প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তোমাকে তো আপন সৌন্দর্য-শোভা গোপন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার পর যদি কোন কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে দায়ী করিবেন না। তুমি যে বস্ত্র দ্বারা তোমার সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখিবে, তাহা তো প্রকাশ পাইবেই। তোমার দেহের গঠন ও উচ্চতা, শারীরিক সৌষ্ঠব ও আকার-আকৃতি তো উহাতে ধরা যাইবে। কাজ-কর্মের জন্য আবশ্যক মত তোমার হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডলের কিয়দংশ তো উন্মুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ হইলে কোন দোষ নাই। তোমার ইচ্ছা উহা প্রকাশ করা নহে; বরং তুমি তাহা করিতে বাধ্য। ইহাতে যদি কোন অসৎ ব্যক্তি আনন্দস্বাদ উপভোগ করে তো করুক। সে তাহার অসৎ অভিলাষের শাস্তি ভোগ করিবে। তমদ্দুন ও

নৈতিকতা যতখানি দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করিয়াছিল, তাহা তুমি সাধ্যানুযায়ী পালন করিয়াছ।

উপরিউক্ত আয়াতের ইহাই প্রকৃত মর্ম। তাফসীরকারগণের মধ্যে এই আয়াতের মর্ম লইয়া যত প্রকার মতভেদ আছে, তাহা লইয়া চিন্তাগবেষণা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, যাবতীয় মতান্তর সত্ত্বেও তাঁহাদের উক্তির মর্ম উহাই দাঁড়াইবে, যাহা উপরে বর্ণিত হইল।

ইবনে মসউদ, ইব্রাহীম নখ্য়ী ও হাসান বসরীর মতে প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ ঐ সকল বস্ত্র, যেইগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখা যায়, যথাঃ বোরকা, চাদর ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, ইবনে ওমর, আনাস, জাহ্হাক, সাঈদ বিন জুবাইর; আওযায়ী ও হানাফী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে ইহার অর্থ, মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় এবং ইহাতে ব্যাবহৃত সৌন্দর্য-উপাদানসমূহ-যথাঃ হাতের মেহেদী, আংটি, চোখের সুরমা প্রভৃতি।

সাঈদ বিন আল-মুসায়্যেরের মতে ব্যতিক্রম শুধু মুখমন্ডল এবং অন্য এক বর্ণনামতে হাসান বসরীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) মুখমন্ডল ঢাকিয়া রাখার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অর্থ হস্তদ্বয়, হাতের চুড়ি, আংটি, কংকন ইত্যাদি।

মিস্ওয়ার বিন মাখরামা ও কাতাদাহ অলংকারাদিসহ হাত খুলিবার অনুমতি দেন এবং তাঁহার উক্তিতে মনে হয় যে, তিনি সমগ্র মুখমন্ডলের পরিবর্তে শুধু চক্ষুদ্বয় খুলিয়া রাখা জায়েয রাখেন।[১]

এই সকল মতভেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখুন। এই সকল তফসীরকার الا ماظهر منها হইতে ইহাই বুঝিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা এমন সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেন, যাহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে অথবা যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হস্তের প্রদর্শনী করা অথবা কাহারও দৃষ্টির বিষয়বস্তু করা ইহাদের কাহারও উদ্দেশ্য নহে।

---

১. ইবনে জারীর ও আহকামুল কুরআন।

প্রত্যেকে আপন আপন বোধশক্তি অনুযায়ী নারীদের প্রয়োজনকে সম্মুখে রাখিয়া ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে কোন্ অংগ বাধ্যতামূলকভাবে উন্মুক্ত করা যায় কিংবা স্বভাবতই উন্মুক্ত হয়। আমরা বলি যে, الاماظهرمنها -কে উহার কোন একটিতেও সীমাবদ্ধ রাখিবেন না। যে মু'মিন নারী আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশাবলীর অনুগত থাকিতে চায় এবং অনাচার-অমংগলে লিপ্ত হওয়া যাহার ইচ্ছা নহে, সে স্বয়ং নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে, মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করিবে, কি করিবে না। করিতে চাহিলে কোন্ সময়ে করিবে, কি পরিমাণে উন্মুক্ত করিবে এবং কি পরিমাণে আবৃত রাখিবে। এই ব্যাপারে শরীআত প্রণেতা কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন নাই। অবস্থার বিভিন্নতা এবং প্রয়োজন দেখিয়া কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নির্ধারণ করিতে হইবে, ইহাও বাস্তব বিচার-বুদ্ধির চাহিদা নহে। যে নারী আপন প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে এবং কাজকর্ম করিতে বাধ্য, তাহাকে কখনও হাত এবং কখনও মুখমন্ডল খোলার প্রয়োজন হইবে। এইরূপ নারীর জন্য প্রয়োজন অনুসারে অনুমতি আছে। কিন্তু যে নারীর অবস্থা এইরূপ নহে, তাহার বিনা কারণে স্বেচ্ছায় হাত-মুখ অনাবৃত করা দুরস্ত নহে।

অতএব শরীআত প্রণেতার উদ্দেশ্য এই যে, যদি নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোন অংগ-অংশ অনাবৃত করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাপ হইবে। অনিচ্ছায় স্বতই কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহাতে কোন পাপ হইবে না। প্রকৃত প্রয়োজন যদি অনাবৃত করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তাহা জায়েয হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, অবস্থার বিভিন্নতা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শুধু মুখমণ্ডল সম্পর্কে কি নির্দেশ রহিয়াছে? শরীআত প্রণেতা উহাকে অনাবৃত রাখা পসন্দ করেন, না অপসন্দ করেন? শুধু প্রয়োজনের সময় উহাকে অনাবৃত করা যায় না, উহা অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিবার বস্তুই নহে?

সূরায়ে আহ্যাবের আয়াতসমূহে এই প্রশ্নগুলির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

মুখমন্ডল সম্পর্কে নির্দেশ

উপরে সূরায়ে আহ্যাবের যে আয়াতসমূহের উল্লেখ করা হইল তাহা এইঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَزوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَّ
مِن جَلاَ بِيبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدنٰى اَن يُّعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ -

হে নবী! আপন বিবিগণ, কন্যাগণ ও মুসলমান নারীগণকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন আপন চাদর দ্বারা নিজের ঘোমটা টানিয়া দেয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা আশা করা যায় যে, তাহাদিগকে চিনিতে পারা যাইবে এবং অতপর তাহাদিগকে ত্যক্তবিরক্ত করা যাইবে না। –সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৯

বিশেষ করিয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিবার জন্য আয়াত নাযিল হইয়াছে جلباب শব্দের বহুবচন جلابيب ইহার অর্থ চাদর। ادناء শব্দের অর্থ লটকান। يدنين عليهن من جلابيبهن এর শাব্দিক অর্থ নিজের উপরে চাদরে খানিক অংশ যেন লটকাইয়া দেয়। ঘোমটা দেওয়ার অর্থও ইহাই। কিন্তু এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সধারণভাবে পরিচিত 'ঘোমটা' নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য মুখমণ্ডলকে আবৃতকরণ। তাহা ঘোমটার দ্বারা হউক, পর্দা অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হউক। ইহার উপকারিতা এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন মুসলমান নারী এইভাবে আবৃত অবস্থায় গৃহের বাহির হইবে, তখন লোকে বুঝিতে পারবে যে, তাহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা–নির্লজ্জ ও শ্লীলতাবর্জিত নহে। এই কারণে কেহ তাহার শ্লীলতার প্রতিবন্ধক হইবে না।

পবিত্র কুরআনের সকল তাফসীরকার এই আয়াতের এই মর্মই ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা) ইহার তফসীরে বলেনঃ

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমান নারীদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা যখন কোন প্রয়োজনে গৃহের বাহিরে যাইবে, তখন যেন তাহারা মাথার উপর হইতে চাদরের অঞ্চল ঝুলাইয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া দেয়
–তাফসীরে ইবনে জারীর

ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন হযরত ওবায়দা বিন–সুফিয়ান বিন আল্ হারিস আল–হাজরামীর নিকট জানিতে চাহিলেন, এই আদেশের কি প্রকারে আমল করা যায়। ইহার উত্তরে তিনি স্বয়ং চাদর উড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন। কপাল, নাক ও একটি চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং শুধু একটি চক্ষু খুলিয়া রাখিলেন।
–তাফসীরে ইবনে জারীর

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

হে নবী! আপনার বিবিগণ, কন্যাগণ ও মুসলমান নারিগণকে বলিয়া দিন যে, যখন তাহারা কোন প্রয়োজনে আপন গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে,

তখন যেন তাহারা ক্রীতদাসীদের পোষাক পরিধান না করে, যাহাতে মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে, বরং তাহারা যেন নিজের উপরে চাদরের ঘোমটা টানিয়া দেয় যাহাতে ফাসিক লোকেরা তাহাদের শ্লীলতার অন্তরায় না হয় এবং জানিতে পারে ইহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা।

–তাফসীরে ইবনে জারীর

আল্লামা আবুবকর জাস্‌সাস্‌ বলেনঃ

এই আয়াতের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, যুবতী নারীকে পর–পুরুষ হইতে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা হইয়াছে এবং গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় পর্দা ও সম্ভ্রমশীলতা প্রদর্শন করা উচিত, যাহাতে অসৎ অভিপ্রায় পোষণকারী তাহার প্রতি প্রলুব্ধ হইতে না পারে।

–আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খন্ড

আল্লামা নায়শাপুরী তাঁহার তাফসীর 'গারায়েবুল কুরআন'–এ বলেনঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েরা জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় কামিজ ও দোপাট্টা পরিধান করিয়া বাহিরে যাইত। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পোশাকও নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের হইতে পৃথক ছিল না। অতপর আদেশ হইল যে, তাহারা যেন চাদর উড়াইয়া তদ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলে, যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, তাহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা, শ্লীলতাবাজিতা নহে।

ইমাম রাজী বলেনঃ

জাহিলিয়াতের যুগে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ও ক্রীতদাসী, সকলেই বেপর্দা ঘুরিয়া বেড়াইত এবং অসৎ লোক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। আল্লাহ্‌ তায়ালা সম্ভ্রান্ত নারীদের প্রতি আদেশ করিলেন যেন তাহারা চাদর দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করে। ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ইহার দুই প্রকার মর্ম হইতে পারে। প্রথমত, এই পোশাক হইতে চিনিতে পারা যাইবে যে, ইহারা সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং তাহাদিগকে অনুসরণ করা হইবে না। দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা চরিত্রহীনা নহে। কারণ যে নারী তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখে

[অথচ মুখমণ্ডল 'আওরতের'[১] মধ্যে গণ্য নহে যে তাহা আবৃত রাখা ফরয হইবে], তাহার নিকট কেহ এ আশা পোষণ করিতে পারে না যে, সে 'আওরত' অনাবৃত করিতে রাজী হইবে। অতএব এই পোশাক ইহাই প্রমাণ করিবে যে, সে একজন পর্দানশীন নারী এবং তাহার দ্বারা কোন অসৎ কাজের আশা করা বৃথা হইবে। –তাফসীরে কবীর

কাযী বায়যাবী বলেনঃ

يدنين عليهن من جلابيبهن ইহার অর্থ এই যে, যখন তাহারা আপন প্রয়োজনে বাহিরে যাইবে তখন চাদর দ্বারা শরীর ও মুখমণ্ডল ঢাকিয়া লইবে। এখানে من শব্দটি تعيض -এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ চাদরের একাংশ দিয়া মুখমন্ডল আবৃত করিতে হইবে এবং একাংশ শরীরের উপর জড়াইতে হইবে। ذالك ادنى ان يعرفن ইহা দ্বারা সম্ভ্রান্ত নারী, ক্রীতদাসী এবং গয়িকাদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। فلا يؤذين অর্থাৎ সন্দেহভাজন লোক তাহাদের শ্লীলতাহানীর দুঃসাহস করিবে না। –তাফসীরে বায়যাবী

এই সকল উক্তি হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) –এর পবিত্র যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি যুগে উক্ত আয়াতের একই মর্ম করা হইয়াছে এবং সে মর্ম উহাই, যাহা আমরা উহার শব্দগুলি হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার পর হাদীসগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতে নবী করীম (স)–এর যুগে সাধারণভাবে মুসলমান নারিগণ মুখমণ্ডলের উপর আবরণ দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উন্মুক্ত মুখমন্ডল সহকারে চলাফেরার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আবু দাউদ, তিরমিযা, মুয়াত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থগুলিতে আছে যে, নবী (স) ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাদের মুখে আবরণ ও হাতে দস্তানা পরিধান করা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সেই পবিত্র যুগেই মুখমণ্ডল আবৃত করিবার জন্য আবরণ ও হস্তদ্বয় ঢাকিবার জন্য দস্তানা ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছিল। শুধু ইহ্‌রামের

---

১. শরীরের যে অংশ স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্য সকলের নিকটে আবৃত রাখার নির্দেশ আছে তাহাকে কুরআনের পরিভাষায় 'আওরত' বলে। পুরুষের নাভী 'হইতে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকেও এই অর্থে আওরত' বলা হয়।

অবস্থায় উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু হজ্জের সময় নারীর মুখমণ্ডল জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহ্‌রামের দীনবেশে মুখের আবরণ যেন নারীদের পোশাকের কোন অংশবিশেষ না হইতে পারে, যাহা অন্য সময়ে সাধারণভাবে হইয়া থাকে। অন্যান্য হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ইহরাম অবস্থায়ও নবী-পত্নীগণ ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমান মহিলা আবরণহীন মুখমণ্ডল অপরিচিত লোকের দৃষ্টিপথ হইতে লুকাইয়া রাখিতেন।

عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلعم محرمات فاذا حازوا بنا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'যানবাহন আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল এবং আমরা নবী (স)-এর সংগে ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকিতাম। যখন লোক আমাদের সম্মুখে আসিত, তখন আমাদের চাদর মাথার উপর হইতে মুখের উপর টানিয়া দিতাম। তাহারা চলিয়া গেলে আবার মুখ খুলিয়া দিতাম।'

-আবু দাউদ

عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابوبكر الصديق فلا تنكره علينا-

ফাতিমা বিনতে মানযার বলেন, 'আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিতাম। আমাদের সংগে হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) ছিলেন। তিনি আমাদিগকে নিষেধ করেন নাই।'

-ইমাম মালিকঃ মুয়াত্তা

ফত্‌হুল বারী, কিতাবুল হজ্জে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটা বর্ণনা আছেঃ

تستدل المراة جلبابها من فوق رأسها على وجهها -

নারিগণ ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজেদের চাদর যেন মস্তক হইতে মুখের উপর ঝুলাইয়া দেয়।

আবরণ

কুরআন পাকের শব্দগুলি ও জনসাধারণ্যে সেগুলির স্বীকৃতি, সর্বসম্মত তাফসীর ও নবী করীম (সঃ)-এর যুগে তাহার বাস্তবায়নের প্রতি যে ব্যক্তি লক্ষ্য করিবে, তাহার পক্ষে এই সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব হইবে না যে, ইসলামী শরীয়তে অপরিচিতের সামনে নারীদের মুখমন্ডল ঢাকিয়া রখার নির্দেশ রহিয়াছে এবং নবী (সঃ)-এর যুগেই এই আদেশ প্রতিপালিত হইতেছিল। 'নিকাব' বা আবরণ শব্দের দিক দিয়া না হইলেও অর্থ ও মর্মের দিক দিয়া পবিত্র কুরআনের প্রস্তাবিত বিষয়। যে পবিত্র সত্তার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছিল, তাঁহার চোখের সামনে মুসলমান নারিগণ ইহাকে বহির্বাটিস্থ পোশাকের অংগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেকালেও ইহার নাম ছিল 'নিকাব' অর্থাৎ পর্দা বা আবরণ।

পরিতাপের বিষয়, ইহা সেই 'নিকাব' (veil), ইউরোপ যাহাকে অত্যন্ত অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত বস্তু মনে করে। নিছক ইহার ধারণাও পাশ্চাত্য বিবেকের নিকটে অসহনীয়। তাহারা ইহাকে অত্যাচার, সংকীর্ণতা ও বর্বরতার পরিচায়ক মনে করে। ইহা এমন একটি বিষয় যে, যখন প্রাচ্যের জাতিগুলির অজ্ঞতা ও অনুন্নতির উল্লেখ করা হয়, তখন ইহারও নাম করা হয়। আবার যখন বলা হয় যে, কোন প্রাচ্য জাতি তাহযীব-তমদ্দুনে উন্নতি করিতেছে, তখন সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিশেষ ফলাও করিয়া বলা হয়, তাহা হইতেছে এই যে, এই জাতির মধ্য হইতে 'নিকাব' বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন লজ্জায় শির নত করুন যে, ইহা পরবর্তী যুগের আবিষ্কৃত বস্তু নহে, বরং কুরআন পাকেরই ইহা আবিষ্কৃত এবং নবী করীম (সঃ) ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু মস্তক অবনত করিলেই চলিবে না। উট পাখী শিকারীকে দেখিয়া বালুকার মধ্যে মস্তক লুকাইলে শিকারীর অস্তিত্ব লোপ পায় না। আপনিও তদ্রূপ মস্তক অবনত করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে কুরআনের আয়াত মিটিয়া যাইবে না এবং ইতিহাস প্রমাণিত ঘটনাগুলি বিলুপ্ত হইবে না। জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা ইহার উপরে যবনিকাপাত করিলে এই 'লজ্জার কালিমা' অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। পাশ্চাত্য 'ঐশী বাণীর' উপর ঈমান আনিয়া আপনি উহাকে 'কলংক-কালিমা' বলিয়াই যখন মানিয়া লইয়াছেন, তখন উহা দূর করিবার একটি মাত্র উপায়ই আছে। তাহা হইতেছে এই যে, যে ইসলাম 'নিকাব,' অবগুন্ঠন ও মুখাবরণের ন্যায় 'ঘৃণিত বস্তুও' আদেশ করে, সেই ইসলাম হইতে আপনার

নিষ্কৃতি ঘোষণা করুন। আপনি 'উন্নতি' অভিলাষী, আপনার প্রয়োজন 'সভ্যতা'। অতএব ঐ ধর্মটি কেমন করিয়া আপনার গ্রহণীয় হইতে পারে, যে নারিগণকে সভা-সমিতির আলোকবর্তিকা সাজিতে বাধা দান করে। লজ্জাশীলতা, পর্দা ও সম্ভ্রম-সতীত্বের শিক্ষা দান করে এবং গৃহরাণীকে গৃহবাসী ব্যতীত অন্যান্যের চোখের আনন্দদায়িনী সাজিতে নিষেধ করে? এইরূপ ধর্মে 'উন্নতি' কোথায়? 'সভ্যতা'র সংগে এইরূপ ধর্মের সম্পর্ক কি? 'উন্নতি' ও 'সভ্যতা'র জন্য তো প্রয়োজন এই যে, যে নারী-নারী নয়, মেম সাহেবা-বাহিরে যাইবার পূর্বে দুই ঘন্টা পর্যন্ত সকল কাজকর্ম হইতে মুক্ত হইয়া শুধু সৌন্দর্যের পারিপাট্য ও সাজ-সজ্জায় লিপ্ত হইবে, সর্বশরীর সুগন্ধিতে ভরপুর করিবে, রং ও কাটিং-এর দিক দিয়া অতীব চিত্তাকর্ষক বস্ত্রে ভূষিত হইবে, মুখাবয়ব ও বাহুদ্বয় রঞ্জিত করিবে, লিপ্স্টিকে ওষ্ঠদ্বয় রক্তোজ্জ্বল করিবে, ভ্রূ-ধনুকে সঠিক ও দৃষ্টিবান নিক্ষেপের জন্য চক্ষুদ্বয়কে সতেজ করিবে, এই সকল মনোহর ভংগিতে সজ্জিত হইয়া যখন সে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে, তখন অবস্থা এই হইবে যে, প্রতিটি ভংগিমা যেন হৃদয়-মন আকর্ষণ করিয়া বলিবে 'প্রকৃত স্থান তো এইটি।' অতপর ইহাতেও যদি আত্মালংকার প্রদর্শনীর বাসনা পরিতৃপ্ত না হয়, আয়না ও প্রসাধনের সরঞ্জাম সর্বদা সংগে থাকিবে, যাহাতে সাজ-সজ্জার কণামাত্র ত্রুটি হইলে অল্পক্ষণ পর পর তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে।

আমরা এ কথা পুন পুন বলিয়াছি যে, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্দেশ্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে এবং যদি কেহ পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে ইসলামী নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলে সে মারাত্মক ভুল করিবে। পাশ্চাত্যের বস্তুসমূহে মূল্য ও মর্যাদার যে মাপকাঠি আছে ইসলামের মাপকাঠি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্য যে সকল বস্তুকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনের কাম্য মনে করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহার কোনই গুরুত্ব নাই। আবার ইসলাম যাহাকে গুরুত্ব দান করে, পাশ্চাত্যের নিকট তাহা মূল্যহীন। এখন যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে বিশ্বাসী, তাহার নিকট তো ইসলামের প্রতিটি বস্তুই সংশোধনযোগ্য মনে হইবে। সে ইসলামী নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা করিতে বসিলে তাহা পরিবর্তন করিয়াই ছাড়িবে এবং পরিবর্তনের পরেও তাহা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করিতে পারিবে না। কারণ পদে পদে কোরআন-সুন্নাহের ব্যাখ্যা তাহার

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। এইরূপ লোকের আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী কার্যকরী করিবার খুঁটিনাটি পন্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কি উদ্দেশ্যে এই পন্থাগুলি অবলম্বন করা হইয়াছে বা কতখানি গ্রহণযোগ্য। যদি সে ঐ সকল উদ্দেশ্যের সহিতই একমত হইতে পারিল না, তাহা হইলে উদ্দেশ্য লাভের উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্ক করা এবং উহাকে পরিবর্তন করার অহেতুক কষ্ট স্বীকার কেন করিবে? যে ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সে ত্রুটিযুক্ত মনে করে, তাহাই সে পরিত্যাগ করে না কেন? কিন্তু যদি সে উহার উদ্দেশ্যাবলীর সহিত একমত হয়, তাহা হইলে বিতর্ক শুধু এই বিষয়ে রহিয়া যায় যে, এই সকল উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য যে সকল কার্যকরী পন্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সংগত, না অসংগত। এই বিতর্কের সহজেই মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু শুধু সম্ভ্রান্ত লোকই এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এখন রহিল মুনাফিকের দল। ইহারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজীবের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট। তাহাদের ইহাই শোভা পায় যে, তাহারা কোন কিছুর উপরে বিশ্বাস স্থাপনেরও দাবী করিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস তাহাদের অন্য কিছুর উপরে।

'নিকাব' ও 'বোরকা' লইয়া যে পরিমাণে বিতর্ক চলিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে ভন্ডামির ভিত্তিতেই হইতেছে। সর্বশক্তি দিয়া ইহাই প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, পর্দার এই ধরন ইসলামপূর্ব যুগের জাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং জাহিলিয়াতের এই উত্তরাধিকার নবীযুগের বহু পরে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে। কুরআনের একটি সুস্পষ্ট আয়াত, নবী-যুগের প্রমাণিত কার্যধারা এবং সাহাবা-তাবেঈনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বিপক্ষে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য এই মাথা ব্যথা কেন? শুধু এই কারণে ঐ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহাদের সম্মুখে ছিল এবং আছে, যাহা পাশ্চাত্যের জনসাধারণ্যে গৃহীত। 'উন্নতি' ও 'সভ্যতা'র ঐ সকল ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্যবাসীর নিকট হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে। যেহেতু বোরকা পরিধান করা ও মুখমন্ডলে আবরণ দেওয়া ঐ সকল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং ঐ সকল ধারণার সংগে সামঞ্জস্যশীল নহে, সেইজন্য ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বলে ঐ সকল বিষয় মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহা ইসলামী আইনশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা এক সুস্পষ্ট মুনাফিকী যাহা অন্যান্য সমস্যার ন্যায় এই সমস্যায়ও করা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ সেই

নীতিজ্ঞানহীনতা, বুদ্ধির স্বল্পতা ও নৈতিক সাহসের অভাব, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে ইসলামের আনুগত্যের দাবী করা সত্ত্বেও কুরআনের ইতিহাস উপস্থাপিত করিবার চিন্তা মনে উদয় হইত না। হয় তাহার উদ্দেশ্যাবলী ইসলামের উদ্দেশ্যাবলীর সংগে এক করিয়া দিত [যদি সে মুসলমান হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিত] নতুবা প্রকাশ্যে এই ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া যাইত, যাহাকে সে তাহার নিজস্ব উন্নতির মাপকাঠি অনুযায়ী উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করে।

যে ব্যক্তি ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করে এবং সে কিছু সাধারণ জ্ঞানও [Common Sense] রাখে, তাহার জন্য ইহা হৃদয়ংগম করা কঠিন নহে যে, নারীদিগকে উন্মুক্ত মুখমন্ডলসহ বাহিরে চলাফেরার অনুমতি দান করা ঐ সকল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, ইসলাম যাহার প্রতি এতটা গুরুত্ব দান করে। কোন ব্যক্তিকে অপরের যে বস্তুটি সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করে, তাহা হইতেছে তাহার মুখাবয়ব। মানবের সৃষ্টিগত সৌন্দর্য, অন্য কথায় মানবীয় সৌন্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যই তাহার মুখাবয়ব। ইহাই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাই আবেগ-অনুভূতিকে আলোড়িত করে। যৌন আবেগ ও উত্তেজনার সর্বশ্রেষ্ঠ এজেন্ট ইহাই। ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য কোন গভীর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন নাই। আপনি নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করুন। আপন চক্ষুদ্বয়ের নিকটেই ফতোয়া তলব করুন। স্বীয় মানসিক পরীক্ষায় যাচাই-পর্যালোচনা করিয়া দেখুন। ভন্ডামির কথা পৃথক। ভন্ড-মুনাফিক যদি সূর্যের অস্তিত্ব স্বীকারকেও নিজের স্বার্থের পরিপন্থী দেখে তাহা হইলে সে দিবালোকের সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বসিবে। যদি সত্যকে অবলম্বন করেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যৌন আবেগ-আবেদনের [Sex Appeal] বেলায় দেহের সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকাংশই আল্লাহ্ তায়ালা মুখমন্ডলে দান করিয়াছেন। যদি কোন মেয়েকে আপনার বিবাহ করিতে হয়, আর যদি তাহাকে দেখিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন, তাহার কি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন? এক তো এই হইতে পারে যে, সে আপনার সম্মুখে মুখমন্ডল ব্যতীত তাহার সর্বাংগ ঢাকিয়া থাকিবে। দ্বিতীয়ত এই হইতে পারে যে, সে কোন বাতায়নের ফাঁকে তাহার মুখাবয়ব দেখাইয়া দিল। বলুন এখন এই উভয় প্রকারের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি গ্রহণ করিবেন? সত্য করিয়া বলুন যে, সমগ্র দেহের তুলনায় মুখের সৌন্দর্য কি আপনার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ নহে?

এই সত্যকে স্বীকার করিবার পর সম্মুখে অগ্রসর হউন। সমাজের যৌন উচ্ছৃংখলতা ও বিকেন্দ্রিক যৌন-উত্তেজনা বন্ধ করাই যদি কাম্য না হয় তাহা হইলে মুখমন্ডল কেন, বক্ষ, বাহু, উরু ও পায়ের গোছা প্রভৃতি সকল কিছুই উন্মুক্ত রাখিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতায় আছে। এমতাবস্থায় ঐ সকল সীমারেখা ও বাধা-নিষেধের কোনই প্রয়োজন নাই, যাহা ইসলামী পর্দাপ্রথা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যৌন-উত্তেজনার ঝটিকা রোধ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠু বিচার-বিরুদ্ধ অবৈজ্ঞানিক কথা আর কি হইতে পারে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে শিকল লাগান হইবে, কিন্তু বৃহৎ দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখা হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবস্থা যদি এই হয়, তাহা হইলে অপরিহার্য প্রয়োজনে ইসলাম মুখমন্ডল খুলিবার অনুমতি কেন দিল? তাহার উত্তর এই যে, ইসলামী আইন ভারসাম্যহীন ও একদেশদর্শী নহে। উহা একদিকে যেমন নৈতিক পরিণামদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখে, ঠিক অন্যদিকে আবার মানবের প্রকৃত প্রয়োজনকে সম্মুখে রাখিয়া বিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে সে অতিমাত্রায় সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজায় রাখিয়াছে। সে নৈতিক অনাচারের পথ রুদ্ধ করিতে চায় এবং তৎসহ কোন মানুষের প্রতি এমন কোন বাধা-নিষেধও আরোপ করিতে চায় না, যদ্দারা আপন প্রকৃত প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ইহাই একমাত্র কারণ যে, সতর ঢাকিবার ও সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে যেরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে মুখমন্ডল ও হস্তের ব্যাপারে সেইরূপ দেওয়া হয় নাই। কারণ সতর ও সৌন্দর্য লুকাইয়া রাখিলে জীবনের প্রয়োজন পূরণে কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল সর্বদা আবৃত রাখিলে নারীদের প্রয়োজন পূরণে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অতএব নারীদের জন্য সাধারণভাবে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, তাহারা মুখের উপর অবগুণ্ঠন ও আবরণ দিয়া রাখিবে এবং الا ما ظهر منها -এর নীতি অনুযায়ী এই সুবিধা দান করা হইয়াছে যে, প্রকৃতই যদি মুখ খুলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা খোলা যাইতে পারে। তবে শর্ত এই যে, সৌন্দর্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য হইবে না বরং প্রয়োজন পূরণই হইবে প্রকৃত উদ্দেশ্য। অতপর অপরপক্ষ হইতে যে অনাচার-অমংগলের আশংকা ছিল, পুরুষকে দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়া তাহারও পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। যদি কোন সম্ভ্রমশীলা রমণী নিজের প্রয়োজনে মুখমন্ডল উন্মুক্ত করে তাহা হইলে পুরুষ তাহার দৃষ্টি অবনমিত করিবে এবং উহার অন্যায় ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবে।

পর্দা পালনের এই নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, ইসলামী পর্দা কোন জাহিলী প্রথা নহে, বরং একটি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত আইন। জাহিলী প্রথা স্থবির, অপরিবর্তনশীল। যে প্রথা যেভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, কোন অবস্থাতেই তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন করা যায় না। যাহা গোপন হইয়াছে, তাহা চিরদিনের জন্য গোপন রহিয়া যায়। মরিয়া গেলেও তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে বুদ্ধি-বিবেকসম্মত আইনে থাকে নমনীয়তা। অবস্থা অনুযায়ী ইহার মধ্যে কঠোরতা ও লাঘবের অবকাশ থাকে। অবস্থা অনুযায়ী ইহার নিয়ম-নীতির মধ্যে ব্যতিক্রমের পন্থাও রাখা হয়। এই ধরনের আইন অন্ধের ন্যায় মানিয়া চলা যায় না। ইহার জন্য বোধশক্তি ও বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বিবেকসম্পন্ন আইন-মান্যকারী ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কোন সময় সাধারণ নিয়ম-নীতি পালন করা উচিত এবং কোন্ সময় আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃত প্রয়োজন হয়, যাহার জন্য ব্যতিক্রমের সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতপর সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় অনুমতি দ্বারা কতখানি উপকার লাভ করিতে পারে এবং উপকার লাভ করিতে যাইয়া আইনের উদ্দেশ্যকে কিভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়। এই সকল কাজে প্রকৃতপক্ষে একটা পবিত্র নিয়্যত বা বাসনাই মু'মিনের মনকে সত্যিকার মুফতী বানাইতে পারে। নবী (সঃ) বলিয়াছেনঃ

دع ما حاك فى صدرك واستفت قلبك

নিজের মনের নিকট ফতোয়া চাও এবং মনের মধ্যে যে বিষয় সম্পর্কে খটকা বা সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা পরিত্যাগ কর।

এই কারণেই অজ্ঞতাসহকারে এবং না বুঝিয়া ইসলামের আনুগত্য সম্ভব নহে। ইহা একটি বিবেক-বুদ্ধিসম্মত আইন এবং ইহা মানিয়া চলিতে হইলে পদে পদে অনুভূতি এবং বোধশক্তির প্রয়োজন হয়।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার আইন–কানুন

পোশাক ও সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করিবার পর শেষ নির্দেশ যাহা নারীদের প্রতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى –

মর্যাদা সহকারে আপন আপন গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় সাজ–সজ্জা সহকারে ভ্রমণ করিও না। –সূরা আহযাব ঃ ৩৩

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ –

তাহারা যেন মাটির উপরে এমনভাবে পদক্ষেপ না করে যাহাতে তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। –সূরা নূর ঃ ৩১

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ –

চাপা গলায় কথা বলিও না নতুবা যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা প্রলুব্ধ হইবে। –সূরা আহযাব ঃ ৩২

قرن শব্দের উচ্চারণে মতভেদ আছে। সাধারণ মদীনাবাসী এবং কিছু সংখ্যক কূফাবাসী وقرن [কাফ–এর উপর যবর দিয়া] পড়িয়াছেন। ইহা মূল قرار শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই দিক দিয়া ইহার অর্থ দাঁড়াইবে, আপন গৃহে স্থিরভাবে অবস্থান কর। পক্ষান্তরে সাধারণ বসরা ও কূফার অধিবাসিগণ وقرن [কাফ–এর নীচে যের দিয়া] পড়িয়াছেন। ইহা وقار শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়াইবে, 'আপন গৃহে মর্যাদা ও শান্তির সংগে অবস্থান কর।'

تبرج শব্দের দুইটি অর্থ। এক সৌন্দর্য ও সাজ–সজ্জার প্রকাশ। দ্বিতীয়, চলিবার সময় ঠাট–ঠমক দেখান, 'চলিতে ছলকি পড়িছে কাঁকাল'–যেন এইভাবে চলা, কমণীয় ভাব–ভংগিমা সহকারে চলা–কুরআনের আয়াতে উভয় অর্থই বুঝান হইতেছে। প্রথম জাহিলিয়াতের যুগে নারিগণ মনোহর

সাজ–সজ্জায় বাহির হইত, যেমনভাবে আধুনিক জাহিলিয়াতের যুগের নারী সমাজ বাহিরে চলাফেরা করে। আবার চলিবার ধরনও ইচ্ছাকৃত এমন ছিল যে, প্রতিটি পদক্ষেপ মাটির উপর না পড়িয়া দর্শকের মনের উপরে পড়িত। প্রখ্যাত তাবেয়ী ও তাফসীর লেখক কাতাদাহ বলিয়াছেনঃ

كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنها هن الله عن ذالك –

এই অবস্থা হৃদয়ংগম করিবার জন্য কোন ঐতিহাসিক বিবরণের প্রয়োজন নাই। এমন এক সমাজে আপনি গমন করুন যেখানে মেয়েরা পাশ্চাত্য সাজ– পোশাকে আগমন করে। প্রথম জাহিলিয়াত যুগের চালচলন আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। ইসলাম ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলে। সে বলে, প্রথমত তোমার সত্যিকার থাকিবার স্থান হইতেছে তোমার গৃহ। বহির্বাটির দায়িত্ব হইতে তোমাকে এইজন্য অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, যেন তুমি শান্তি ও মর্যাদা সহকারে গৃহে অবস্থান করিতে এবং পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব পালন করিতে পার। তথাপি যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গৃহের বাহিরে যাওয়াও তোমার জন্য জায়েয। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় তোমার সতীত্ব–সম্ভ্রমের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিও। তোমার সাজ–পোশাকে না এমন কোন জাঁকজমক ও দীপ্তি থাকিবে যাহা তোমার দিকে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে, না সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য তোমার মধ্যে এমন উৎকন্ঠা থাকিবে যে, চলিতে চলিতে কখনও বা মুখমন্ডলের ঝলক দেখাইবে এবং কখনও বা হস্তদ্বয়ের প্রদর্শনী করিবে। তোমার চালচলনে এমন কোন কমনীয় ভাব থাকিবে না যাহাতে অপরের দৃষ্টি তোমার প্রতি নিবদ্ধ হয়। এমন অলংকারসহ বাহিরে চলিবে না, যাহার ঝংকার অপরের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করে। অপরকে শুনাইবার জন্য স্বেচ্ছায় কন্ঠধ্বনি করিও না। হাঁ, যদি কথা বলিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বল, কিন্তু মধুভরা কন্ঠে বলার চেষ্টা করিও না। এই সকল নিয়ম–নীতি ও সীমারেখা মানিয়া চলিয়া তুমি গৃহের বাহিরে যাইতে পার।

ইহাই হইতেছে কুরআন পাকের শিক্ষা। আসুন, এখন একবার হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। নবী (সঃ) ঐ শিক্ষা অনুযায়ী সমাজে নারীদের জন্য কোন্ পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং তাঁহাদের নারিগণ কিভাবে উহা কার্যকরী করিয়াছেন।

প্রয়োজনের জন্য বাহিরে যাইবার অনুমতি

হাদীসে আছে যে, পর্দার নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ)-এর দাবী ছিল, 'হে আল্লাহর রসূল (সঃ)। নারীদের পর্দা করুন।' একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে খা'ময়া (রাঃ) রাত্রিকালে ঘরের বাহির হইলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সাওদা! আমরা তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি।' ইহার দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মেয়েদের কোন প্রকার গৃহের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ হউক। ইহার পর পর্দার আদেশ নাযিল হইলে হযরত ওমরের সুযোগ আসিল। তিনি মেয়েদের বাহিরে যাওয়াতে কঠোরভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। পুনরায় হযরত সাওদা (রাঃ)-এর পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইবা মাত্র হযরত ওমর (রাঃ) বাধা দিলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। নবী বলিলেন ঃ

قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن -

আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে প্রয়োজন অনুসারে বাহিরে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। সলিম, বুখারী প্রমুখ।

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, وقرن فى بيوتكن -এর কুরআনী মর্ম ইহা নহে যে, মেয়েরা গৃহের সীমারেখার বাহিরে মোটেই পা রাখিবে না, বরং প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাহিরে যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি আছে। কিন্তু এই অনুমতি শর্তহীনও নহে এবং সীমাহীনও নহে। মহিলাদের জন্য ইহা জায়েয নহে যে, তাহারা যত্রতত্র স্বাধীনভাবে চলাফেলা করিবে এবং পুরুষের সমাবেশে মিশিয়া যাইবে। প্রয়োজন বলিতে শরীয়তের মর্ম এই যে, বাহিরে যাওয়া মেয়েদের জন্য একেবারে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রকাশ থাকে যে, সকল নারীর জন্য সকল যুগে বাহির হওয়া না হওয়ার এক এক পদ্ধতি বর্ণনা করা এবং প্রতি সময়ের জন্য পৃথক পৃথক অনুমতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। অবশ্য শরীয়তপ্রণেতা জীবনের সাধারণ অবস্থায় মেয়েদের বাহিরে যাওয়ার যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পর্দার সীমারেখার মধ্যে যেভাবে কমবেশী করিয়াছেন, উহা হইতে ইসলামী আইনের স্পিরিট এবং উহার প্রবণতা অনুমান করা যায়। উহা পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করত ব্যক্তিগত অবস্থায় এবং ছোটখাট ব্যাপারে পর্দার সীমারেখা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে

উহাকে বেশী–কম করিবার নীতি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং জানিতে পারে। উহার ব্যাখ্যার জন্য আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

মসজিদে আসিবার অনুমতি ও উহার সীমারেখা

ইহা সর্বজনবিদিত যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরয–নামায। নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং জামায়াতে শরীক হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জামায়াতসহ নামাযের অধ্যায়ে পুরুষদের জন্য যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত নির্দেশ মেয়েদের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পুরুষের জন্য ঐ নামায উৎকৃষ্ট, যাহা মসজিদে জামায়াতসহ পড়া হয়। মেয়েদের জন্য ঐ নামায উৎকৃষ্ট, যাহা গৃহে অত্যন্ত নির্জনতার মধ্যে আদায় করা হয়। ইমাম আহমদ ও তিবরানী উম্মে হুমাইদ সায়েদিয়া হইতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قالت يارسول الله انى احب الصلواة معك – قال قد علمت صلواتك فى بيتك خير لك من صلواتك فى حجرتك – وصلوتك فى حجرتك خير من صلواتك فى دارك – وصلواتك فى دارك خير صلوتك فى مسجد قومك – وصلوتك فى مسجد قومك خير من صلوتك فى مسجد الجمعة –

সে বলিল, 'হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমার মন চায় যে, আমি আপনার সংগে নামায পড়ি।' নবী (সঃ) বলিলেন, 'আমি জানি। কিন্তু তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া অপেক্ষা এক নিভৃত স্থানে নামায পড়া শ্রেয়। এবং তোমার বাড়ীর দালানে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার কামরায় নামায পড়া শ্রেয়। এবং জামে মসজিদে নামায পড়া হইতে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া শ্রেয়।[১]

---

১. যে কারণে মেয়েদের এমন নিভৃতে নামায পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা মেয়েরাই ভাল বুঝিতে পারে। মাসের মধ্যে কিছুদিন তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নামায পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব এইভাবে এমন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে যাহা কোন লজ্জাশীলা নারী তাহার ভ্রাতা–ভগ্নির নিকটও প্রকাশিত হওয়া পসন্দ করে না। এই লজ্জায় অনেক মেয়েলোক নামাযই পরিত্যাগ করিয়া ফেলে। শরীয়তপ্রণেতা ইহা অনুভব করত উপদেশ দিলেন, 'তোমরা চুপে চুপে নিভৃতে নামায পড় যেন কেহ জানিতে না পারে যে, তোমরা কখন নামায পড় এবং কখন ছাড়িয়াদাও।'

এই বিষয়ের উপর আবু দাউদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছেঃ

صلوة المراة فى بيتها افضل من صلوتها فى حجرتها وصلوتها فى مخدعها افضل من صلوتها فى بيتها -

নারীর স্বীয় কামরায় নামায পড়া অপেক্ষা নিভৃত কক্ষে নামায পড়া উত্তম এবং কুঠরী অপেক্ষা চোরা কামরায় নামায পড়া উত্তম।

লক্ষ্য করিয়া দেখুন, এই ব্যাপারে পদ্ধতি একেবারে বিপরীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরুষের জন্য একাকী নিভৃতে নামায পড়াকে নিকৃষ্টতম নামায বলা হইয়াছে এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জামায়াতে নামায পড়া তাহার জন্য উৎকৃষ্ট নামায। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীতে নারীর জন্য নিভৃতে নামায পড়াকে উত্তম বলা হইয়াছে এবং এই নিভৃত নামাযকে শুধু জামায়াতসহ নামাযের উপরই প্রাধ্যান্য দেওয়া হয় নাই, বরং ঐ নামায হইতেও উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর কোন নিয়ামত একজন মুসলমানের আর কিছু হইতে পারে না অর্থাৎ মসজিদে নববীর জামায়াত–যাহা পরিচালনা করেন স্বয়ং ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। এখন এই পার্থক্য ও বৈষম্যের কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, শরীয়তপ্রণেতা নারীদের বাহিরে যাওয়া পসন্দ করেন নাই এবং জামায়াতে নারী–পুরুষের একত্রে সমাবেশ রোধ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু নামায একটি পবিত্র ইবাদত এবং মসজিদ একটি পবিত্র স্থান। বিজ্ঞ শরীয়তপ্রণেতা নারী–পুরুষের সংমিশ্রণ রোধ করিবার জন্য স্বীয় অভিপ্রায়–ফযীলত ও গায়ের ফযীলত–বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ একটি পূর্ণ কাজের জন্য পবিত্র স্থানে যাইতে নারীদিগকে নিষেধ করেন নাই। হাদীসে যে সকল শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শরীয়তপ্রণেতার অনুপম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

অবশ্য ইহা উপদেশমাত্র, আদেশ নহে। মেয়েরা গৃহের মধ্যে পৃথক জামায়াত করিতে পারে এবং নারী তাহার ইমামতি করিতে পারে। নবী (সঃ) উম্মে ওরকা বিনতে নওফেলকে মেয়েদের জামায়াতে ইমামতি করার অনুমতি দিয়াছিলেন [আবু দাউদ]। দার কুত্‌নী ও বায়হাকী হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মেয়েদের ইমামতি করিয়াছিলেন এবং কাতারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছিলেন। ইহা হইতে এই মসলা জানিতে পারা যায় যে, যখন নারী নারীদের জামায়াতে নামায পড়াইবে তখন পুরুষের ন্যায় কাতারের অগ্রভাগে না দাঁড়াইয়া মাঝখানে দাঁড়াইবে।

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - اذا استاذنت امراة احد كم الى المسجد فلا يمنعها -

আল্লাহর দাসীদিগকে আল্লাহর মসজিদে আসিতে নিষেধ করিও না। তোমাদের মধ্যে কাহারও স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দিও না। –বুখারী, মুসলিম

لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن -

তোমাদের স্ত্রীদিগকে মসজিদে যাইতে বাধা দিও না। তবে তাহাদের গৃহই তাহাদের জন্য অধিকতর ভাল। –আবু দাউদ

এই কথাগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তপ্রণেতা নারীদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করেননি। কারণ, মসজিদে নামাযের জন্য যাওয়া তো কোন মন্দ কাজ নহে যে, ইহাকে না-জায়েয বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও দাবী করা যায় না যে, মসজিদে নারী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশ হউক। তাহাদিগকে মসজিদে গমন করিবার তো অনুমতি দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাও বলা হইল না যে, তাহাদিগকে মসজিদে পাঠাইতে হইবে অথবা নিজেদের সংগে লইয়া যাইতে হইবে, বরং শুধু এতটুকু বলা হইল যে, যদি তাহারা উৎকৃষ্ট নামায পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট নামায পড়িবার জন্য মসজিদে যাইতে চায় এবং ইহার জন্য অনুমতি চায়, তাহা হইলে নিষেধ করা চলিবে না। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামী তত্ত্ববিদ ছিলেন এবং তিনি শরীয়তপ্রণেতার সেই তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়দের সংগে তাঁহার এই ব্যাপারে বাদানুবাদ লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার স্ত্রী মসজিদে যান-ইহা হযরত ওমর (রাঃ) ভালবাসিতেন না। কিন্তু তিনি যাইবার জন্য জিদ্ করিতেন। যাইবার অনুমতি চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়া নীরব থাকিতেন। ইহার অর্থ এই যে, যাইতে বাধাও দিতেন না, আর স্পষ্ট অনুমতিও দিতেন না। তাঁহার স্ত্রীও এই ব্যাপারে বড় শক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, 'আল্লাহর কসম, আমি যাইতেই থাকিব যতক্ষণ না আপনি স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেন।[১]

---

১. ইহা শুধু ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রীর অবস্থাই ছিল না। বরং নবী (সঃ)-এর যুগে বহুসংখ্যক নারী জামায়াতে নামাযের জন্য মসজিদে যাইতেন। আবু দাউদে আছে যে, মসজিদে নববীতে নারীদের দুই-দুইটি সারি হইত।

মসজিদে আগমন করিবার শর্তাবলী

মসজিদে হাযির হইবার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে কিছু শর্তও আরোপ করা হইয়াছে। ইহার প্রথম শর্ত এই যে, দিনের বেলায় মসজিদে যাওয়া চলিবে না। আঁধারকালের নামাযগুলি, যথাঃ এশা এবং ফজর পড়িতে পারিবে।

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلعم ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد

হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেন, নারীদিগকে রাত্রিকালে মসজিদে আসিতে দাও। –তিরমিযী

قال نافع مولى ابن عمرو كان اختصاص الليل بذلك لكونه استروا خفى.

হযরত ইব্নে ওমরের বিশিষ্ট শাগ্রেদ হযরত নাফে' বলেন, রাত্রিকাল এইজন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাত্রির অন্ধকারে ভালভাবে পর্দা করা সম্ভব হইবে। –তিরমিযী

عن عائشة قالت كان رسول صلعم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن مايعرفن من الغسل.

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) ফজর নামায এমন সময়ে পড়িতেন যে, নামায শেষে নারিগণ যখন চাদর মুড়ি দিয়া গৃহে ফিরিতেন তখন অন্ধকারে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যাইত না। –তিরমিযী

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, মসজিদে সাজ–সজ্জা করিয়া ও সুগন্ধি প্রসাধন মাখিয়া আসা চলিবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ–একদা নবী (সঃ) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় মুযায়না গোত্রের একটি নারী সাজ–সজ্জা করত ঠাট–ঠমক সহকারে তথায় আসিল। তখন নবী (সঃ) বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের নারীদিগকে সাজ–সজ্জা করিয়া ঠাট–ঠমক সহকারে মসজিদে আসিতে দিও না।' –ইবনে মাজাহ

সুগন্ধি সম্পর্কে নবী (সঃ) বলেন, 'যে রাত্রে তোমরা নামাযে আসিবে সে রাত্রে কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া আসিবে না। একেবারে

সাদাসিদা পোশাকে আসিবে। যে নারী সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া আসিবে, তাহার নামায হইবে না।' —মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিক

তৃতীয় শর্ত এই যে, পুরুষের সংগে একই সারিতে মিশিয়া অথবা সম্মুখের সারিতে দাঁড়াইবে না। তাহাদিগকে পুরুষের পিছন সারিতে দাঁড়াইতে হইবে।

خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها – وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها –

নবী (সঃ) বলেন, পুরুষের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান সম্মুখের সারিতে এবং নিকৃষ্ট স্থান পিছন সারিতে। নারীদের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান পিছন সারিতে এবং নিকৃষ্ট স্থান সম্মুখ সারিতে।

জামায়াতের অধ্যায়ে নবী (সঃ) এই পদ্ধতিই নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে না, তাহারা স্বামী-স্ত্রী অথবা মাতা-পুত্র হউক না কেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'একদা আমার নানী মুলায়কা নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করিলেন। খাওয়ার পর তিনি [নবী] নামাযে দাঁড়াইলে আমি ও ইয়াতিম [সম্ভবত হযরত আনাসের ভাই] হুযুরের পিছনে দাঁড়াইলাম এবং মুলায়কা আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন।' —তিরমিযী

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, তিনি বলেন, 'একদা হুযুর (সঃ) আমাদের গৃহে নামায পড়িলেন। আমি ও ইয়াতিম তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম এবং আমার মাতা উম্মে সুলাইম আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।' —বুখারী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'একদা নবী (সঃ) নামাযের জন্য দাঁড়াইলে আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। —নাসায়ী

চতুর্থ শর্ত এই যে, নারিগণ নামাযে উচ্চ শব্দ করিবে না। পদ্ধতি ইহা নির্ধারিত হইল যে, নামাযের মধ্যে কোন বিষয়ে ইমামকে সাবধান করিয়া দিতে হইলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলিবে এবং নারী হস্ত দ্বারা শব্দ করিবে।

—বুখারী

এতসব সীমারেখা ও বাধা-নিষেধ আরোপ করার পরেও হযরত ওমর (রাঃ) জামায়াতে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ আশংকা করিলেন এবং তিনি মসজিদে নারীদের জন্য একটা পৃথক দরজা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া পুরুষের জন্য সেই দরজা দিয়া যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। –আবু দাউদ

হজ্জে নারীদের জন্য করণীয় পদ্ধতি

হজ্জ ইসলামের দ্বিতীয় সমষ্টিগত ফরয। পুরুষের ন্যায় ইহাও নারীদের জন্য ফরয। কিন্তু তাওয়াফের সময় পুরুষের সংগে মিশিয়া যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে আতা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-এর যুগে পুরুষের সংগে নারী তওয়াফ করিত। কিন্তু পরস্পরে মিলিত হইত না। ফতহুল বারী গ্রন্থে ইব্রাহিম নখয়ী হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) তাওয়াফের সময় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। একবার তিনি একজন পুরুষকে নারীদের সমাবেশে দেখিলেন এবং তাহাকে ধরিয়া বেত মারিলেন। –ফতহুল বারী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১২

মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পরিবার-বর্গকে মুযদালিফা হইতে মিনায় সকলের আগে রওয়ানা করিয়া দিতেন যেন তাঁহারা লোকজন আসিবার পূর্বেই নিজ নিজ নামায ও প্রস্তর নিক্ষেপ কার্য সমাধা করিতে পারেন। এমন কি হযরত আবুবকর (রা) তনয়া হযরত আসমা (রা) ভোরের অন্ধকারে মিনা গমন করিতেন। নবী (সঃ)-এর যুগে নারীদের জন্য এই ছিল নিয়ম। –মুয়াত্তা ইমাম মালিক

জুম্'আ ও ঈদে নারীর অংশগ্রহণ

জুম্'আ ও ঈদের সমাবেশ ইসলামে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাহার বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। ইহার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শরীয়ত-প্রণেতা, বিশেষ করিয়া এই সমাবেশগুলির জন্য ঐ সকল শর্ত রহিত করিয়া দিয়াছেন যাহা সাধারণ নামাযের বেলায় আরোপ করা হইয়াছে; যথাঃ দিবসের বেলায় জামায়াতে যোগদান করা চলিবে না। অবশ্য যদিও জুম্'আর বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নহে [আবু দাউদ] এবং দুই ঈদের জামায়াতেও তাহাদের যোগদান করা প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যদি তাহারা ইচ্ছা করে তাহা হইলে অন্য শর্ত পালন করত এই সকল

জামায়াতে শরীক হইতে পারে। হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং নবী (সঃ) আপন নারীদিগকে ঈদের নামাযে লইয়া যাইতেন।

عن ام عطية قالت ان رسول الله صلعم كان يخرج الابكار والعواتق وزوات الخدور والحيض فى العيدين فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين –

উম্মে আতিয়া হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) কুমারী, যুবতী, গৃহিণী ও ঋতুবতী রমণীদিগকে ঈদের মাঠে লইয়া যাইতেন। যে সকল নারী নামাযের যোগ্য হইতেন না, তাঁহারা জামায়াত হইতে পৃথক থাকিতেন এবং শুধু দোয়ায় শরীক হইতেন। –তিরমিযী

عن ابن عباس رض ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونسائه فى العيدين –

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) স্বীয় সহধর্মিনী ও কন্যাসহ ঈদে গমন করিতেন। –ইবনে মাজাহ

কবর যিয়ারত ও জানাযায় অংশগ্রহণ

মুসলমানের জানাযায় যোগদান করা শরীয়তে ফরযে কিফায়া বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে সকল জরুরী নির্দেশ আছে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অজানা নাই। কিন্তু এই সকলই শুধু পুরুষের জন্য, নারীদিগকে জানাযায় যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞায় কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় নাই, বরং কোন কোন সময়ে অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শরীয়তপ্রণেতার নির্দেশে স্পষ্ট জানা যায় যে, নারীদের জানাযায় যোগদান করা ক্রটি মুক্ত নয়।

বুখারী শরীফে উম্মে আতিয়া হইতে একটি হাদীস বর্ণিত আছেঃ

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا –

জানাযায় অংশ গ্রহণ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, তবে কঠোরভাবে নয়। –বুখারী

ইবনে মাজাহ ও নাসায়ীতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) একদা এক জানাযায় শরীক ছিলেন। তথায় জনৈকা নারীকে দেখিতে পাওয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, 'ওমর, উহাকে ছাড়। মনে হয় স্ত্রীলোকটি মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়া ছিল। হয়ত শোকে অধীর হইয়া মৃত ব্যক্তির সংগে আসিয়াছিল।' নবী (সঃ) তাহার মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)-কে তিরস্কার করিতে নিষেধ করিলেন।

কবর যিয়ারতের অবস্থাও এইরূপ। নারী-হৃদয় বড়ই কোমল। আপন মৃত প্রিয়জনের স্মরণ তাহাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তাহাদের এই শোকাবেগ উপেক্ষা করা শরীয়ত প্রণেতা ভাল মনে করেন নাই। কিন্তু একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, নারীদের বেশী বেশী কবরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত আছেঃ

لعن رسول الله صلعم زوارات القبور -

নবী (স) অধিক কবর যিয়ারত কারিণীর প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) তদীয় ভ্রাতা হযরত আবদুর রহমান বিন্ আবু বকর (রা)-এর কবরে গমন করিবার পর বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার কবর যিয়ারতে আসিতাম না। -তিরমিযী

আনাস বিন মালিক বলেন যে, একদা নবী (স) একজন স্ত্রীলোককে কবরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া নিষেধ করিলেন না। শুধু বলিলেন, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।'

এই নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখুন। নামায একটি পবিত্র ইবাদত। মসজিদ একটি পূণ্যস্থান। হজ্জে মানুষ পবিত্র চিন্তাধারা সহকারে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়। জানাযায় ও কবরের পার্শ্বে প্রত্যেক মানুষের মনে মৃত্যুর কথা উদিত হয় এবং শোকে-দুঃখে মন অভিভূত হয়। এই সকল অবস্থায় যৌন-বাসনা একেবারে লোপ পায় অথবা থাকিলেও তাহা অন্যান্য পবিত্র ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু তথাপিও এই সকল সমাবেশে শরীয়ত নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ পসন্দ করে নাই। পরিস্থিতির পবিত্রতা, উদ্দেশ্যের নির্মলতা এবং নারীদের ভাবাবেগ লক্ষ্য করিয়া নারীদের গৃহের বাহিরে

যাওয়ার তো অনুমতি দিয়াছেন এবং কোন কোন সময়ে স্বয়ং সংগে করিয়া লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু পর্দার প্রতি এত বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন যে, অনাচার-অমংগলের ক্ষীণ আশংকাও বাকী রহিল না। অতপর হজ্জ ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ইহা ঘোষণা করা হইল যে, নারীদের এ সকল কাজে অংশ গ্রহণ না করাই অধিকতর শ্রেয়।

যে আইনের এহেন প্রবণতা, আপনি কি আশা করিতে পারেন যে, ইহা স্কুল-কলেজে, অফিস-কারখানায়, পার্ক ও প্রমোদ কাননে, সিনেমা ও রংগমঞ্চে, কফিখানায় ও নৃত্যশালায় স্ত্রী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশ জায়েয রাখিবে?

যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ

পর্দার সীমারেখা ও কড়াকড়ি আপনি লক্ষ্য করিলেন। এখন দেখুন কোথায় এবং কি কারণে ইহা লাঘব করা হইয়াছে। মুসলমান যুদ্ধে লিপ্ত হয় সর্বসাধারণের এক বিপদ সংকুল অবস্থায়। পরিস্থিতি দাবি করে যে, জাতির সমগ্র শক্তি আত্মরক্ষায় ব্যয়িত হউক। এই অবস্থায় ইসলাম নারী জাতিকে সার্বজনীন অনুমতি দান করে যে, তাহারা সামরিক সেবায় অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু ইহার সংগে সংগে এ সত্যকেও তুলিয়া ধরা হয় যে, যাহাকে মাতা সাজিবার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাকে শিরচ্ছেদন অথবা রক্ত প্রবাহিত করিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। তাহার হস্তে যুদ্ধাস্ত্র তুলিয়া দেওয়ার অর্থ তাহার প্রকৃতিকে হত্যা করা। এইজন্য ইসলাম নারীদিগকে জীবন ও সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষার্থে কেবল অস্ত্র ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে নারীদের নিকটে সৈনিকের কাজ লওয়া এবং তাহাদিগকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করা ইসলামী নীতির পরিপন্থী। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে এতটুকু সেবা লওয়া যাইতে পারে যে, তাহারা আহত সৈনিকদের ব্যন্ডেজ করিবে, তৃষ্ণার্তদিগকে পানি পান করাইবে, সৈনিকদের জন্য রান্না করিবে এবং সৈনিকদের পশ্চাতে তাহাদের ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ কবিবে। এই সকল কজের জন্য পর্দার সীমারেখা চরমভাবে লাঘব করা হইয়াছে। এই সকল সেবাকার্যের জন্য সামান্য সংশোধনী সহকারে খৃীস্টান মঠাধ্যক্ষাদের পোশাক শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয হইবে।

হাদীস গ্রন্থাবলী হইতে প্রমাণিত আছে যে, নবী সহধর্মিণিগণ এবং অন্যান্য মুসলমান নারী–নবী (স)–এর সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন। তাঁহারা তৃষ্ণার্তদিগকে পানি পান করাইতেন এবং আহতদের ব্যান্ডেজ করিতেন। পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পরেও এই কাজ চলিয়াছে। [বুখারী]

তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে আছে যে, উম্মে সুলাইম এবং অন্যান্য আনসার রমণী প্রায় যুদ্ধে নবী (স)–এর সহগামিনী হইতেন। বুখারী শরীফে আছে যে, একদা জনৈকা নারী নবী (স)–এর নিকটে আরয করিলেন, 'আপনি দোয়া করুন আমি যেন সামুদ্রিক যোদ্ধাদের সহগামিনী হইতে পারি।' নবী (স) দোয়া করিলেন اللهم اجعلها منهم। 'হে আল্লাহ! তুমি ইহাকে তাহাদের মধ্যে একজন করিয়া দাও।'

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিদগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে–সুলাইম স্কন্ধে পানির মশক বহন করত সৈনিকদিগকে পানি পান করাইতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, তিনি তাহাদিগকে পায়জামা উত্তোলন করত এমনভাবে দৌড়াইয়া যাতায়াত করিতে দেখেন যে, পায়ের গোছার নিম্নাংশ অনাবৃত দেখিতে পান। [বুখারী, মুসলিম] উম্মে সুলাইত নাম্নী অপর এক নারী সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) স্বয়ং নবী (স) কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন, ওহুদের যুদ্ধে ডানে ও বামে যেদিকে তাকাই, দেখিতে পাই যে, উম্মে সুলায়েত আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত আছে।' এই যুদ্ধেই রুবাঈ বিনতে মুয়াওয়ায ও তাঁহার সংগে একটি মহিলাদল আহতদের ব্যান্ডেজ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারাই আহত সৈনিকদিগকে বহন করত মদীনায় লইয়া যাইতেছিলেন। [বুখারী] হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম একটি খঞ্জর হস্তে ইতস্তত ঘুরাফিরা করিতেছিলেন। হুযূর (স) জিজ্ঞাসা করিলেন 'একি করিতেছ? তিনি বলিলেন কোন মুশরিক আমার নিকট দিয়া গেলে তাহার পেট চিরিয়া দিব।' [মুসলিম] উম্মে আতিয়া সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেন। ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ, সৈনিকদের জন্য আহার রান্না করা এবং আহত ও রোগীর পরিচর্যার দায়িত্ব তাঁহার উপরে অর্পিত ছিল। [ইবনে মাজাহ] হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন যে, যে সকল নারী যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের সেবাকার্য করিতেন তাঁহাদিগকে গনীমতের মালের অংশ দেওয়া হইত।

–মুসলিম

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইসলামী পর্দার ধরন কোন জাহিলী প্রথার ন্যায় ছিল না যে, পরিস্থিতি ও আবশ্যকতা অনুযায়ী তাহাতে কম-বেশী করাই যাইত না। আবশ্যক হইলে উহার সীমারেখা হ্রাস করা যাইতে পারে। শুধু মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ই উন্মুক্ত করা যাইবে না; বরং যে সকল অংগ-প্রত্যংগ 'সতরে আওরাতের অন্তর্ভুক্ত তাহারও কিয়দংশ প্রয়োজন হইলে উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইলে পর্দাকে তাহার সেই সীমারেখার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা চাই যাহা সাধারণ অবস্থায় নির্ধারিত করা হইয়াছে। এই পর্দা প্রথা যেমন কোন জাহিলী প্রথা নহে, ঠিক তেমনই ইহার হ্রাসকরণও জাহিলী-স্বাধীনতার ন্যায় নহে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইউরোপীয় নারিগণ আপন সীমারেখা অতিক্রম করিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তাহারা পুনরায় সীমারেখার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিল। মুসলমান নারীদের অবস্থা ইহাদের মত নহে।

পরিশিষ্ট

ইহা এমন এক সুবিচারসম্মত দৃষ্টিকোণ ও মধ্যম পন্থা যে, পৃথিবী তাহার উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈতিক নিরাপত্তার জন্য ইহার মুখাপেক্ষী, চরম মুখাপেক্ষী। যেমন প্রথমেই বলিয়াছি যে, শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া তমদ্দুনে নারীর [অর্থাৎ মানব জগতের অর্ধাংশের] স্থান নির্ণয়ে পৃথিবী হিমৃশিম্ খাইতেছে। কখনও চরম বাড়াবাড়ি এবং কখনও চরম ন্যূনতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং এই উভয় চরম প্রান্তই তাহার জন্য ক্ষতিকারক প্রমাণিত হইয়াছে; পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এই ক্ষতির সাক্ষ্য দান করে। এই উভয় চরম প্রান্তের মধ্যে সুবিচার ও মধ্যম পন্থা উহাই, যাহা ইসলাম উপস্থাপিত করিয়াছে। ইহাই জ্ঞান ও প্রকৃতিসম্মত এবং মানবীয় প্রয়োজনের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগে এমন সব বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার কারণে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' হৃদয়ংগম এবং তাহার মর্যাদা দান মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল বাধা-বিঘ্নের মধ্যে প্রধান বিঘ্ন এই যে, নব্যযুগের মানুষ পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রাচ্যের পাশ্চাত্যমনা লোকের উপরে এই পাণ্ডুরোগের আর এক মারাত্মক আক্রমণ হইয়াছে যাহাকে শ্বেত পাণ্ডুরোগ বলা যায়। আমার এই স্পষ্ট উক্তির জন্য আমি আমার বন্ধু ও ভ্রাতৃবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী; কিন্তু যাহা সত্য তাহা প্রকাশে কোন তিক্ততা প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নহে। ইহা এক বাস্তব ঘটনা যে, ইসলামের এমন কোন নির্দেশ এবং এমন কোন বিষয় নাই, যাহা প্রমাণিত দার্শনিক তথ্যের পরিপন্থী বরং অধিকতর সত্য কথা এই যে, যাহাই দার্শনিক তথ্য, তাহাই ইসলাম। কিন্তু উহা দেখিবার জন্য বর্ণহীন দৃষ্টির প্রয়োজন যেন প্রতিটি বস্তুকে তাহার সত্যিকার বর্ণে দেখিতে পাওয়া যায়। উন্মুক্ত মন ও সুস্থ প্রকৃতির প্রয়োজন যাহাতে তথ্যকে তাহার অবিকলরূপে গ্রহণ করা যায় এবং উহাকে স্বীয় ঝোঁক-প্রবণতার অধীন না করিয়া প্রবৃত্তির ঝোঁক-প্রবণতাকেই বরং তাহার অধীন করা যায়। যেখানে ইহার অভাব হইবে, সেখানে জ্ঞানবিদ্যা থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। রঙিন দৃষ্টিতে যাহা কিছুই দেখিবে, তাহাকে

নিজের রঙেই দেখিবে। সংকীর্ণ দৃষ্টি সমস্যাবলী ও ব্যাপারসমূহের শুধু ঐ দিক পর্যন্তই পৌছিতে পারে যাহা ঐ কোণের [angle] সম্মুখে উপস্থাপিত ও সংঘটিত হয় যেখান হইতে সে উহাকে দেখিতে পায়। অতপর ইহা সত্ত্বেও যে সকল দার্শনিক তথ্য প্রকৃত অবস্থায় মনের অভ্যন্তরে পৌছিবে তাহার উপর মনের সংকীর্ণতা ও স্বভাবপ্রকৃতির বক্রতা ক্রিয়া করিবে। তথ্যাবলী তাহার মনের চাহিদা, আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী হইয়া যাউক, ইহাই হইবে তাহাদের দাবি। উহা তাহার মনমত না হইলে উহাকে সত্য জানিবার পরও উপেক্ষা করিয়া চলিবে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিরই আনুগত্য করিবে। প্রকাশ থাকে যে, মানুষ যখন এই রোগে আক্রান্ত হয়, তখন জ্ঞান, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কিছুই তাহাকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। এইরূপ রোগীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে যে, সে ইসলামের কোন নির্দেশ সঠিকভাবে বুঝিতে পারে। কারণ ইসলাম 'প্রাকৃতিক দীন' তথা প্রকৃতিই বটে। পাশ্চাত্য জগতের জন্য ইসলাম হৃদয়ংগম করা এইজন্য কঠিন যে, সে এই রোগে আক্রান্ত। তাহার নিকটে যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহা সকলই 'ইললাম' কিন্তু তাহার দৃষ্টি রঙিন। অতপর এই রঙ পাণ্ডুরোগ হইয়া প্রাচ্যের নব্য শিক্ষিত দলের দৃষ্টি রঙিন করিয়াছে। দার্শনিক তথ্য হইতে সঠিক ফল বাহির করিতে এবং জীবনে সমস্যাগুলিকে তাহার স্বাভাবিক রঙে দেখিতে এই রোগ প্রতিবন্ধক হয়। উহাদের মধ্যে যাহারা মুসলমান হইতে পারে, তাহারা দীন–ইসলামের উপর ঈমান রাখে, উহার সত্যতা স্বীকার করে, দীনের আনুগত্যের অনুরাগ হইতেও বঞ্চিত নহে। কিন্তু হতভাগা তাহার চক্ষুর পাণ্ডুরোগের কি করিবে? এই চক্ষু দ্বারা তাহারা যাহাই দেখে, তাহাই আল্লাহ্‌র রঙের বিপরীত দেখিতে পায়।

সঠিক বোধশক্তির প্রতিবন্ধক দ্বিতীয় কারণ এই যে, সাধারণভাবে মানুষ যখন ইসলামের কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করে তখন যে ব্যবস্থার সংগে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট তাহার প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, রবং উক্ত ব্যবস্থা হইতে বিষয়টি পৃথক করিয়া তৎসম্পর্কে আলোচনা করে। ফল এই হয় যে, বিষয়টি যাবতীয় জ্ঞান–বিবেচনা–বহির্ভূত মনে হয় এবং ইহার মধ্যে নানা প্রকারের সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সূদের বিষয়ে এই হইয়াছে যে, ইহাকে ইসলাম তথা প্রকৃতির অর্থৈনেতিক মূলনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে। ফলে ইহার মধ্যে সহস্র ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। এমন কি বড় বড় ইসলামী পণ্ডিতও ইহার মধ্যে শরীয়তের পরিপন্থী

সংশোধনীর প্রয়োজন বোধ করিলেন। দাসপ্রথা, বহু বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং এই প্রকার বহু বিষয়ে ঐরূপ মৌলিক ভ্রান্তি করা হইয়াছে। পর্দা সমস্যাটিও ইহারই শিকারে পরিণত হইয়াছে। যদি আপনি সমগ্র অট্টালিকা দেখিবার পরিবর্তে শুধু উহার একটি স্তম্ভ দেখেন তাহা হইলে আপনার নিকট ইহা এক বিস্ময় রহিয়া যাইবে যে, কেন ইহা স্থাপন করা হইয়াছে। উহার প্রতিষ্ঠা আপনার নিকটে সকল বুদ্ধি-বিবেচনার উর্ধ্বে মনে হইবে। আপনি কিছুতেই উপলদ্ধি করিতে পারিবেন না যে, ইন্‌জিনিয়ার অট্টালিকাটিকে অটল রাখিবার জন্য কিরূপ সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা সহকারে উহা স্থাপন করিয়াছেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিভাবে সমগ্র অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পর্দার দৃষ্টান্ত অবিকল ঐরূপ। যে সমাজ ব্যবস্থায় অট্টালিকার স্তম্ভের ন্যায় প্রয়োজন বোধে ইহা স্থাপন করা ইয়াছিল তাহা হইতে যদি ইহা পৃথক করা হয়, তাহা হইলে ইহা সকল বুদ্ধি-বিবেচনা বহির্ভূত হইয়া পড়িবে। এই কথা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না যে, মানব জাতির উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই বৈষম্যমূলক সীমারেখা কেন নির্ধারিত করা হইয়াছে। অতএব স্তম্ভের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করিতে হইলে যে অট্টালিকায় ইহা স্থাপিত হইয়াছে তাহাকেই পরিপূর্ণরূপে দেখিতে হইবে।

এখন ইসলামের প্রকৃত পর্দা আপনার সম্মুখে। যে সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্দার নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সমাজ ব্যবস্থাও আপনার সম্মুখে। এই ব্যবস্থার প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়ও আপনার সম্মুখে আছে, যাহার সহিত বিশেষ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া পর্দার প্রধান বিষয়গুলি সংযোজিত করা হইয়াছে। যাবতীয় প্রমাণিত দার্শনিক তথ্য আপনার সম্মুখে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই সমাজ ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে। এই সকল দেখিবার পর আপনি বলুন, ইহার মধ্যে কোথাও কোন দুর্বলতা আছে কি? কোন স্থানে ভারসাম্যহীনতার কোন লেশ আছে কি? কোন স্থান কি এমন আছে, যেখানে বিশেষ কোন দলীয় প্রবণতা পরিত্যাগ করত শুধু জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে কোন সংস্কারের প্রস্তাব করা যাইতে পারে? আমি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বলিতেছি যে, পৃথিবী ও আকাশ যে ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে পরিপূর্ণ সাম্য-শৃংখলা দেখিতে পাওয়া যায়, একটি অণুর গঠন ও সৌর-ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে যে ধরনের পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য ও সাদৃশ্য আপনি দেখিতে পান, ঠিক সেই ধরনের ন্যায়নীতি, সাম্য-শৃংখলা,

ভারসাম্য এবং সৌষ্ঠব এই সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। চরম বাড়াবাড়ি, চরম ন্যূনতা ও একমুখীনতা মানবীয় কাজের অপরিহার্য দুর্বলতা। এই ব্যবস্থা [ইসলামী ব্যবস্থা] এই সকল দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহার মধ্যে সংস্কার-সংশোধন মানব ক্ষমতা বহির্ভূত। মানুষ যদি তাহার ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা ইহার মধ্যে সামান্য পরিমাণেও কিছু পরিবর্তন করিতে চায় তাহা হইলে ইহার সংস্কার না করিয়া বরং ইহার ভারসাম্য নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

পরিতাপের বিষয়, আমার নিকটে এমন কোন উপায়-উপাদান নাই, যাহা দ্বারা আমি আমার বাণী ঐ সকল ভ্রাতৃবৃন্দের নিকটে পৌঁছাইতে পারি, যাঁহারা ইউরোপ, আমেরিকা, রুশ ও জাপানে বসবাস করেন। তাঁহারা একটি সুষ্ঠু সমপরিমিত তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা না পাইবার কারণে নিজেদের জীবন ধ্বংস করিতেছেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরও ধ্বংসের কারণ হইতেছেন। আহা, যদি আমি তাঁহাদের নিকটে এই মৃতসঞ্জীবনী পৌঁছাইতে পারিতাম, যাহার জন্য তাঁহারা প্রকৃতই তৃষ্ণার্ত। হয়ত তাঁহারা এই তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমার প্রতিবেশী দেশের হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী আমার নাগালের মধ্যে। তাঁহাদের অধিকাংশই আমার ভাষা বুঝিতে পারেন। আমি তাঁহাদের নিকটে আহ্বান জানাইতেছি যে, মুসলমানদের সহিত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে মন পরিষ্কার করিয়া নিছক সত্যানুসন্ধানী হিসাবে এই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে তাঁহারা জানিয়া বুঝিয়া দেখুন, যাহা আমি এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছি। অতপর যে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাঁহারা দ্রুত ধাবমান, তাহার সহিত ইহার যাচাই-পরীক্ষা করিয়া দেখুন। অবশেষে আমার অথবা অন্য কাহারও জন্য নহে, বরং নিজেরই মংগলের জন্য সিদ্ধান্ত করিয়া দেখুন যে, প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে।

অতপর সাধারণ পাঠকবৃন্দ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঐ সকল গুমরাহ ভাইদিগকে কিছু বলিতে চাই যাহাদিগকে মুসলমান বলা হয়।

আমাদের কিছু সংখ্যক নব্য শিক্ষিত মুসলমান ভাই উপরে বর্ণিত সকল কথাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা বলেনঃ

> অবস্থা ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন-কানুনের মধ্যে কঠোরতা লাঘব করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, যাহা অনস্বীকার্য। অতএব, আমাদের শুধু ইচ্ছা এই যে, ইহারই সুযোগে আমরা কিছু সুবিধা ভোগ করি। বর্তমান অবস্থা পর্দার লাঘব দাবি করে। মুসলমান নারীদের স্কুল-কলেজে যাইবার

প্রয়োজন হইয়াছে, যাহাতে তাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাহাদের এমন শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা তামাদ্দুনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বুঝিতে পারে এবং তাহার সমাধানের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত মুসলমানগণ জীবন সংগ্রামে প্রতিবেশী জাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে আরও ক্ষতির আশংকা আছে। দেশের রাজনৈতিক জীবনে নারীদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার যোগ্যতা যদি মুসলমান নারী লাভ না করে এবং পর্দার বাধা-বন্ধনের কারণে যদি সেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশের রাজনৈতিক নিক্তিতে মুসলমানের ওজন বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ইসলামী জগতের উন্নত জাতিগুলির দিকে তাকাইয়া দেখুন। যথাঃ তুর্কী ও ইরানীরা যুগের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া ইসলামী পর্দাকে বহুল পরিমাণে লাঘব করিয়াছে।[১] ইহার কয়েক বৎসর পরই যথেষ্ট উন্নতি লাভ হইয়াছে। আমরাও যদি তাহাদের পদাংক অনুসরণ করি, তাহাতে দোষ কি?

যতই আশংকা বর্ণনা হইতেছে, আমরা উহার সবখানিই স্বীকার করিয়া লইতেছি, বরং আশংকা ইহার দশগুণ হইলেও আসে যায় না। বস্তুত এই ধরনের কোন আশংকার কারণে ইসলামী আইন-কানুনে কোন প্রকার সংশোধনী অথবা লাঘব জায়েয হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের যাবতীয় আশংকার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে করুন আপনি স্বেচ্ছায় নির্বুদ্ধিতাবশত অথবা বাধ্য হইয়া আপন দুর্বলতার কারণে একটি মলিন ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করেন। সেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন আপনার জন্য শুধু কঠিনই হইয়া পড়ে নাই বরং অপরিচ্ছন্ন লোকের বস্তিতে অপরিচ্ছন্ন না থাকাই আপনার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-নীতির সংশোধনী অথবা লাঘবের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যদি আপনি ঐ সকল নিয়ম-নীতিকে সঠিক মনে করেন, তাহা হইলে আপনার কর্তব্য হইবে আপন পরিবেশকে চেষ্টা-সংগ্রাম করিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া তোলা। যদি সংগ্রাম করিবার শক্তি ও সাহস আপনার না থাকে এবং নিজের দুর্বলতার কারণে পরিবেশ কর্তৃক পরাভূত হন, তাহা হইলে যতই ময়লা আপনার উপর নিক্ষিপ্ত হউক, তাহাতে অবগাহন করুন। আপনার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-

---

১. তর্কের খাতিরে শুধু 'লাঘব' বলা হয়, নতুবা পর্দাকে তাহারা লাঘব করে নাই; বরং রহিত করিয়াছে।

নীতিতে পরিবর্তন কেন করা হইবে? কিন্তু যদি প্রকৃতই আপনি ঐ সকল নিয়ম–নীতি ভ্রান্ত মনে করেন এবং এই অপরিচ্ছন্নতা আপনার সহিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি নিজের জন্য যেমন ইচ্ছা, তেমন নীতি নির্ধারণ করিয়া লউন। যাহারা অপরিচ্ছন্নতার প্রতি অনুরক্ত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম–নীতিতে তাহাদের ইচ্ছা–অনিচ্ছার কোন অবকাশ নাই।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, প্রতিটি আইনের ন্যায় ইসলামী আইনেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোরতা ও লাঘব করিবার অবকাশ আছে। কিন্তু প্রতিটি আইনের ন্যায় ইসলামী আইনও দাবি করে যে, কঠোরতা অথবা লাঘবের সিদ্ধান্ত করিবার জন্য অবস্থাকে এমন দৃষ্টি ও স্পিরিট সহকারে দেখিতে হইবে, যাহা হইতে হইবে ইসলামেরই দৃষ্টি এবং ইসলামেরই স্পিরিট। কোন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়া অবস্থা দর্শন করা এবং তৎপর লাঘবের কাঁচি লইয়া আইনের ধারাগুলির প্রতি আক্রমণ করাকে লাঘব বলে না, বরং বলে স্পষ্ট পরিবর্তন। যে অবস্থাকে অনৈসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া ইসলামী আইনের লাঘব আনয়নের দাবি করা হইতেছে, তাহা যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, এইরূপ অবস্থায় লাঘবের পরিবর্তে অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে। লাঘবতা একমাত্র ঐ সময়ে অবলম্বন করা যায়, যখন আইনের উদ্দেশ্য অন্য উপায়ে সহজেই পূরণ হয় এবং রক্ষণানেক্ষণে বেশী কঠোরতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন আইনের উদ্দেশ্য অন্য উপায়ে পূরণ হয় না, বরং অন্যান্য সমগ্র শক্তি তাহা নষ্ট করিবার কাজে লাগিয়া থাকে এবং তাহার উদ্দেশ্য পূরণ রক্ষাণাবেক্ষণের উপরই নির্ভর করে, এমতাবস্থায় শুধু ঐ ব্যক্তিই লাঘবের চিন্তা করিতে পারে, যে আইনের স্পিরিট সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত।

উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আইন–কানুনের উদ্দেশ্য দাম্পত্য জীবনের রীতিনীতির রক্ষণাবেক্ষণ, যৌন–উচ্ছৃংখলতার প্রতিরোধ এবং অপরিমিত যৌন–উত্তেজনার দমন। এই উদ্দেশ্যে শরীয়ত প্রণেতা তিনটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমত চরিত্রের সংশোধন, দ্বিতীয়ত শাস্তিমূলক আইন এবং তৃতীয়ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ সতর ও পর্দা। ইহা যেন তিনটি স্তম্ভ, যাহার উপরে এই প্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। যাহার দৃঢ়তার উপরে ইহার দৃঢ়তা এবং যাহার ধ্বংসের উপরে ইহার ধ্বংস নির্ভর করে। আসুন, আপনি একবার আপন দেশের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করিয়া দেখুন যে, এই তিনটি স্তম্ভের কি অবস্থা হইয়াছে!

প্রথমত নৈতিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করুন। আপনি এমন দেশে [বিভাগপূর্ব ভারত] বাস করেন যাহার শতকরা পঁচাত্তর জন অধিবাসী আপনার অগ্র-পশ্চাতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এখন পর্যন্তও অমুসলিম রহিয়াছে। এই দেশের উপরে একটি অমুসলিম জাতি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, একটি অমুসলিম সভ্যতা ইহাকে প্রবল ঝটিকার ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্লেগ-কলেরা জীবাণুর ন্যায় অনৈসলামী চরিত্রের মূলনীতি ও অনৈসলামী সভ্যতার ধ্যান-ধারণা পরিবেশকে সংক্রমিত করিয়া ফেলিয়াছে। আবহাওয়া উহার দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে। উহার বিষক্রিয়া আপনাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। যে সকল অশ্লীল-অশ্রাব্য কথায় কিছুকাল পূর্বে আপনার শরীর রোমাঞ্চিত হইত, তাহা এখন এমন সাধারণ বস্তুতে পরিণত হইয়াছে যে, আপনি উহাকে দৈনন্দিনের বিষয়বস্তু মনে করেন। আপনার সন্তানগণ পত্র-পত্রিকায় ও বিজ্ঞাপনাদিতে প্রতিদিন অশ্লীল ছবি দেখিতেছে এবং নির্লজ্জতায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। আপনার সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সিনেমা দর্শন করে, যেখানে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও যৌন উন্মাদনাপূর্ণ প্রেমলীলা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক আর কিছু হয় না। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, মাতা-কন্যা পাশাপাশি বসিয়া প্রকাশ্যে চুম্বন-আলিঙ্গন, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ও প্রেম নিবেদনের দৃশ্য উপভোগ করিতে কণামাত্র লজ্জাবোধ করে না। চরম অশ্লীল ও যৌন-উত্তেজক গীতি প্রতি ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে গাওয়া হইতেছে। ইহা হইতে কাহারও কর্ণকুহর মুক্ত নহে। উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ও ইংরাজ মহিলাগণ অর্ধনগ্ন পোশাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং উহা চক্ষে এমনভাবে সহিয়া গিয়াছে যে, উহাতে কেহই নির্লজ্জতা অনুভব করে না। নৈতিকতার যে ধারণা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার বদৌলতে বিবাহকে একটি জীর্ণ প্রাচীন প্রথা, ব্যভিচারকে চিত্তবিনোদন, নারী-পুরুষের একত্র মিলনকে একটি আপত্তিহীন, বরং প্রশংসনীয় বস্তু, তালাককে একটি খেলা, দাম্পত্য-দায়িত্ব পালনকে একটা অসহনীয় বন্ধন, সন্তানের জন্মদান ও বংশবৃদ্ধিকে একটা মূঢ়তা, স্বামীর আনুগত্যকে এক প্রকার দাসত্ব, স্ত্রী হওয়াকে একটা বিপদ এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সাজাকে একটা কাল্পনিক স্বর্গ মনে করা হয়।

অতপর লক্ষ্য করুন, এই পরিবেশের কি ধরনের প্রভাব আপনার জাতির উপর পড়িতেছে। আপনার সমাজে কোথাও কি দৃষ্টি সংযমের অস্তিত্ব আছে? লক্ষ লোকের মধ্যেও কি এমন একজন পাওয়া যায়, যে অপরিচিত নারীর

সৌন্দর্য প্রদর্শনে ভীত হয়? চক্ষু ও জিহ্বার কি প্রকাশ্যে ব্যভিচার হইতেছে না? আপনার নারিগণও কি জাহিলী যুগের ঠাট-ঠমক ও সৌন্দর্য প্রদর্শন হইতে বিরত থাকে? আপনার গৃহে কি আজও এমন পোশাক পরিধান করা হয় না, যেগুলি সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেন যে, 'ঐ সকল নারীর উপর অভিসম্পাত, যাহারা বস্ত্র পরিধান করিয়াও উলংগ থাকে।'... আপনার মাতা, ভগ্নি ও কন্যাকে কি এমন পোশাকে দেখিতেছেন না, যাহা মুসলমান নারী তাহার স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে পরিধান করিতে পারে না? আপনার সমাজে কি অশ্লীল কিস্‌সা-কাহিনী ও প্রেমের অকথ্য ও অশ্রাব্য ঘটনাগুলি দ্বিধাহীনচিত্তে বর্ণিত এবং শ্রুত হয় না? বৈঠকাদিতে লোকে তাহাদের কৃত অপকর্মগুলি বর্ণনা করিতে কি কোন লজ্জাবোধ করে? অবস্থা যদি এই হয়, তাহা হইলে বলুন, নৈতিক পবিত্রতার সেই প্রথম সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় স্তম্ভ কোথায় রহিল, যাহার উপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রসাদ রচনা করা হইয়াছে? ইসলামী মর্যাদাবোধ এমন পরিমাণে মিটিয়া গিয়াছে যে, মুসলমান নারী শুধু মুসলমানের নহে; বরং অমুসমানেরও শয্যা-সংগিনী হইতেছে। ব্রিটিশ রাজ্যে নহে, মুসলমান রাজ্যেও এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইতেছে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাইতেছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়াও মুসলমানদের রক্ত উত্তেজিত হয় না। এমন মর্যাদাবোধহীন মুসলমানও দেখা গিয়াছে যাহার আপন ভগ্নি কোন অমুসলমানের স্ত্রী হইয়াছে এবং সে ব্যক্তি গর্বভরে প্রকাশ করিয়াছে যে, সে অমুক বড়লোক কাফিরের শ্যালক।[১] ইহার পরও নির্লজ্জতা ও নৈতিক অধপতনের কিছু অবশিষ্ট থাকিল কি?

এখন একবার দ্বিতীয় স্তম্ভটির অবস্থা অবলোকন করিয়া দেখুন। সমগ্র ভারতে ইসলামের শাস্তিমূলক আইনগুলি রহিত হইয়াছে। ব্রিটিশ ও মুসলমান রাজ্যের কোথাও ব্যভিচারের শাস্তি প্রচলিত নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং যে আইন বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহা ব্যভিচারকে কোন অপরাধই মনে করে না। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবালাকে কোন ব্যক্তি প্ররোচিত করিয়া পাপাচারে লিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিলে এমন কোন আইন নাই, যাহা দ্বারা তাহার সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করা যাইতে পারে। যদি কেহ কোন সাবালিকার সহিত তাহার সম্মতিক্রমে অবৈধভাবে যৌন ক্রিয়া করে, তাহা হইলে কোন আইনবলেই

১. ইহা দক্ষিণ ভারতের একটি ঘটনা। আমার জনৈক বন্ধু ইহা হইতেও মর্মবিদারক একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব ভারতে জনৈকা মুসলমান নারী প্রকাশ্যে একজন ধনী অমুসলমানের সহিত সম্পর্ক রাখিত। ফলে সে বাপ ধন-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছিল। আমার বন্ধু স্থানীয় তথাকথিত মুসলমানদিগকে এ বিষয়ে গর্ব করিতে দেখিয়াছেন।

তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না। কোন নারী প্রকাশ্যে ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হইলে এমন শক্তি নাই, যাহা দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। দেশের আইন শুধু বলপূর্বক ব্যভিচারকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু আইন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, বলপূর্বক ব্যভিচার প্রমাণ করা কত কঠিন। বিবাহিতা নারীকে অপহরণ করাও অপরাধ। কিন্তু ব্রিটিশ আইনজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, বিবাহিতা নারী স্বেচ্ছায় কাহারও গৃহে যাইয়া উঠিলে শাসকদের আদালতে ইহার কি প্রতিকার আছে।

চিন্তা করিয়া দেখুন, এই উভয় স্তম্ভদ্বয় ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। এখন আপনার সমাজ ব্যবস্থাপনার সমগ্র প্রাসাদ শুধু একটি মাত্র স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ইহাকেও কি আপনি ধ্বংস করিতে চান? একদিকে আপনার বর্ণিত পর্দাপ্রথার ক্ষতিসমূহ এবং অপরদিকে পর্দা রহিত করিলে নৈতিক চরিত্র এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ধ্বংস উভয়ের মধ্যে যাচাই-পরীক্ষা করিয়া দেখুন। উভয়ই বিপদ এবং একটিকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এখন আপনি নিজেই নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ বিপদটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

যুগের অবস্থার উপরেই যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, ভারতের অবস্থা পর্দা লাঘব করিবার পক্ষে নহে, বরং ইহার অধিকতর কড়াকড়ির দাবি করে। কারণ সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের দুইটি স্তম্ভই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং এখন সকল কিছুই মাত্র একটা স্তম্ভের উপরে নির্ভরশীল। তমদ্দুন, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করিতে হইলে স্থির মস্তিষ্কে বসিয়া পড়ুন এবং চিন্তা করিয়া দেখুন। ইসলামী সীমারেখার ভিতরে তাহার সমাধানের অন্য পন্থাও বাহির হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট এই একটিমাত্র স্তম্ভ, যাহা ইতিমধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে অধিকতর দুর্বল করিবেন না। ইহা লাঘব করিবার পূর্বে আপনাকে এমন শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে যে, যদি কোন মুসলমান নারী বেপর্দা হয় এবং তাহাকে দেখিবার জন্য কোথাও দুইটি চক্ষু পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিবার জন্য যেন পঞ্চাশটি হস্ত প্রস্তুত থাকে।

= সমাপ্ত =